বর্ষায়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু চিত্রিত

[চিত্র-শোভিত তৃতীয় সংস্করণ]

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—কার্তিক, ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫০
তৃতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

মূল্য—তিন টাকা

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

বর্ষার কবি

বিশ্বকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের করকমলে

"বর্ষায়" বইখানি

উৎসর্গ করিলাম

শ্রদ্ধানত গ্রন্থকার

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'বর্ষায়' বইখানিতে আমার অধুনা-প্রকাশিত কয়েকখানি গল্প সন্নিবেশিত হইল।

'ল্যান্স্‌ডাউন ও বিপিন পাল' গল্পটির সম্বন্ধে দু'টি কথা বলিয়া দিলে ভাল হয়। ভাদ্র ১৩৪৫-এর 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গে' লেখা হয় যে দক্ষিণ কলিকাতার ল্যান্স্‌ডাউন রোড বাড়াইয়া কংগ্রেসী কর্পোরেশন বর্ধিত অংশের নাম 'বিপিন পাল রোড' রাখিতে চাহিলে একটা তুমুল কলরব ওঠে। ল্যান্স্‌ডাউন্‌দের ভক্ত এখনও যে এমন বিপুল বিক্রমে বাঁচিয়া আছে এটা বিশ্বাস করা শক্ত। এই উগ্র ভক্তদের দেবতা তাহাদের কি চক্ষে দেখেন গল্পটিতে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। চরিত্রগুলি সব কাল্পনিক।

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গল্পগুলির প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এ অপরিশোধ্য ঋণের কথা স্বীকার করিয়া রাখিলাম।

দ্বারবঙ্গ
কার্তিকী পূর্ণিমা, ১৩৪৭

গ্রন্থকার

গল্প

চিত্র

1074

বর্ষায়

সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে, আড্ডা জমিল না। তিন জনে ছাড়া-ছাড়া ভাবে সময় কাটাইতেছিল—তারাপদ তাস ঘাঁটিতেছে, রাধানাথ সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখিতেছে, শৈলেন হাত দুইটাকে বালিস করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া গুন্-গুন্ করিতেছে।

তারাপদ বলিল, "তোমার মাথার কাছেব জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে, শৈলেন।"

শৈলেন বলিল, "আসুক বেশ লাগছে; সুবিধে-আরাম যখন সম্পূর্ণ-ভাবে নিজের আয়ত্তে, তখন ইচ্ছেকরেই একটু একটু অসুবিধে ভোগ করায় বেশ একটা তৃপ্তি আছে,—রাজারাজড়ার শখ করে হেঁটে চলার মত।"

রাধানাথ একটি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী করিল, "কবি।"

তারাপদ বলিল, "তাহ'লে আর একটু অসুবিধের তৃপ্তি ভোগ করতে করতে তুমি না-হয় শুভেনকে ডেকে নিয়ে এস, চার জন হ'লে দিব্যি আরাম করে তাসটা খেলা যায়।"

রাধানাথ বলিল, "আমি গিয়েছিলাম তার কাছে; সে আসবে না।"

"কেন?"

"তার দাদার শালী বেড়াতে আসবে।"

"আসুক না?"

"বললে, 'এ অবস্থায় আমার বাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা নেহাৎ অভদ্রতা হবে না?' "

তারাপদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ও! অভদ্রতা!...."

আবার চুপচাপ; শৈলেন গুনগুনানিটুকুও থামাইয়া দিয়াছে। একটু পরে তারাপদই আবার মৌনতা ভঙ্গ করিল; প্রশ্ন করিল, "তোমরা ভালবাসা জিনিসটায় বিশ্বাস কর?"

রাধানাথ বলিল, "যখন ভূতে করি তখন ভালবাসা আর কি দোষ করেছে,—দুটোই যখন ঘাড়ে চাপবার জিনিস। তবে সব সময় করি না বিশ্বাস। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, পোড়ো বাড়ি কিংবা একটানা মাঠের মাঝখানে একটা পুরনো গাছ—একলা পড়ে গেছি—এ-অবস্থায় ভূত বিশ্বাস করি; আর ভালবাসার কথা,—কবির ভাষায় এ-রকম 'অঝোর-ঝরা শাওন রাতি'—তোমার চা-টি দিব্যি হয়েছিল, আর ওদিকে বাড়িতে খিচুড়ি আর মাংসের খবর পেয়ে এসেছি, ভবিষ্যতের একটা আশ্বাস রয়েছে; এ-রকম অবস্থায় মনে হচ্ছে যেন প্রেম বলে একটা জিনিস থাকা বিচিত্র নয়....এমন কি দাদার নেই-শালীর জন্যে একটা বিরহের ভাবও মনে জেগে উঠছে যেন।"

তারাপদ প্রশ্ন করিল, "কবি কি বল?"

শৈলেন বলিল "আমি যে রয়েছি, আরও প্রমাণ দিয়ে স্পষ্ট করে বলতে গেলে—এখন, এ-ঘরে হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি—এটা বিশ্বাস কর?"

"করি বইকি—না করে উপায় কি? বিশেষ করে বৃষ্টির ছাটের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শৈলেনত্বের প্রমাণ যখন...."

"তাহ'লে ভালবাসাকেও বিশ্বাস করতে হবে তোমাদের, কেন-না, আমি আর ভালবাসা সম-স্থিত, ইংরেজীতে তোমরা যাকে বলবে co-existent!"

তারাপদ তাস ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "বটে! তা তোমার জীবনে

যে একটা রহস্য আছে সে-সন্দেহ বরাবরই হয় বটে, তবে অ্যান্টি-শুকদেবের মত—আমি অ্যান্টি-ক্রাইস্টের নজীরে কথাটা ব্যবহার করলাম—অ্যান্টি-শুকদেবের মত তুমি যে রমণী-প্রেম নিয়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ এতটা জানা ছিল না ব্যাপারটা ভেঙে বল একটু।"

শৈলেন আরম্ভ করিল—"বয়স যখন সাত-আটের মাঝামাঝি সেই সময় আমার ভালবাসার স্থত্রপাত ঠিক কোন্ লগ্নটিতে আরম্ভ হয়েছিল বলতে পারি না। অনভিজ্ঞেরা কাব্য-কাহিনীতে যা বলেন তা থেকে মনে হয় ভালবাসা জীবনের একটা নির্দিষ্ট রেখা থেকে আরম্ভ হয়, যেমন মাঠের ওপর একটা চূনের রেখা কিংবা কোদালের দাগ থেকে আরম্ভ হয় বাজির দৌড়। ঐ যে শোন প্রথম দর্শন থেকেই প্রেম, কিংবা হাতের লেখা দেখেই ভালবেসে ফেলা, ও-সব কথা নিতান্তই বাজে। প্রেমকে একটি ফুল বলা চলে—ওর আরম্ভটা পাঁজির এলাকাভুক্ত নয়। কবে যে কেন্দ্রগত মধুকণাটুকু জমে উঠেছে, আর কবে যে তাকে ঘিরে কচি দলগুলি কুঞ্চিত হয়ে উঠবে, তার হিসেব হয় না; আমরা যখন টের পাই তখন যাত্রাপথে অনেক দূর এগিয়েছে—সেটা বিকশিত দলের ব্যাকুল গন্ধের যুগ....

"একদিন ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনতে শুনতে আমি ব্যাপারটুকুর সন্ধান পেলাম। সেদিনও বড় দুর্যোগ ছিল, ঝড়ঝাপটার ভাগটা আজকের চেয়েও বরং বেশি। রাজপুত্র অরূপকুমার কত দীর্ঘ পথ পেছনে রেখে, কত দীর্ঘতর পথ সামনে করে চলেছেন। আহার নেই, নিদ্রা নেই, ভয় নেই, শঙ্কা নেই, সঙ্গী বুকের মধ্যে একটি রূপের স্বপ্ন। যাত্রাপথের শেষে সাগরের অতল তলে মাণিকের তোরণ পেরিয়ে তাঁর পক্ষিরাজ ঘোড়া পৌঁছল রাজকুমারী কঙ্কাবতীর প্রবাল-পুরীর দ্বারে।

"এতটা হ'ল সাধারণ কথা, যাত্রাপথের দৈনন্দিন ইতিহাস।

"সেই বিশেষ রাত্রে অরূপকুমার আমি যখন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে...."

তারাপদ প্রশ্ন করিল, "তুমি আবার কেমন করে বয়স আর অবস্থা ডিঙিয়ে অরূপকুমার হয়ে পড়লে ?"

শৈলেন বলিল, "সাত-আট বছর বয়সের একটা মস্ত বড় সুবিধে এই যে, সে সময় বয়স আর অবস্থা সম্বন্ধে কোন চৈতন্য থাকে না, সুতরাং যাকে মনে ধরে নির্বিবাদে তার মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে পড়া চলে। এখন তুমি যে অমুক আর তোমার বয়স যে সাঁয়ত্রিশ, এই চেতনা তোমার চারপাশে গণ্ডি সৃষ্টি করে তোমাকে একান্তপক্ষে 'তুমি' করে রেখেছে,—একটু কাটিয়ে রাজপুত্র-কোটালপুত্র হয়ে নেওয়া তো দূরের কথা, মুহূর্ত কয়েকের জন্যে যে নিজের ছেলেবেলা থেকেই ঘুরে আসবে সেটাও দুষ্কর হয়ে ওঠে। এই তরলতার জন্যে জীবনের সাত-আট বছরের বয়সটা হ'ল রূপকথারই যুগ, যেমন সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছরের সময়টা তার নির্বিকারত্বের জন্যে সাহেব, বড়বাবু প্রভৃতির মধ্যে মুখ বুজে চাকরি করবার যুগ।....যাক, গল্পটাই শোন ; বর্ষা কেটে গেলে বায়ুমণ্ডলের এই ভিজে ভিজে আমেজের ভাবটি যখন কেটে যাবে তখন আমি গল্পটা যে চালাতে পারব—এতে সন্দেহ আছে, কেন না তখন নিজে যা বলছি তা নিজেই বিশ্বাস করতে পারব কি না নিঃসংশয়ে বলতে পারি না।

"কি বলছিলাম ?....হ্যাঁ সে-রাত্রে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে দেখলাম সোনার কাঠি ছোঁয়াতে রূপোর পালঙ্কে যে জেগে উঠল সে রাজকুমারী কঙ্কাবতী নয়—সে হচ্ছে আমার সেজবৌদিদির সই নয়নতারা।

"কঙ্কাবতী নয়—হাসিতে যার মুক্তো ঝরে, অশ্রুতে যার হীরে গলে পড়ে, যে চাঁদের বরণ কন্যের মেঘের বরণ চুল, জেগে উঠতেই যার চোখের দীপ্তিতে সাত মহলে আলো ঠিকরে পড়ে, সাত সখীতে যাকে চামর দোলায়, যার জন্যে সপ্তবীণায় ওঠে সপ্তসুরের মূর্ছনা....

"সোনার কাঠির স্পর্শে তার জায়গায় আমার মুখের দিকে চোখ মেলে চাইলে নয়নতারা, যাকে বিনা উগ্র সাধনাতেই আমি প্রত্যহের কাজে অকাজে রোজই দেখছি। আমাদের বাড়ির কাছেই বোস-পাড়ায় রেলের ধারে তাদের বাড়ি। সামনে পানায় ঢাকা ছোট একটা পুকুর, তাতে একটা বকুলগাছের ছায়ায় রাণাভাঙা সিঁড়ি নেমে গেছে। ঘাটের সামনেই খানিকটা দুর্বাঘাসে ঢাকা জমি....সেখানে শীতের শেষে বকুলে আর সজনেফুলে কায়ায়-গন্ধে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকত। তার পরেই একটা রকের পেছনে নয়নতারাদের বাড়ি—খানিকটা কোঠা, খানিকটা গোলপাতার। মোট কথা, সাগরতলের প্রবাল-মহলের সঙ্গে তার কোনই মিল ছিল না।

"না ছিল স্বয়ং কঙ্কাবতীর সঙ্গে নয়নতারার কোন মিল। প্রথমত, নয়নতারা ছিল কালো—যা কোন রাজকন্যারই কখনও হবার কথা নয়। তবুও যে সে সে-রাত্রে আমার গল্পরাজ্যে বিপর্যয় ঘটালে কি করে, তা ভাবতে গেলে আমার মনে পড়ে যায় তার দুটি চোখ। অমন চোখ আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি। তোমরা বোধ হয় স্বীকার করবে ফরসা মেয়ের চেয়ে কালো মেয়ের চোখই বেশি বাহারে হয়—সবুজ আবেষ্টনীর মধ্যে কালো জলের মত। পরে আমি ভাল চোখের লোভে অনেক কালো মেয়ের দিকে চেয়েছি, কিন্তু অমন দু'টি চোখ আর দেখি নি। তার বিশেষত্ব ছিল তার অদ্ভুত দীপ্তি; উগ্র দীপ্তি নয়, তার সঙ্গে সর্বদাই একটা হাসি-হাসি ভাব মিশে থেকে সেটাকে প্রসন্ন করে রাখত। নয়নতারা বেজায় হাসত—বেহায়ার মত। যখন হাসত তখন তার কালো শরীর থেকে যেন আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকত; যখন হাসত না, আমার মনে হ'ত তখনও যেন খানিকটা আলো আর খানিকটা হাসির অবশেষ ওর চোখে লেগে রয়েছে। আমি সে-দুটি চোখ বর্ণনা করতে

পারলাম না, তা ভিন্ন শুধু চোখ নিয়ে পড়ে থাকলে আমার গল্প শেষ করাও হয়ে উঠবে না। আমি একবার শুধু সে-চোখের তুলনা পেয়েছিলাম—কতকটা; মানুষের মধ্যে নয়, পৃথিবীর কোন জিনিসেও নয়—যদি কখন শীতের প্রত্যুষে উঠে চক্রবালরেখার উপরে শুকতারা দেখ, তো নয়নতারার চোখের কথা মনে ক'রো; অর্থাৎ সে অপার্থিব চোখের তুলনা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে—স্বর্গের কাছাকাছি।

"রেলের দিকে দেয়াল-দিয়ে-আড়াল-করা পানাপুকুরের ধারের জায়গাটিতে নয়নতারার সমবয়সী মেয়েদের আড্ডা জমত। পুরুষের মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল শুধু আমার, কারণ কয়েকটি কারণে আমি ঠিক সেই ধরণের ছেলে ছিলাম নবপরিণীতাদের যারা খুব কাজে লাগে। প্রথমত, বয়সটা খুব কম; দ্বিতীয়ত, আমি ছিলাম খুব অল্পভাষী যার জন্যে বাইরে বাইরে আমায় খুব হাঁদা বলে বোধ হ'ত, আর তৃতীয়ত, আমার পুরুষ-অভিভাবক না থাকায় বাড়িতে আমার অবসর ছিল সুপ্রচুর এবং ইচ্ছেমতো পাঠশালার বরাদ্দ থেকেও সময় কেটে অবসর বৃদ্ধি করবার মধ্যেও কোন বাধা ছিল না। ফলে, ওরা যে আমায় শুধু দয়া করে কাজে লাগাত এমন নয়, আমি না হ'লে ওদের কাজ অচল হয়ে যেত। সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল চিঠি নিয়ে: এক কথায় আমি এই সংসদটির ডাক-বিভাগের পূর্ণ চার্জে ছিলাম বলা চলে। খাম-টিকিট নিয়ে আসা, চিঠি ফেলে আসা, এমন কি প্রয়োজন-বিশেষে পোষ্ট-আপিসে গিয়ে পিয়নের কাছ থেকে আগেভাগে চিঠি চেয়ে নিয়ে আসাও আমার কাজের সামিল ছিল; আর পাঁচ-সাত জন নবোঢ়ার খাম, টিকিট, চিঠির সংখ্যার আন্দাজ করে নিতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না নিশ্চয়ই। এ ছাড়া বাজার থেকে এটা-ওটা-সেটা এনে দেওয়াও ছিল,—চিঠির কাগজ, কালির বড়ি, মাথার কাঁটা, ফিতে, চিরুনি····

আড়ালে ডেকে বলত, 'পতি পরমগুরু' লেখা দেখে চিরুনিটা নিবি শৈল, লক্ষ্মী ভাই....আর এদের সামনে যখন বকব—'ও চিরুনি কেন মরতে নিয়ে এলি'—বলে, তখন চুপ করে থাকবি—থাকবি তো ?.. দুটো পয়সা নিয়ে ডালপুরী আলুর দম কিনে খেও, যাও....ভাগ্যিস শৈল ছিল আমাদের !"

"এ ছাড়া সময়ের কাঁচা ফল, এবং সেগুলিকে তরুণীদের কাঁচা রসনার উপযোগী করবার নানা রকম মশলা আহরণ করাও আমার একটা বড় কাজ ছিল।....রাধানাথ, ও রকম নিশ্বাস ফেললে যে ? হিংসে হচ্ছে ?"

রাধানাথ বলিল, "নাঃ, হিংসে কিসের ? এই আমিও তো আজ তিন ঘণ্টা ধরে গিন্নীর ফর্দ মিলিয়ে মিলিয়ে মাসকাবারি কিনে নিয়ে এলাম—মসলা, তেল, ওষুধ, বার্লি....নাও, গল্প চালাও।"

"সেদিন ঠাকুরমার গল্পে নয়নতারা কঙ্কাবতীর জায়গা দখল ক'রে মিলন-বিরহ, হাসি-কান্না, মান-অভিমানে সমস্ত গল্পটির মধ্যে একটা অপরূপ অভিনবত্ব ফুটিয়ে তুললে। রূপকথা আর সত্যের সে অদ্ভুত মিশ্রণ আমার আজ পর্যন্ত বেশ মনে আছে। সেদিন অরূপকুমারকে বিদায় দিতে কঙ্কাবতীর চোখে যখন মুক্তো ঝরল তখন আমার সমস্ত অন্তরাত্মা রেলের ধারের সেই বকুলতলাটিতে এসে অসহ্য বেদনা-ব্যাকুলতা নিয়ে ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

"কিন্তু আশ্চর্যের কথা—অবশ্য, এখন আর সেটাকে মোটেই আশ্চর্য বলে ধরি না—তার পরদিন সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যে গেল, নয়নতারাদের বাড়ির দিকে কোনমতেই পা তুলতে পারলাম না। কেমন যেন মনে হ'তে লাগল, কালকের রাত্রের রূপকথাটা আমার চারি দিকে ছড়ান রয়েছে—ওদের সামনে গেলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে।

এখন লক্ষণ মিলিয়ে বুঝতে পারছি সেটা আর কিছু নয়; নতুন ভালবাসার প্রথম সংকোচ।

"সেজবৌদি বললে, 'হ্যাঁ শৈলঠাকুরপো, আজ সমস্ত দিন তুমি ও-মুখো হও নি যে? নয়ন তোমায় খুঁজছিল।'

"রাত্রি ছিল, আমি লজ্জাটা ঢাকলাম, কিন্তু কথাটা চাপতে পারলাম না, বললাম, 'যাও, খুঁজছিল না আরও কিছু।'

"সেজবৌদি বললেন, 'ওমা! খুঁজছিল না? আমি মিছে বললাম? তিন-চার বার খোঁজ করেছিল, কাল সকালে যেও একবার।'

"বললাম, 'আমার বয়ে গেছে।'

"'বয়ে গেছে তো যেও না, আমায় বলতে বলেছিল, বললাম'—বলে বৌদি চলে গেলেন।

"সেদিন ঠাকুরমার ছিল একাদশী, গল্প হ'ল না,—অর্থাৎ তার আগের রাতে যে আগুনটুকু জ্বলেছিল তাতে আর ইন্ধন জোগাল না। পরের দিন অনেকটা সহজভাবে নয়নতারাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। সে তখন মেঝেয় উপুড় হয়ে চিঠি লিখছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমায় ডেকেছিলে নাকি....কাল?'

"নয়নতারা মুখ তুলে বাঁ-গালটা কুঞ্চিত করে বললে, 'যা যাঃ, দায় পড়ে গেছে ডাকতে, উনি না হ'লে যেন দিন যাবে না। দুটো চিঠির কাগজ এনে উপকার করবেন, তা....'

"ওদের চড়টা-আসটাও মাঝে মাঝে হজম করতে হয়েছে, কিন্তু সেদিন এই কথা দুটোতেই এমন রূঢ় আঘাত দিলে যে মনের দারুণ অভিমানে বই-শ্লেট নিয়ে সেদিন পাঠশালায় চলে গেলাম,—মনে বৈরাগ্য উদয় হ'ল আর কি—জানই তো পাঠশালাটা হচ্ছে ছেলেবেলার শ্বাপদ-সংকুল বানপ্রস্থভূমি।....গুরুমশাই বাঘ, শির-পোড়ো ভাল্লুক, ইত্যাদি।

সেখানে আগের দিন-চারেক অনুপস্থিত থাকবার জন্যে এবং সেদিনও দেরি হবার জন্যে বেশ একচোট উত্তম-মধ্যম হ'ল।

"এর ফলে বাল্য-মোহের কচি শিখাটি প্রায় নির্বাপিত হয়েই এসেছিল, কিন্তু পাঠশালা থেকে ফেরবার পথে যখন রেল পেরিয়েছি, পুকুরের এপারে রাংচিতের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে নয়নতারা ডাকলে। আমি প্রথমটা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, তার পর নয়নতারা আর একবার ডাকতেই আগেকার দু-দিনের কথা, সকালের কথা, এবং পাঠশালের কথা একসঙ্গে সব মনে হুড়োহুড়ি করে এসে, কি করে জানি না, আমার চোখ দুটো জলে ডুবিয়ে দিলে। নয়নতারা বেরিয়ে এসে আমার হাতদুটো ধরে আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ওমা, তুই কাঁদছিস শৈল? কেন রে, আয় চল্।'

"বাড়ি নিয়ে গিয়ে খুব আদর-যত্ন করলে সেদিন। দুটো নারকেল-নাড়ু আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে এসে বললে, 'তোর জন্যে চুরি করে রেখেছিলাম শৈল, খা। তোকে সত্যি বড় ভালবাসি শৈল, তুই বিশ্বাস করবি নি। তোকে রাগের মাথায় তাড়িয়ে দিয়ে মনটা এমন হুহু করছিল!....মুখে আগুন নস্তের, অত খোসামোদ করিয়ে, একটা নাটাইয়ের দাম আদায় করে যদিবা কালকে চিঠির কাগজ দিলে এনে, আজ কোন মতেই চিঠিটা ফেলে দিলে না রে। গলে যাক অমন দুষমন গতর—বেইমানের।'

"এদিক-ওদিক একটু চেয়ে শেমিজের মধ্যে থেকে একটা গোলাপী খাম বের করে মিনতির স্বরে বললে, 'সত্যি তোকে বড্ড ভালবাসি শৈল—বললে না পেত্যয় যাবি।....এই চিঠিটা ভাই—বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে নে। আর একটু ঘুরে গিয়ে পোস্টাপিসে ফেলে দিয়ে বাড়ি যও; রোদটা একটু কড়া, কষ্ট হবে? হ্যাঁ, শৈলর আবার এ-কষ্ট



···এই চিঠিটা ভাই·

কষ্ট। নন্তে কিনা।····এগারটা বেজে গেছে, বারটার সময় ডাক বেরিয়ে যাবে শৈল, লক্ষ্মীটি····'

"আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,—পুকুরধারে, শানের বেঞ্চের

পেছনে, বকুলগাছের আড়ালে আমার কাঁধে বাঁ-হাতটা দিয়ে নয়নতারা দাঁড়িয়ে আছে, আমার মুখের ওপর ডাগর ভাসা-ভাসা চোখ দুটি নীচু করে,—তাতে চিঠির গোপনতার একটু লজ্জা, খোশামোদের ধূর্তামি, বোধ হয় একটু অনুতপ্ত স্নেহ, আর একটা কি জিনিস—একটা অনির্বচনীয় কি জিনিস যা শুধু নবপরিণীতাদের চোখেই দেখেছি, আর যা এই রকম চিঠি-লেখা, চিঠি-পাওয়ার সময় যেন আরও বেশি করে ফুটে ওঠে।

"এইখানে আমার ভালবাসার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় শেষ হ'ল, এই ফিরে যেতে যেতে আবার ঘুরে আসায়।....তোমাদের ঐ বয়সের মেয়েদের মজলিসের কোন অভিজ্ঞতা আছে?

তারাপদ বলিল, "না।"

রাধানাথ বলিল, "কি করে থাকবে বল? গার্জেনের কণ্টকারণ্যে মানুষ হয়েছি। চক্ষু সর্বদা বইয়ের অক্ষরলগ্ন থাকত, অক্ষরের রূপে যে মুগ্ধ ছিলাম তা নয়,—বই থেকে চোখ তুললেই বাবা কিংবা পাঁচ কাকার কেউ-না-কেউ চোখে পড়তেন। ছুটিছাটায় যদি দু'-এক জন বাইরে গেলেন তো সেই ছুটির সুযোগে মামা-পিসেমশাইদের দল এসে আমার ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক হয়ে উঠতেন। তাঁরা ছিলেন উভয়পক্ষ মিলিয়ে সাত জন। শেষে এই তের জনে মাথা একত্র করে বিয়ে দিলেন এমন একটি নিষ্কণ্টক মেয়ের সঙ্গে, যার বাপের সম্পত্তিতে ভাগ বসাবার জন্যে না ছিল বোন, না-ছিল একটা ভাই—যে একটি শালাজেরও সম্ভাবনা থাকবে।....নাও, বলে যাও। আবার মজলিস! এত কড়াকড়ির মধ্যে যে একটি মেয়ে কোন রকমে ঢুকে পড়েছে এই ঢের।"

তারাপদ বলিল, "রাধানাথ চটেছে,—তা চটবার কথা বইকি...."

শৈলেন বলিল, "নয়নতারাদের মজলিসের কথা বলতে যাচ্ছিলাম। আগে বোধ হয় এক জায়গায় বলেছি যে এ-মজলিসে আমি মুক্তগতি

ছিলাম। ছাড়পত্র ছিল বটে, কিন্তু এব পূবে আমি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতাম না। তার কারণ ওদের কথা সব সময় ঠিক মত বুঝতামও না, আর বুঝলেও সব সময় রস পেতাম না। আমার নিজেরও বয়স-সুলভ নেশা ছিল—মাছ ধরা, স্টেশনেব পাথাব দিকে চেয়ে ট্রেনের প্রতীক্ষা করা, এবং ট্রেনের ধোঁয়া দেখা দিলে লাইনে পাথর সাজিয়ে রাখা, ঘুঁড়ি ওড়ান, এই সব। কিন্তু এবার থেকে আমার মস্ত একটা পরিবর্তন দেখা দিল,—মাছ, ঘুড়ি, ট্রেনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব গিয়ে সমস্ত মনটি নয়নতারাদের মজলিসে, নয়নতাবাব—বিশেষ করে নয়নতারার আশ্চর্য চোখ দু'টিতে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল। সে যখন তাস খেলত আমি তার সামনে কারুব পাশে একটু জায়গা করে নিয়ে বসে থাকতাম। নয়নতারা তাস দিচ্ছে, পিঠ ওঠাচ্ছে; তার চুড়িগুলি গড়িয়ে একবার মণিবন্ধেব নীচে, একবার কনুইয়ের কাছে জড়াজড়ি করে পড়ছে; কখন সে তার আনত চোখেব ওপব ভ্রূদুটি চেপে চিন্তিতভাবে মাথা দোলাচ্ছে, তার কপালের কাঁচপোকার ময়ূরকণ্ঠী রঙের টিপটি ঝিক্‌ঝিক্ করে উঠছে, —আমি ঠায় বসে বসে দেখতাম। তখন ছিল কাঁচপোকার টিপেব যুগ, এখন বেচারি আর সুন্দর কপালে ঠাঁই পায় না, তার নিজেরই কপাল ভেঙেছে। আমি প্রতীক্ষা করতাম—জিতলে কখন্ নয়নতারার পান-খাওয়া ঠোঁটে হাসি ফুটবে; হারলে সে যে আমার কাছের মেয়েটিকে চোখ রাঙিয়ে কটুমন্দ বলবে সে-দৃশ্যও আমার কাছে কম লোভনীয় ছিল না। একটা কথা আমি স্বীকার করছি,—আজ যে ভাবে বয়সের দূরত্ব থেকে নয়নতারাকে দেখছি, সে-সব দিন যে ঠিক সেই ভাবেই দেখতাম তা নয়। তখন তার সমস্ত কথাবার্তা চালচলন, হাসি-রাগ আমার কাছে এক মস্তবড় বিস্ময়কর ব্যাপার ব'লে বোধ হ'ত,—যে বিস্ময়ে মনের ওপর একটা সম্মোহন বিস্তার ক'রে মনকে টানে। এ-দিক দিয়ে দেখতে গেলে



আমি ঠায় বসে বসে দেখতাম

মনোবিজ্ঞানের নিক্তির তৌলমত আমার মনোভাবটাকে 'ভালবাসা' না বলে 'ভাল-লাগা' বলাই উচিত ছিল। আমি ভালবাসা বলে যে সূক্ষ্ম

করেছি তার কারণ এর মধ্যে আমার ঐ মনস্তত্ত্বেরই পরখ-মত কিছু কিছু জটিলতা ছিল, সে-কথা পরে যথাস্থানে বলব।

"সেদিন তাসের মজলিস ছিল না, একটা বই পড়া হচ্ছিল। বইটা যে 'ভাগবত' কিংবা 'মনুসংহিতা' নয় এ-কথা বোধ হয় তোমাদের বলে দিতে হবে না। আমি যে বসেছিলাম এটা ওরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি ; তার প্রধান কারণ ওরা নিজেদের খেয়ালে সেদিন খুব বেশি-রকম মশগুল ছিল, আর দ্বিতীয় কারণ—আগে বোধ হয় বলেছি—ওরা সাধারণত আমায় এ-সব বিষয়ে জড়পদার্থের সামিল বলেই ধরে নিত। সেদিন আবার আমি একেবারেই জড়পদার্থ হয়ে গিয়েছিলাম, কেননা, নয়নতারাকে সেদিন যেন আরও অপরূপ দেখাচ্ছিল। আমি বোধ হয় বইটাও শুনছিলাম না সেই জন্যে, তার বটতলা-মার্কা চেহারা মিলিয়ে মোটামুটি তোমাদের কাছে তার কুলশীলটা জানাতে পারলাম, তার নাম ধামটা দিতে পারলাম না।

"এর মধ্যে একটি মেয়ে—নামটা বোধ হয় তার সুধা কি এই রকম কিছু, ঠিক মনে পড়ছে না—আমার দিকে চেয়ে বললে, 'শৈল, ভাই, যা না, আমার সেই কাজটা····দেরি হয়ে যাচ্ছে····'

"অপর এক জন জিজ্ঞাসা করলে, 'কি কাজ রে ?'

"সুধা বললে, 'কিচ্ছু না।'

"সেই মেয়েটা ঠোঁট উল্টে ভ্রূ নাচিয়ে বললে, 'ওরে ব্বাবা ! শুধু আমি জানি আর আমার মন জানে ! ··জিজ্ঞেস করে অপরাধ হয়েছে, মাফ চাইছি !'

"তার রাগটা পড়ল আমার ওপর। নাকটা কুঞ্চিত করে বললে, 'তা তুই এখানে কচ্ছিস কি রে ? আরে গেল ! তুই কি বুঝিস এসব ?'

"অন্য এক জন বললে, তোর পাঠশালা নেই ?"

"কে উত্তর দিলে, 'পাঠশালে তো গুরুমশাই এসব কথা বলবে না, বলে তো দু-বেলা ছেড়ে তিন বেলা গিয়ে সেখানে ধন্না দেয়। ও মিন-মিনেকে চিনিস্ না তোরা!'

"কথাটার জন্যেও এবং আমার মুখের ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটার জন্যেও ওদের মধ্যে একটা হাসি পড়ে গেল।

"এক জন বললে, 'ওর আর দোষ কি? ওদের জাতটাই হ্যাংলা; কি রকম করে চেয়ে রয়েছে দেখ না। যেন পায় তো সবগুলোকে এক এক গেরাসে গিলে খায়।'

"আবার একচোট হাসি। তারই মধ্যে একজন বললে, 'কাকে আগে ধরবি রে?'

"আবার হাসি, আরও জোরে; সব দুলে দুলে গড়িয়ে পড়তে লাগল, ঝড়ে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছগুলো যেমন এলোমেলো ভাবে পরস্পরের গায়ে লুটোপুটি খায়।

"হাসিতে যোগ দিলে না শুধু খন্নু। সে গম্ভীরভাবে বললে, 'আগে ধরবে নয়নকে; সেই থেকে ঠায় ওর মুখের দিকে কি ভাবে যে চেয়ে আছে! কি বয়াটে ছেলে গো মা! নয়ন আবার দেখেও দেখে না।'

"এখন বুঝতে পারছি, তাকে ফেলে নয়নতারাকে দেখবার জন্যেই তার এত আক্রোশ। খন্নুর আসল নাম ছিল ক্ষণপ্রভা। সে ছিল খুব ফরসা, সুতরাং সুন্দরী। এই রঙে-নামে তার চরিত্রের মধ্যে ঈর্ষার ভাবটা প্রবল করে তুলেছিল।

"নয়নতারা যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল; কিন্তু তখনই সে-ভাবটা সামলে নিয়ে বললে, 'দেখতে হয়তো তোকেই দেখবে, আমার মত কালো কুচ্ছিৎকে দেখতে যাবে কেন!'

খন্নু বললে, 'আমায় দেখলে ঠাস্ ঠাস করে ছোঁড়ার দু-গালে চার চড় কশিয়ে দিতাম—নগদ দক্ষিণে।'

"নয়নতারা ততক্ষণে সপ্রতিভ ভাবটা বেশ ফিরিয়ে এনেছে। চকিতে ভ্রূ নাচিয়ে বললে, 'পেট ভরে খাওয়ার পরেই দক্ষিণে হয়, আমায় দেখলে পেটও ভরবে না, দক্ষিণেও নেই।'

এটা প্রশংসা ছিল না, ঠাট্টা; কেন-না, রঙেই সুন্দরী হয় না। হাজার গুমর থাকা সত্ত্বেও খন্নুর যে এটা না জানা ছিল এমন নয়। সে মুখটা ভার করেই রইল।

"তুলনায় নয়নতারাই সবচেয়ে সুন্দরী ব'লে—বিশেষ করে কালো হয়েও সুন্দরী ব'লে—খন্নুর দলেও কয়েকজন মেয়ে ছিল। তার মধ্যে সুধা এক জন। সে অবজ্ঞাভরে ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে বললে,—ঠাট্টা কর নয়ন; কিন্তু খন্নুব মত হ'তে পারলে বর্তে যেতিস—আমি হক্ কথা বলব।'

"নয়নতারা গাম্ভীর্য, মুখভার একেবারেই সহ্য করতে পারত না। গুমটটা কাটিয়ে মজলিসটায় হাসি ফোটাবার জন্যে মুখটা কপট-গম্ভীর করে বললে, 'ওমা, সে আর যেতাম না।' সঙ্গে সঙ্গে খন্নুর দিকে হেলে পড়ে বললে, 'আয় তো খন্নু একটু গায়ে গা ঘষে নি।'

"ফল কিন্তু উল্টো হ'ল। 'হয়েছে' বলে খন্নু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মজলিস ছেড়ে চলে গেল। খানিকটা চুপচাপ গেল, তার পর নয়নতারা হঠাৎ রেগে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'ফের যদি তুই কাল থেকে এখানে এসেছিস্ তো তোর আর ঝিছু বাকি রাখব না। তুই মেয়েদেব মুখের দিকে হাঁ করে কি দেখিস্ রে?....গলা টিপলে দুধ বেরোয়....'

"সবার হাসিঠাট্টা ধমকানির মধ্যে আমার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল; কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললাম, 'আমি কখ্খনও দেখি না।'

"নয়নতারা বললে, দেখিস্; নিশ্চয় দেখিস্; তোর কোন গুণে ঘাট নেই। না যদি দেখিস্ তো এই যে খনী এক ডাঁই মিথ্যে বলে গেল, বোবার মত চুপ করে রৈলি কেন?'

"সুধা শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে উঠে পড়ে বললে, 'খনু মিথ্যে বলে নি; দেখে ও ড্যাব্‌ডেবে চোখ বার ক'রে। পাঁচ বছরেরই হোক আর পঞ্চাশ বছরেরই হোক—বেটাছেলেই তো? আমাদের চোখে কেমন লাগে তাই বলি; থাকলেই বলতে হয়, তার চেয়ে না থাকাই ভাল বাবা!'

"সেদিন আড্ডা আর জমল না। কয়েক জন খনুর সঙ্গে মতৈক্যের জন্যে গেল; বাকি কয়েকজন কথাটা নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করলে, তার পর আকাশে মেঘের অবস্থা দেখে একে একে উঠে যেতে লাগল। আমার অবস্থা হয়ে পড়েছিল 'ন যযৌ ন তস্থৌ; আমাদের পাড়ার ননী উঠতে আমি কোন রকমে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

"ননী মেয়েটি ছিল অত্যন্ত চাপা। সে যে কোন্ দিন কোন্ দলে, টপ্ করে বোঝবার উপায় ছিল না। বোঝা যেত একেবারে শেষের দিকে, যখন সে নিজের নির্বিকারত্ব পরিহার করে তার অভীপ্সিত দলের একেবারে শেষ এবং মোক্ষম কথাটি বলে উঠে যেত। আমি উঠতেই বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ' তুইও যাচ্ছিস নাকি?'

"বললাল, 'হুঁ'।

" 'তা হলে দয়া করে এগিয়ে যাও; ভাব করে সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই—আমি তোমার ভাবের লোক নই।....না হয়, তুই পরেই আসিস্'খন, দিব্যি দু-চোখ ভরে দেখ্ না বসে বসে, আর তো কেউ বলবার রইল না,'—বলে চাবির থোলো-বাঁধা আঁচলটা ঝনাৎ করে পিঠে ফেলে হন্ হন্ করে চলে গেল।

"আমি খানিকটা জড়ভরতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। ননী বেশ খানিকটা চলে গেলে শচী বললে, 'মুয়ে আগুন, গোমড়ামুখী!'

"শচীও চলে গেল। বৃষ্টি তখন এলো বলে। আমি পা বাড়াচ্ছি, নয়নতারা বললে, 'ভিজে যাবি শৈল, একটু বসে যা; চল্, বাড়ির ভেতর।'

"সেদিনটি আমার স্পষ্ট মনে আছে, আশা করি কখনও অস্পষ্ট হবে না। তখনও ভাল করে বিকেল হয় নি, কিন্তু আকাশে গাঢ় মেঘের জন্যে মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যের আর দেরি নেই। মজলিস যখন ভাঙল সে সময় রেলের ওপারে বনের আড়াল থেকে একটা আরও কালো মেঘের ঢেউ যেন মেঘলা আকাশটায় ভেঙে পড়ল, মনে হ'ল দিনটাকে অতি শীঘ্র রাত করে তোলবার জন্যে কোথায় যেন মস্ত বড় তাড়াহুড়া পড়ে গেছে। একটু পরেই ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল।

"রেলের দিকে নয়নতারাদের দুটো ঘর, একটা বড়, একটা অপেক্ষাকৃত ছোট। নয়নতারা একটু এদিক-ওদিক করে এসে ছোট ঘরে রেলের দিকের জানলাটির চৌকাঠের পাশে বসল। আমায় বললে, 'তুই এইখানটায় বস্ শৈল, ভাগ্যিস যাস্ নি, না?'

"বললাম, 'হাঁ, ভিজে যেতাম।'

"জানলাটা দিয়ে অল্প অল্প বৃষ্টির ছাট আসছিল, নয়নতারা হঠাৎ গুটিশুটি মেরে একটু হেসে বললে, একটু একটু বৃষ্টি এসে গায়ে লাগলে কিন্তু বেশ লাগে, তোর ভাল লাগে না শৈল?'

"বললাম, 'না, ভিজে যেতে হয়।' "

রাধানাথ বলিল, "তখন তা'হলে তোমার মাথায় একটু সুবুদ্ধি ছিল বলতে হবে, এখন দেখছি...."

শৈলেন বলিল, "ভুল বলছ, তখন বৃষ্টিতে ভেজা বরং একটা রীতিমত

উৎসব ছিল আমার পক্ষে, কিন্তু সে সময় যা বললাম তা শুধু নয়নতারার কথা ভেবে,—তার ভেজা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল।"

তারাপদ বলিল, "এত দূর?"

শৈলেন বলিয়া চলিল, "নয়নতারা বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি দেখতে লাগল।....তার মুখের আধখানা দেখতে পাচ্ছি,—কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে মুখটা একটু উঁচু করে বসে আছে, মুখটাতে একটা ছায়া পড়েছে, বৃষ্টির ছাটের ছোট ছোট গুঁড়ি মুখের এখানে-সেখানে, চোখের কোঁকড়ান পাতার ডগায়, কপালের চুলে চিকচিক করছে। হঠাৎ কি ভেবে বললে, 'চার দিক মেঘে ঢেকে গেলে মনে হয় সব্বাই—যে যেখানে আছে—সব যেন এক জায়গায় রয়েছি, না রে শৈল?'

"এখন মানে বুঝি, তখন একেবারেই বুঝি নি; তবুও এত তন্ময় আর অন্যমনস্ক ছিলাম যে কিছু না ভেবেই বলে দিলাম, হ্যাঁ।'

"নয়নতারা বোধ হয় নিজের ঘোরে বলেছিল কথাটা, কোন উত্তরের অপেক্ষায় বা আশায় নয়। আমার দিকে একটু চেয়ে রইল। আরও খানিকক্ষণ চুপচাপের পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'মেঘ তোর কেমন লাগে শৈল?'

"সামান্য যেন একটু কুণ্ঠা, তার পরেই বললে, 'মেঘ কালো কিনা, তাই জিগ্যেস করছি, বিদ্যুৎ বরং ঢের সুন্দর....'

"আমি উত্তর দিলাম, 'বেশ লাগে মেঘ।'

"ঠিক মনে পড়ছে না, তবুও যেন বোধ হ'ল নয়নতারার চোখের তারা একটুখানির জন্যে কি রকম হয়ে গেল। হ'তে পারে এটা আমার আজকের সজাগ মনের ভুল বা অপসৃষ্টি, কিন্তু এই রকম বর্ষা পড়লেই সেদিনকার সেই ছবিটি যখন ফুটে ওঠে, দেখি নয়নতারার চোখ দুটি যেন একটু নরম হয়ে উঠল।



...তার মুখের আধখানা দেখতে পাচ্ছি

"একটু পরে আবার বললে, 'ক্ষণপ্রভা মানে বিদ্যুৎ—ঐ যে খেলে গেল....খনীর নাম....

"আমি সরস্বতী দেবীর অতটা বিরাগভাজন হ'লেও কি ক'রে জানি

না, এই অসাধারণ কথাটার মানে অবগত ছিলাম। সেইটিই পরম উৎসাহে বলতে যাব এমন সময় নয়নতারা হঠাৎ জানলা থেকে নেমে এসে আমার সামনে বসে পড়ল, এবং আমার মুখের পানে কি এক রকম ভাবে চেয়ে বলে উঠল, 'তুই আমায় অত করে দেখিস্ কেন রে শৈল? আমি তো কালো!....

"এখন আমিও বুঝেছি, তোমরাও বুঝছ আসল ব্যাপারটা কি—অর্থাৎ নয়নতারাকে সেদিন বর্ষায় পেয়েছিল, নবোঢ়ার মন পাড়ি দিয়েছিল তার দয়িতের কাছে;—আকাশে ওদিকে বর্ষা, সে এদিকে মনে মনে শৃঙ্গার করেছে, তার পরে আমার চোখের মুকুরে নিজের রূপটি দেখে নিয়ে সে যাবে....সে কালো, তাই তার অপূর্ণতার ব্যথা, খন্নুর সঙ্গে তুলনা।

"সেদিন আমি এ-কথাটা বুঝি নি, বোঝবার সম্ভাবনাও ছিল না। সেদিন এই বুঝলাম যে আমার জন্যেই নয়নতারা এ প্রশ্নটা করছে, সে বলছে—তোমার যদি ভাল লাগে তাহ'লেই আমার রূপের আর জীবনের সার্থকতা—আমার সমস্ত জীবন-মরণ নির্ভর করছে তোমার একটি ছোট উত্তরের ওপর....

"আমি তখন যা ভেবেছিলাম তা গুছিয়ে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে সেদিন নয়নতারা আমায় আমার বয়সের গণ্ডি থেকে তুলে নিয়ে আমায় পৌরুষের জয়টীকা পরিয়ে দিলে, আমার হ'ল প্রেমের অভিষেক।

"প্রবল কুণ্ঠায় এবং কেমন একটা সশঙ্ক আনন্দে আমি মুখটা নামিয়ে নিলাম, উত্তর দিতে পারলাম না। উত্তর দিলে কথাটা তখনই পরিষ্কার হয়ে যেত, কেন-না নয়নতারা সেদিনকার নিভৃতে যেমন নিঃসংকোচে আরম্ভ করেছিল তাতে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার বরের কথা এনে ফেলতই। যদি বলতাম, 'তবুও—অর্থাৎ কালো হ'লেও তুমি খুব সুন্দর,

—সে হয়তো বলত, 'তোর কথার সঙ্গে 'ওর' কথা মিলে গেছে, শৈল,—মেলে কি না তাই দেখবার জন্যে জিগ্যেস করছিলাম।' —কিংবা এই রকম কিছু, কেন-না এই ধরণেরই একটা কথা তার মনে ঠেলে উঠছিল।

"ফলে, সত্যের আলোয় যে ধারণাটা তখনই নিরর্থক হয়ে যেতে পারত, মিথ্যার, অর্থাৎ ভ্রান্তির অন্ধকারে সেটা আমার জীবনে একটা অপূর্ব সার্থকতা লাভ করলে। আমার ভালবাসার তন্তু এতদিন শূন্যে দুলছিল, আশ্রয়-শাখা এগিয়ে এসে তাকে স্পর্শ করলে। বোধ হয় এত দিন আমার শুধু ভাল লাগছিল মাত্র, সেদিন থেকে আমি নিঃসন্দেহ ভালবাসলাম, আমার ভালবাসবার ইতিহাসে দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হ'ল।"

তারাপদ বলিল, "তোমার গল্পটা মন্দ লাগছে না, তবে জিনিসটাকে ভালবাসা বলায় স্পর্ধার গন্ধ আছে, যদিও এ ভ্রান্তির জন্য আমরা তোমায় ক্ষমা করতে রাজি আছি, কেন-না ভ্রান্তিই কবির ধর্ম।'

রাধানাথ বলিল, "কেন-না, কবি বিধাতার ভ্রান্তিই।'

শৈলেন বলিল, "না, সেটা ভালবাসাই, কেন-না এবার থেকে যা লক্ষণ সব প্রকাশ পেতে লাগল তা ভালবাসার একেবারে নিজস্ব জিনিস—ট্রেডমার্কা দেওয়া।....একটি গুরুতর লক্ষণ দাঁড়াল—ঈর্ষা।

"হ্যাঁ, তার আগে সেদিনকার কথাটা শেষ করে দিই। উত্তর না পেয়ে নয়নতারা আমার মুখটা দুটো আঙুল দিয়ে তুলে ধরে বললে, তোর বুঝি আবার লজ্জা হ'ল।

বোধ হয় তার প্রশ্নের জটিলতাটা উপলব্ধি করলে এতক্ষণে। একটু কি ভাবলে, তার পর আমার হাতটা ধরে একটু গলা নামিয়ে বললে, আমি তোকে ও-কথাটা জিজ্ঞেস করেছি, কাউকে বলিস্ নি যেন শৈল,

বলবি না তো? ব'স্, আমি আসছি'—বলে চলে গেল; অবশ্য আর এল না সেদিন।"

শৈলেন একটু চুপ করিল। রাধানাথ বলিল, "বৃষ্টি তোমার কবিত্বের গোড়ায় জল জোগাচ্ছে বটে শৈলেন, কিন্তু ওদিকে তারাপদর কার্পেটটা ভিজিয়ে তার সমূহ অপকার করছে, আতিথেয়তায় ত্রুটি হয় বলে বোধ হয় ও-বেচারা...."

তারাপদ তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, শৈলেন বলিল, "দাও বন্ধ ক'রে।"

বন্ধ জানলার উপর ধারাপাতের জন্য মনে হইল বৃষ্টিটা যেন হঠাৎ বাড়িয়া গেল। শৈলেন চোখ বুজিল, যেন কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। তারাপদ আর রাধানাথ বুঝিল সেদিন নয়নতারাকে যেমন বর্ষায় পাইয়াছিল আজ ঠিক সেই ভাবে পাইয়াছে শৈলেনকে। শৈলেনের গল্প আর বাহিরের বর্ষা বোধ হয় তাহাদের ভিতরের গদ্যাংশও কিছু কিছু তরল করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা শৈলেনের মৌনিতায় আর বাধা দিল না।

একটু পরে যেন একটা অতল তরলতা হইতে ভাসিয়া উঠিয়া শৈলেন বলিল, "হ্যাঁ, কি বলছিলাম? ঠিক, ঈর্ষার কথা। যখন আমার ভাল-লাগার খাদ মরে গিয়ে সেটা ভালবাসায় দাঁড়াল, সেই বরাবর থেকে একটি নির্দোষ, নিরীহ লোক আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল,—সাক্ষাৎ ভাবে আমার কাছে কোন অপরাধ না ক'রেও। এই লোকটি নয়নতারার স্বামী অক্ষয়।

"অক্ষয়ের পরোক্ষ অপরাধ এই যে, সে নয়নতারাকে বিবাহ করেছে। ঘটনাটি প্রায় এক বৎসরের পুরনো, কিন্তু এতদিন এতে ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কেন-না, অক্ষয় এতদিন একটি নির্বিঘ্ন নেপথ্যে অবস্থান করছিল। বর্ষায় সে দিন নয়নতারার যে নূতনতর আলো ফুটে উঠল, সেই আলোতে

হঠাৎ অক্ষয় দুর্নিরীক্ষ্য ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অনেক কথা, যা কখনও ভাবিও নি, তা শুধু ভাবনার নয়, একেবারে দুর্ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল। নয়নতারা আমায় খুবই ভালবাসে—আমার জন্যে নারকেল-নাড়ু চুরি করে রাখে, ছেঁড়া কাপড়ের রুমাল তৈরী ক'রে তাতে রেশমের ফুল তুলে দেয়, ঘুড়ির, ডালপুরীর পয়সা জোগায়, গুরুমশাইয়ের বেতের দাগ পড়লে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে রুচিকর ভাষায় গুরুমশাইয়ের আত্মশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেছে—জীবনের অমূল্য সম্পদ এসব; কিন্তু তার সামান্য একটি চিঠি পাবার কি পাঠাবার আগ্রহ আজ হঠাৎ এসবকে যেন নিষ্প্রভ অকিঞ্চিৎকর করে দিলে। সে আগ্রহটা আমার প্রতি তার সাক্ষাৎ আচরণের কাছে সামান্যই একটা ব্যাপার—কে পৃথিবীর কোন্ এক কোণে পড়ে আছে, তার সঙ্গে দুটো অক্ষরের সম্বন্ধ, কিন্তু এটাও আমার অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। ষোল আনার মধ্যে সাড়ে পনর আনা আমিই পাচ্ছি, কিন্তু ওদিকে যে ঐ দুটো পয়সা যাচ্ছে, ওটুকু বরদাস্ত করা—যতই দিন যেতে লাগল—ততই আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল।

"ঠিক এই সময় একটি ব্যাপার ঘটল যা অবস্থাটিকে ঘনীভূত করে তুললে।

"একদিন সুধার একটা খুব জরুরি চিঠি ডাকে দিতে যাচ্ছি। স্টেশনটা ছাড়িয়েছি, এমন সময় স্টেশনের গেট দিয়ে অক্ষয় বেরিয়ে এল। সেই ট্রেন থেকে নেমেছে। চুল উস্কখুস্ক, মুখ শুকনো। আমায় দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বললে, 'এই যে শৈলেনভায়া!—মানে—ইয়ে—এরা সব কেমন আছে বলতে পার?'

"তখন 'এরা'-র মানে আমি বুঝি, না বোঝাই অস্বাভাবিক, বললাম, 'ভাল আছে।'

"অক্ষয়ের মুখটা যেন অনেকটা পরিষ্কার হ'ল। আমার হাতটা ধ'রে জিগ্যেসা করলে, 'পথ্যি পেয়েছে?—কবে পেলে—অ্যাঁ?'

"আমি বিস্মিত হয়ে চুপ করে রইলাম, তারপর বললাম, 'কই তার তো অসুখই করে নি!'

"অসুখ করে নি! তবে?'—ব'লে অক্ষয়ও খানিকটা আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে, আস্তে আস্তে চোখ ঘুরিয়ে কি ভাবলে, তার পর মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, 'দেখ, কাণ্ড। আচ্ছা তো!....তুমি বুঝি চিঠি ফেলতে যাচ্ছ?—কোন্ দময়ন্তীর?'

"নয়নতারাকে লেখা পত্রে অক্ষয় আমার সম্বন্ধে প্রায়ই উল্লেখ করত—'হংসদূত' বলে, তা নিয়ে চিঠি পড়বার সময় চর্চা হ'ত। সুতরাং দময়ন্তী কথাটার অর্থ বুঝতে আমার অসুবিধে হ'ল না। বললাম, 'সুধাদিদির!'

"ঐ তো লেটার-বক্স,—যাও,—ফেলে দিয়ে এস। এক সঙ্গে যাওয়া যাবে'খন।'

"ভালবাসা যখন জমে আসছে, তার মধ্যে অক্ষয়ের এসে পড়াটা আমার মোটেই প্রীতিকর হয় নি, কিন্তু ফিরে আসতে আসতে যখন শুনলাম নয়নতারার এই মিথ্যাচরণের জন্যে তাকে কি নাকালটা ভোগ করেই চলে আসতে হয়েছে তখন আমার মনটা খুবই খুশি হয়ে উঠল। বেচারা আফিস থেকে বাড়িও যেতে পারে নি; যখন স্টেশনে, তখন ফার্স্ট বেল হয়ে গেছে, ছুটতে ছুটতে শানবাঁধান প্লাটফর্মে পিছ্‌লে পড়ে গিয়ে হাঁটুটা গেছে কেটে, হাতটা গেছে ছড়ে; কাপড়ে রক্তের দাগ দেখিয়ে বললে, 'এই দেখ কাণ্ডটা!'

"এটার আকস্মিকতাটা আমি আর ধরলাম না; আমার মনে হ'ল দারুণ দুর্ভাবনায় ফেলা থেকে নিয়ে প্লাটফর্মে আছাড়-খাওয়ান পর্যন্ত সমস্তই

নয়নতারার কীর্তি,—সৎকীর্তি. আমার মনটা নয়নতারার ওপর প্রসন্নতায় ভরে উঠল এবং অক্ষয়কে চিঠি লেখবার জন্যে, আর তার চিঠির প্রতীক্ষা করবার জন্যে যে মনে মনে একটা অভিমান এবং আক্রোশের ভাব ঠেলে উঠছিল সেটা একেবারে কেটে গেল। বুঝলাম—এত যে চিঠি তার মধ্যে এই নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় জীবটিকে প্লাটফর্মে আছাড় খাওয়াইবার একটা গূঢ় অভিসন্ধি জমে উঠছিল। অক্ষয়ের প্রতি আমার মনের ভাবের সঙ্গে বেশ একটা নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করলাম।

"তার পরদিন দুপুরের মজলিস বেশ জমাট রকম হ'ল—প্রায় ফুল হাউস্। কিন্তু কথাবার্তা প্রশ্নোত্তর বেশির ভাগই চাপা গলায় হওয়ায় এবং বিতর্কের ভাগটা কম থাকায় গোলমাল বেশি হ'ল না। আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি পুকুরের ওপারে কামিনীতলায় বসে মাঝে মাঝে হাসির হর্‌রা শুনছিলাম আর অক্ষয়কে আমার এই নির্বাসনের জন্যে দায়ী করে মনের নির্বাণপ্রায় রাগের শিখাটিকে আবার পুষ্ট করে তুলছিলাম।

"প্রথম পর্ব শেষ হ'লে তাস পড়ল। নয়নতারা আমার বাড়ি থেকে কি একটা আনতে বললে; এনে দিয়ে আমি দলের পাশে আমার জায়গাটিতে বসলাম। সুধা একবার আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, 'ছেলেটা কি গো?—তাড়ালে যায় না!'

"কে বললে, 'জাত-ই ঐ রকম। এর পরে একবার 'তু' করলে হাঁটু ছেঁচে, রক্ত-মাখামাখি হয়ে ছুটে যাবে।....আহা....

"তাসের দান দেওয়ার মধ্যে হাসির হর্‌রা ছুটল। খানিকক্ষণ কাটল।

"নয়নতারার চোখের আর একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে. নীচের দিকে চাইলে চোখের সুপুষ্ট, মসৃণ পাতা দুটি এমন নিরবশেষভাবে চোখ দুটিকে

ঢেকে ফেলত যে মনে হ'ত যেন সে চোখ বুজে আছে। পরে পত্রলেখা উপলক্ষে আমি এই জিনিসটিকে কিশলয়ে-ঢাকা কুঁড়ির সঙ্গে তুলনা করেছি। বেশিক্ষণ এই ভাবে চিন্তা করলে মনে হ'ত যেন সে ঘুমুচ্ছে; কিন্তু তার চোখের গড়নই অপরের চোখে এই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাত বলে কেউ বড়-একটা টুকত না। সেদিন কিন্তু হাতের তাসের দিকে নজর রেখে প্রায় মিনিট দু-তিন ওরকম ভাবে থাকবার পর নয়নতারার মাথাটা হঠাৎ সামনে ঢুলে পড়ল। খনু বললে, 'ওমা নয়ন, তুই যে সত্যিই ঘুমুচ্ছিস লা! আমরা ভাবছি....'

"নয়নতারা একেবারে হকচকিয়ে উঠল, প্রথমটা অপ্রতিভ ভাবে বললে, 'ধ্যাৎ, কই, যাঃ'....সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বিরক্তিতে কুঞ্চিত করে বললে, 'না ভাই, সারারাত জাগিয়ে রাখা ভাল লাগে না। কবে যে যাবে—আপদ....'

"এইটুকুই যথেষ্ট ছিল; আমার মধ্যেকার নাইট্—যে বীরকে তোমরা কঙ্কাবতীর সন্ধানে পাতালপুরীতে দেখে থাকবে—প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আমি আপদ বিদায়ে একেবারে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলাম।

"সেদিন সন্ধ্যের সময় জামার মধ্যে হাত গলাতে গিয়ে দুটি লুকোন বিছুটি-ডগার সংস্পর্শে যন্ত্রণা, আর শ্বশুর-বাড়িতে সে-যন্ত্রণা রাখবার ভদ্রতার মাঝে পড়ে অক্ষয় অস্থির হয়ে পায়চারি করলে খানিকটা। তার পরে বোধ হয় ডাকছেড়ে কাঁদবার সুবিধের জন্যে বেড়াতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যেই জুতোয় পা ঢোকাবে—'উঃ' করে এক রকম চীৎকার করেই পা-টা বের করে নিলে—এক মুঠো শেয়াল-কাঁটায় পা-টা সজারুর মতো হয়ে উঠেছে।

"বাড়িতে একটা হৈ-হৈ পড়ে গিয়ে সকলে সাবধান হয়ে পড়ায় আর তখন কিছু নতুন উপদ্রব হ'ল না; কিন্তু অক্ষয় সন্ধ্যের পর বেরিয়ে যেই

বাড়িতে ঢুকবে, অন্ধকারে একটা ঢিল বোঁ করে তার কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং চীৎকার করে রাংচিতের বেড়া টপকাবার আগেই আর একটা সজোরে এসে তার মাথায় লাগল।

"সে-সময় হাজার তল্লাস করেও আততায়ীর সন্ধান পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু তোমাদের বোধ হয় বুঝতে বাকি নেই যে সে মহাপুরুষটি কে।

"তোমাদের যদি নিজের নিজের গায়ে হাত দিয়ে বলতে বলা হয় তো নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে আজন্ম-কলিকাতাবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুটি জিনিসকে বেশি ভয় করে,—সাপ আর ভূত; আর তাদের বিশ্বাস ওদিকে লিলুয়া আর এদিকে দমদমার পরে সমস্ত ভূভাগ এই দুই উপদ্রবে ঠাসা। অক্ষয় যখন নিঃসন্দেহ হ'ল যে এটা বাড়ির কারুর ঠাট্টা নয়, তখন তার এ সন্দেহও রইল না যে, সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে ভৌতিক। সে রাতটা নিরুপায়ভাবে কোন রকমে কাটালে এবং তার পরদিন দুপুরে—অর্থাৎ রাত্রি হবার এবং তার সঙ্গে সেই উৎকট রকম ঠাট্টাপ্রিয় অশরীরীর আবির্ভাব হওয়ার ঝাড়া পাঁচ-ছ' ঘণ্টা পূর্ব্বে সে বেচারি হাওড়া-মুখো গাড়িতে গিয়ে বসল।

"সেদিন আমি ওদিকে যেতে পারি নি—শেতলা-তলায় যাত্রার আসরের জন্যে কাগজের শেকল তৈরি করতে ধরে নিয়ে গেল।

"তার পরের দিন কিছু সকালেই আমি বিজয়ী বীরের মতো গিয়ে নয়নতারাদের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। সে নিশ্চয়ই সমস্ত রাত নিরুপদ্রবে ঘুমিয়ে এতক্ষণ উঠেছে। এইবার গিয়ে তার ত্রাণকর্ত্তা যে কে সেটা জানিয়ে বিস্ময়ে আহ্লাদে, কৃতজ্ঞতায় তাকে অভিভূত করে ফেলতে হবে।

"গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা রইল না। —পুকুরঘাটের শেষ রাণাটিতে, মুখ ধোওয়ার জন্যে বাঁ-হাতে খানিকটা

ছাই নিয়ে নয়নতারা নিঝুম হয়ে বসে আছে। চুল উস্কখুস্ক, মুখটা খুব শুকনো, চোখ দুটো ফুলোফুলো আর রাঙা।

"আমি গিয়ে বসতে একবার ফিরে দেখলে, তার পর চিবুকটা হাঁটুর ওপর রেখে, চোখ নীচু করে বসে রইল।

"প্রথমটা মনে হ'ল অক্ষয় সব আক্রোশ নয়নতারার ওপর মিটিয়ে গেছে। কি ভাবে যে একটা কথা জিগ্যেস করব ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। চেয়ে আছি, হঠাৎ দেখি তার দু-চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল নামল। আশ্চর্য্যের ভাবটা চাপতে না পেরে বলে উঠলাম, 'কাঁদছ যে তুমি!—কাঁদছ কেন?"

"যাঃ, কাঁদছি কোথায়?'—বলে নয়নতারা আঁচল তুলে চোখ দুটো মুছে ফেললে। একবার, দু-বার, তার পর বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মতো এত জোরে অশ্রু নামল যে আর আঁচল সরাতে পারলে না, চোখ দুটো চেপে ধ'রে বসে রইল। একটু পরেই ফোঁপানির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা দুলে দুলে উঠতে লাগল।

"খানিকক্ষণ এইভাবে গেলে বেগটা যখন কমে এল, আঁচলের মধ্যে থেকেই কান্নার ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে, 'অত কাকুতিমিনতি করে, মিথ্যে অসুখের কথা লিখে নিয়ে এলাম শৈল, মার খেয়ে গেল! কে মারলে বল্ দিকিনি?—কার কি করেছিল সে?—নিরীহ, নির্দোষ মানুষ····,

"আর বলতে পারলে না, ভেঙে পড়ল।

"ঠিক সেই সময়টিতে নয়নতারার কান্নার মধ্যে বিনিয়ে-বিনিয়ে কথাগুলো শুনে, এবং কতকটা নিজের অপরাধের জ্ঞানের জন্যেও আমিও কান্নাটা থামাতে পারলাম না বটে, কিন্তু সেই দিনই কোন একটা সময় থেকে, নয়নতারার এই রকম পক্ষপাতিত্বের জন্যে অক্ষয়ের উপর বিদ্বেষ আর হিংসার ভাবটা একেবারে উৎকট হয়ে উঠল।

"ছেলেবেলার চিন্তাগুলো ঠিক গুছিয়ে মনে আসে না, অন্তত যা মনে আসত তা এত দিনের ব্যবধান থেকে গুছিয়ে বলা যায় না। শুধু মনে পড়ছে এই পক্ষপাতিত্বের জন্যে—যেটা নিছক নয়নতারারই দোষ—আমি নয়নতারার ওপর না চটে চটলাম অক্ষয়ের ওপর। লোকটাকে যে নয়নতারা আসবার জন্যে সত্যিই কাকুতিমিনতি করে লিখেছিল—প্লাটফর্মে আছাড় খাওয়াবার অভিপ্রায়ে যে ডাকেনি—তাকে যে নয়নতারা নির্দোষ বলে—এই সব হ'ল অক্ষয়ের অমার্জনীয় অপরাধ ; আর সবচেয়ে বড় অপরাধ হ'ল তার বিবাহ করাটা, যার জন্যে নয়ন তাকে কাকুতিমিনতি করে ডেকেছে, আর আমি অত কষ্ট করে তার মাথা ফাটালে তাকে নির্দোষ বলেছে, তার জন্যে চোখের জল ফেলেছে।"

শৈলেন চুপ করিল। তারাপদ প্রশ্ন করিল, "তোমার গল্প শেষ হ'ল নাকি? উপসংহার কোথায়?"

শৈলেন বলিল, "ভালবাসা তো গল্প নয় যে উপসংহার থাকবে,—বইয়ের দুটি মলাটের মধ্যে তার আদি-অন্ত মুড়ে রাখা যাবে। তবুও যদি ভালবাসাকে গল্প-উপন্যাসের সঙ্গেই তুলনা কর তো বলা যায় তার উপসংহার নেই, মাত্র অধ্যায় আছে ; সে কোন এক অনির্দিষ্ট সময়ে একবার আরম্ভ হয়, তার পর অধ্যায়ের পর অধ্যায় সৃষ্টি করে তার অফুরন্ত গতি...."

"সে সময়ের অধ্যায়টিই না-হয় শেষ কর।"

"সেটার শেষ ছিল একটা সামান্য চিঠি। একদিন নয়নতারা আমায় অক্ষয়ের নামে একটা চিঠি তাকে ফেলে আসতে দিয়ে হঠাৎ থমকে মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'হ্যাঁ রে, তুই চিঠি খুলে পড়িস্ নে তো? খবরদার আর এই ৭৪॥ দেওয়া রইল, পড়লে বুকে ব্যথা হবে।'

"আমার যে বুকে একটা ব্যথা ছিলই নয়নতারা সে খবর রাখত না।

"এর আগে কখনও কারুর চিঠি খুলি নি, কিন্তু সেদিন আমি পোস্টাপিসের রাস্তাটা একটু ঘুরে বাড়ি এলাম এবং একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে চিঠিটা খুললাম।

"৭৪॥ এর দিব্যিটা আমার হাতে হাতে ফলল। সে যে কী বিনিয়ে-বিনিয়ে লেখা চিঠি—কত ব্যাকুলতা, কত আদর, কত আশ্বাস, ফিরে আসবার জন্যে কত মাথার দিব্যি!—এবার নয়নতারা তাকে বুকে করে রাখবে, যে শত্রুতা করেছে তার সমস্ত অত্যাচার নিজের সর্বাঙ্গে মেখে নেবে; অক্ষয় ফিরে আসুক,—নয়নতারার চোখে ঘুম নেই—কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছে—এসে একবার দেখুক অক্ষয়, একবার দেখুক এসে তার অত আদরের নয়ন কি হয়ে গেছে....

"এত চায় সে অক্ষয়কে?—ক্ষোভে, ঈর্ষায় অসহায়তায় আমার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা ঠেলে উঠতে লাগল। সেদিন ঢিল কুড়োবার সময় কি করে একটা পুরনো ভাঙা শাবল হাতে উঠেছিল। কি ভেবে সেইটেরই সদ্ব্যবহার করি নি। সেই আপশোষে ছটফট করতে লাগলাম।

"বোধ হয় সেদিনকার ঢিল ছোঁড়বার কথা মনে হওয়ার জন্যেই মনে পড়ে গেল যে অক্ষয় সমস্ত কাণ্ডটা ভৌতিক ভেবেই তাড়াতাড়ি পালিয়ে-ছিল। আমার মাথায় একটা সুবুদ্ধি এসে জুটল।

"আমি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে কালি-কলম নিয়ে এলাম এবং আমার লেখার খাতা থেকে খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে খুব জোরে ঢিল ছুঁড়তে পারে এই রকম জবরদস্ত ভূতের হাতের উপযোগী মোটা মোটা অক্ষরে, চন্দ্রবিন্দু সংযুক্ত ভূতোচিত শুদ্ধ ভাষায় লিখলাম, খঁবরদার, এঁবার এঁলে এঁকেবারে ঘাঁড় মঁটকে তোঁর রঁক্ত খাঁব—এবং আমি যে ভূত, এটা প্রমাণ দিয়ে

ভাল করে বিশ্বাস করবার জন্যে জুড়ে দিলাম, 'আমি থাঁমের মধ্যে ঢুকে সব পড়েছি। আমার সঙ্গে চালাকি ?"

"তোমরা হাসছ ? কিন্তু এর পরেই আমার অবস্থা অতিশয় করুণ হয়ে উঠল, কেন-না, এ-ভূতের নামধাম পরিচয় বের করতে খুব বেশি রকম বিচক্ষণ রোজার দরকার হ'ল না। তার ভূতপূর্ব কীর্তিও সব ধরা পড়ে গেল—ভূতপূর্বই বল কিংবা অদ্ভুতপূর্বই বল।....বৃষ্টিটা কি থেমে আসছে ?"

শৈলেন আবার খানিকটা চুপ করিল। তারপর বলিল, "এর কয়েক দিন পরে এসে বাবা আমায় বিদেশে তাঁর কর্মস্থানে নিয়ে গেলেন। তার পর আর নয়নতারার সঙ্গে দেখা নেই।"

তারাপদ বলিল, "কিন্তু কি যেন অফুরন্ত অধ্যায়ের কথা বলছিলে ?"

শৈলেন বাহিরের ম্রিয়মাণ বর্ষার বিলম্বিত মৃদঙ্গ কান পাতিয়া শুনিতেছিল, আত্মসমাহিত ভাবে বলিল, "হ্যাঁ, তবে একটু ভুল হয়েছিল, —অধ্যায় নয় সর্গ,—জীবনের পাতা একটির পর একটি পূর্ণ করে ভাল-বাসার করুণ গাথা সর্গের পর সর্গ সৃষ্টি করে চলেছে...."

রাধানাথ বলিল, "তুমি কবি, হিসেবের গন্ধকে নিশ্চয় এড়িয়ে চল ; তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমার আট বৎসরের সময় নয়নতারার বয়স যদি পনর বৎসর ছিল তো তোমার এখন পঁয়ত্রিশ বৎসরে সে বিয়াল্লিশ বৎসর অতিক্রম ক'রে ...."

শৈলেন উঠিয়া বসিল, বলিল, ভুল বলছ তুমি,—নয়নতারার বয়স হয় না। আমার প্রেম তার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকে অমরত্ব দিয়েছে তার পরের নয়নতারা—সে তো আমার জীবনে নেই। আমার নয়নতারা —এখনও সেই পুকুরঘাটটিতে সখীপরিবৃতা হয়ে বসে; রূপে রসে, পূর্ণতায় উজ্জ্বল। তার কত দিনের কত কথা, ভঙ্গি, তার আশ্চর্য চোখের

পরমাশ্চর্য চাউনির খণ্ড খণ্ড স্মৃতি আমার জীবনে এক-একটি অখণ্ড কাব্যের মধ্যে রূপ ধরে উঠেছে। যখন আমি থাকি প্রফুল্ল—ত্রিশ বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধানের ওপারে দেখি নয়নতারা হাসিতে, কপট গাম্ভীর্যে কিংবা অকপট কৌতুকপ্রিয়তায় ঝলমল করছে; তার চিক্কণ চুলের নীচে, ঘোরাল গালের প্রান্তে পারসী মাকড়িটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে;—আমি যখন থাকি মৌন, বিমর্ষ, তখন বিকেলে নয়নতারার আকাশ ঘিরে বর্ষা নামে—রেলের ধারের ঘরটিতে মেঘের ওপর চোখ তুলে নয়নতারা নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে থাকে, মেঘবিলুপ্ত সান্ধ্য সূর্যের মত কানের পারসী মাকড়ি কেশের মধ্যে ঢাকা, আমার দিকে ফেরান গালটিতে একটা অশ্রুবিন্দু টলমল করছে....

"আমি জীবনে আর কাউকেই চাই নি, আমার জীবনের চিত্রপটে নয়নতারাকে অবলুপ্ত ক'রে আর কারুর ছবিই ফুটতে পায় নি। পনর বৎসরের অটুট যৌবনশ্রীতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তারই ওপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি আমি তাকে অতিক্রম ক'রে আমার পঁয়ত্রিশ বৎসরে এসে পড়েছি—সূর্য যেমন যৌবনশ্যামলা পৃথিবীকে অতিক্রম ক'রে অপরাহ্ণে হেলে পড়ে। আজকের এই বর্ষায় কি তোমরা কথাটা অবিশ্বাস করতে পারবে?"

তারাপদ বলিল, "আমরা স্বয়ং তোমার বিশ্বাসের জন্যে ভাবিত হয়ে উঠছি— কেন-না, বর্ষাটা গেছে থেমে।"

১৩৪৪।

উপবাসী

[১]

রূপচাঁদ রাস্তার ধারে একটা শুকনো গুঁড়ির উপর পা দুইটা গুটাইয়া বসিয়া চিন্তিতভাবে একটা চোরকাঁটার শীষ দাঁতে খুঁটিতেছিল। আজ সকাল হইতেই তাহার মনটা বড় অপ্রসন্ন। তাহার কারণ বোসেদের মেয়ে নেড়ীর আজ বিবাহ। পাকাদেখার দিন হইতেই সে সমস্ত ভণ্ডুল করিবার মতলব আঁটিতেছে, কিন্তু কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কাল গায়ে-হলুদটা হইয়াই গেল। আজ রাত্রে বিবাহ, একটু পরেই, এই সাড়ে দশটার গাড়ীতে বর আসিবে; এই পথ দিয়া বাজনা-বাদ্য করিয়া যাইবে! নিতান্ত অপ্রীতিকর বস্তুর যে একটা নিগূঢ় মোহ থাকে তাহারই টানে রূপচাঁদ পথের উপরটিতে আসিয়া বসিয়া আছে।

কাজিপাড়ার রহমৎ আসিয়া পাশটিতে বসিল। চুপ করিয়া খানিকটা পা দুলাইয়া, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "কিছু উপায় ঠাওরাতে পারলি রে রূপো?"

রূপচাঁদ ঠোঁট আর নাক একত্র করিয়া মাথা নাড়িল,—না, পারে নাই। রহমৎও—বোধ হয় সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ—একটা চোরকাঁটার শীষ তুলিয়া লইয়া দাঁতে খুঁটিতে লাগিল। খানিকক্ষণ নীরবেই গেল, তাহার পর ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, তোদের দু-জনের মধ্যে কি খুব বেশি ভালবাসা হয়েছিল?"

রূপচাঁদ এবারেও কথা কহিল না, মাথা নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ।



কিছু উপায় ঠাওরাতে পারলি ?

রহমৎ কথাটাতে একটু টান দিয়া গভীর দুশ্চিন্তার সহিত বলিল, “তবেই তো !” আবার শীষ চিবাইতে লাগিল !

একটু পরে গুঁড়িটার ওপর গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা একটা কথা জিগ্যেস করব, বলতে আপত্তি আছে? মানে, বিয়ের কথা হবার পর তোকে কিছু বলে ছিল কি?—যেমন ধর্, বিষ খেয়ে মরব, কি গলায় দড়ি দোব?....তা যদি বলে থাকে তো...."

রূপচাঁদ বলিল, "কিছুই বলে নি।"

রহমৎ কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, "কিছুই বলেনি!—তবে তো আরও ভাবনার কথা। তোর ঘাড়ে শেষ পর্যন্ত একটা স্ত্রীহত্যার পাপ না চাপে!.."

রূপচাঁদ চোরকাঁটার শীষটা সরাইয়া লইয়া খানিকটা উদ্বেগের সহিতই প্রশ্ন করিল, "কেন?"

রহমৎ এখানে ছোক্‌রা-মহলে প্রেম সম্বন্ধে এক বিশেষজ্ঞ। বয়সের অনুপাতে বাংলা নভেলে তাহার জ্ঞান খুব সুগভীর, তাহা ভিন্ন বাড়ীতে ফারসী ভাষার একটু-আধটু চর্চ্চা থাকায় বুলবুল, বাগিচা থেকে আরম্ভ করিয়া লয়লা-মজনু প্রভৃতি পশ্চিম-সীমান্তের ওদিককার ব্যাপারের সঙ্গে তাহার এক রকম সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বলিল যদি সত্যিকার ভালবাসা হয়—মানে, সে যদি সত্যিই লয়লা হয় আর তুই যদি সত্যিই মজনু হোস্ তো যে-মুহূর্ত্তে তোদের প্রথম চোখোচোখি হয়েছিল সেই মুহূর্ত্তেই চোখের রাস্তা দিয়ে তোর দিল্ ওর দিলের কাছে গিয়ে তার গার্জেন হয়েছিল—যাকে ফার্সীতে বলে ফিরস্তা। তা হ'লে হ'লনা? তোকে না পেয়ে ও যদি সত্যি একটা কিছু করে বসে তো তোর গুনাহ্ অর্থাৎ পাপ লাগল না?"

রূপচাঁদ অত্যন্ত গুরুতর কিছু একটা আশঙ্কা করিয়াছিল, কতকটা নিশ্চিন্তভাবে বলিল, "বয়ে গেল।"

রহমৎ এত বড় একটা তত্ত্বকথার পর নায়কের মুখে এরূপ গ্রাম্যতাদুষ্ট মন্তব্য শুনিয়া নিশ্চয় খুবই ক্ষুণ্ণ হইল। বিরক্তির সহিত বলিল, "তা'হলে তোর ইশ্ক্ খাঁটি নয়, শুধু ভড়ং করছিস, যাঃ।"

রূপচাঁদ প্রশ্ন করিল, "ইশ্ক্ কি?"

রহমৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘাড়টা তাহার দিকে ঝুঁকাইয়া অনেকটা ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "ইশ্ক্ হচ্চে—প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা—আশীকের জন্যে নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া,—যা ছিল লয়লা আর মজনুর মধ্যে—যা ছিল জাহাঙ্গীর আর নূরজাহানের মধ্যে—যার মাঝখানে দাঁড়াতে গিয়ে শের আফগানের প্রাণ গেল,—যা ছিল আয়েষা আর জগৎসিংহের মধ্যে—যার হাহাকার দেখতে পাবি শরৎবাবুর দেবদাসে....তুই ঘাস চিবো বসে বসে।...."

হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। খানিকটা অগ্রসর হইতে রূপচাঁদ ডাক দিল, "রহমৎ, শোন্।

অনেকটা অনিচ্ছার সহিত রহমৎ ফিরিয়া আসিল। তখনও রাগটা লাগিয়া আছে, বলিল, "তোর এসবে হাত দেওয়া ঠিক হয় নি। ছুটোছুটি মারামারি করে বেড়াস, ঐ নিয়েই থাকা উচিত ছিল।....কেন ডাকছিলি?"

"একটা গাধা জোগাড় করতে পারিস্?"

রহমৎ একদৃষ্টে রূপচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বোধ হয় ভিতরে ভিতরে আশা করিয়াছিল হতাশ প্রেমের ধাক্কায় বেচারি পাগল হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার আর কোন নিদর্শন না পাইয়া সহজ বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল, "কেন, গাধা কি হবে? হঠাৎ গাধা?"

"বর শুনছি রমজানের গাড়ি করে আসবে। কাল নতুন করে রং করছিল, জিগ্যেস করলাম তো বললে...."

"গাড়িতে ঘোড়ার বদলে কি গাধা জুড়ে দিবি নাকি?"

"গাধা জুড়ে দেওয়া নয় ....রমজানের সাদা ঘোড়াটার একটা মস্ত দোষ আছে জানিস তো?—গাধার ডাকে ভয়ানক ভড়কে যায়...."

রহমৎ আরও বিস্ময়ের সহিত বলিল, "যাক্, তাতে কি?"

"বরটাকে যদি ঘায়েল করা যেত,—বরের বাপকেও, পুরুতকেও—সবগুলোই নিশ্চয় এক গাড়িতেই থাকবে।"

রহমৎ আরও দুই পা আগাইয়া আসিয়া অপলক দৃষ্টিতে রূপচাঁদের দিকে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর আসিয়া আবার গুঁড়িটার ওপর বসিল। মনে হইল যেন একটু খুশি হইয়াছে,—বোধ হয় এই জন্য যে, হতাশ প্রেমিক নিতান্তই চুপচাপ বসিয়া নাই, কিছু একটা করিতেছে। উন্মাদ হইয়া যাওয়া কিংবা আত্মহত্যা করা অবশ্য বেশি শাস্ত্রসংগত হইত, অভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী-বিনাশও নিন্দার নয়। জিনিসটাতে উন্মাদ-লক্ষণও বর্তমান। বলিল, "কাজটা ভাল হয় না, যদিও জাহাঙ্গীরের নজির আছে....কিন্তু গাধা পাবি কোথায়?"

"তাই তো ভাবছি।....আমিও অবশ্য গাধা ডাকতে পারি...."

"দ্যুৎ, সে কি হয়? টের পেয়ে গেলে শেষকালে গাধা হোস্ আর নাই হোস্ ধোবার মত বাড়ি হাঁকড়াবে। তার চেয়ে এ বাবা, ইংরেজের রাজত্ব,—গাধা নিজের খুশিতে, নিজের মনে ডেকেছে, আমরা কি করব?"

রূপচাঁদ হাঁটুতে চিবুকটা চাপিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক তো;—বনে চরতে চরতে রংচঙে গাড়ি, সাজগোজ-করা লোক দেখে ওর মনে যদি ভাব এসে থাকে....আমরা কি ওকে উস্কে দিতে গিয়েছিলাম?....তোমরা অত জুলুস করে না এলেই পারতে।....কিন্তু পাওয়া যায় কোথায়? সমিস্তে তো সেই; আর গাড়ির সময়ও হয়ে আসছে...."

রহমৎ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আচ্ছা তুই ব'স, আমি দেখছি একবার। আর দেখ্—যদি আমার দেরিই হয় আর বর এর মধ্যে এসেই পড়ে তো তুই এই গুঁড়ির আড়ালে বসে দিস না-হয় ডেকে খোদার নাম নিয়ে।....বাঃ, আমার মর্জি হয়েছে আমি ডেকেছি গাধার ডাক মশায়, তাতে আপনাদের ঘোড়া যে ঘাব্ড়ে বসবে কে জানে!.... বসে থাক্, দেখি একবার চেষ্টা।"

২

খানিকক্ষণ গেল। গুঁড়ির ওপর থেকে স্টেশনের ওদিকে ডিস্ট্যান্ট সিগ্নালটা দেখা যায়; রূপচাঁদ সেই দিকে চাহিয়া ছিল, দেখিল সিগ্নালটা মাথা হেঁট করিল। গাড়ি আসিতেছে। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, রহমৎ যেদিকটায় গিয়াছে—তীব্র উৎকণ্ঠায় সে দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। না, রহমতের কোন চিহ্ন নাই। তাহা হইলে বোধ হয় তাহার নিজের গলাই শেষ পর্যন্ত ভরসা।

ছোট স্টেশন, রাস্তায় বিশেষ লোক চলাচল নাই। বরযাত্রীদের যাহারা অভ্যাগমন করিবে তাহারা অনেকক্ষণ স্টেশনে চলিয়া গিয়াছে। রতন মণ্ডল তাহার ছোট মেয়েটিকে লইয়া স্টেশন অভিমুখে যাইতেছিল— মেয়ের মামার বাড়ি যাইবে; জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোষজা এখানে বসে যে?"

কিন্তু বেশি কৌতূহল দেখাইল না; কেন না রূপচাঁদকে ডোবার ধারে, কি জঙ্গলের মধ্যে, কি গাছের মগডালে, কি গুঁড়ির ওপর দেখা এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়।

রতন চলিয়া গেলে রূপচাঁদ আর একবার রহমতের পথের দিকে চাহিল, তাহার পর গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া খুব নিম্নকণ্ঠে—

'হাঁক্কা—' করিয়া একটা টানা আওয়াজ করিল। রাসভ-ধ্বনির রিহার্সাল। দ্বিতীয় বার আর একটু জোরে। না, বেশ চলিবে। গলা-খাঁকারি দিয়া আরও একটু জোরে আরম্ভ করিতে যাইবে, দেখিল রায়েদের পোড়ো বাড়ির পাশ দিয়া যে সরু রাস্তাটা চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া গাধার উপর, পাকা ঘোড়সওয়ারের ভঙ্গিতে পা ছড়াইয়া রাম্বু ধোবার ছেলে সাতকড়ে গট্ গট্ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। সামনে আসিয়া তড়াক্ করিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িল, তাহার পর গাধাটার পিঠে দুইটা সাবাসির চাপড় কষিয়া রূপচাঁদকে বলিল, "রহমৎ ডেকে নিয়ে এল। সে আসছে। তোমরা চড়বে নাকি দা'ঠাউর? চড় না, ঘোড়া ছেড়ে চড়বে লোকে আমার মাতনের ওপর,—ওর নাম মাতুধন রেখেছি।....পড়ার ভয় নেই, মাটিতে দুটো পা ঠেকিয়ে দাও, নীচে দিয়ে গলে বেরিয়ে যাবে; মায়ের যেমনকার ছেলে ঠিক তেমনটি রইলে, আঁচড় পর্যন্ত লাগল না।"

রূপচাঁদ প্রশ্ন করিল, "ডাকে কেমন?"

সাতকড়ে খুব সম্ভবত স্নেহের আধিক্যেই বলিল, "খুব মিষ্টি ডাক।"

রহমৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। একটু বিজয়ের ভঙ্গিতে রূপচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি রে, হ'ল জোগাড়, না, হ'ল না? বাবা, এ যার নাম রহমৎ শেখ!....কাজটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে, বলে দিলাম; আমি এর মধ্যে নেই।....নাও, সাতকড়েকে বল এখন তোমার কি দরকার গাধায়।"—বলিয়া হাত পা গুটাইয়া নির্লিপ্ত ভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

রূপচাঁদ বলিল, "সেই কথাই তো বলছিলাম, ও বলছে খুব মিষ্টি ডাক ওর গাধার—মিষ্টি ডাকে কি হবে?"

রহমৎ মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, "রেখে দে, গাধার আবার মিষ্টি ডাক। আমাদের মোরগটা তাহলে মিঞা তানসেন।....এখন ঠিক তালের মাথায় ডাকবে কি না-ডাকবে সেই কথা দেখ্।....কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না, বলে রাখছি; না-হক্ ক'জন বে-কসুর লোককে...."

রূপচাঁদ সাতকড়ের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিস্ রে, ডাকবে ফরমাস মতন?....ব্যাপারটা তোকে বুঝিয়ে দিই; মানে হচ্ছে...."

সাতকড়ে কোমরে একটা হাত দিয়া সিধা হইয়া বলিল, "মাতন আমার ডাকে নিজের খেয়ালের ওপর। কারুর তো রেয়ৎ নয়?—দাসখৎ ও লিখে দেয় নি,—বল না কেন রহমৎ ভাই?"

এমন সময় গাধাটা হঠাৎ তর তর করিয়া কয়েক পা আগাইয়া গেল এবং ঘাড়, পিঠ আর লেজ সোজা করিয়া বিকট রব করিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে আওয়াজটাকে ধাপে ধাপে নামাইয়া থামিয়া গেল। সাতকড়ে দৃপ্তভাবে তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "ঐ লেন্, একখানি লমুনা ঝেড়ে দিলে! ভাবছেন বুঝি আমাদের কথা কিছু বুঝছে না ও? আর কিন্তু ঘণ্টা-দুত্তিন এখন ঠাণ্ডা। সারা দিনে পাঁচ-ছটি বার আওয়াজ দেয়, ব্যস।"

রহমৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। স্টেশনের ওদিকে চাহিয়া বলিল, "তোর গাড়ি ওদিকে এসে গেল কিন্তু রূপো; ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।"

রূপচাঁদ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া পরিয়া চারি দিকে চাহিয়া বলিল, "তাই তো। কোন উপায় নেই রে সাতকড়ে? তুই ওকে বলেছিস রহমৎ, কেন ডাকাতে হবে?... বলিস নি?....মানে হচ্ছে, একটা বরযাত্রী আমাদের গ্রামে আসছে, সাতকড়ে; তাদের একটু ঠাট্টা করা দরকার তো, নইলে ভাববে এদের দেশে ঠাট্টা করবার লোকই নেই; তাই ওরা যেই এখান দিয়ে যাবে আমরা শাঁক বাজিয়ে দোব....বিয়ে-



ঐ লেন্, একখানি নমুনা ঝেড়ে দিলে।

বাড়ির হাজারটা শাঁকেও এমন বাজখেয়ে আওয়াজ হবে না বাবা, হুঁ !”

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সাতকড়েও হাসিয়া হাততালি

দিয়া উঠিল, বলিল, "খাসা মতলব, দা'ঠাউর, খাসা মতলব এঁটেছে বটে !"

রূপচাঁদ বলিল, "কিন্তু, তুই বলছিস যে আর ঘণ্টা দু-এক ডাকবে না ও।"

সাতকড়ে বলিল, "দু-রকম ডাক আছে দা'ঠাউর। এ যা লমুনোটা দিলে এটা হচ্ছে আহ্লাদের ডাক—মনটা খুব খুশি রইল, ডেকে দিলে একবার। আমরা যেমন হাসলাম না এইমাত্তোর, সেই রকম আর কি। আর এক রকম ডাক আছে মাতনের, সে কিন্তু এ-রকম মিষ্টি লাগবে না, তা বলে দিচ্ছি। সে ওর কান্নার ডাক।"

রহমৎ ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল, "ঠেঙিয়ে ডাকান নাকি ?"

সাতকড়ে আগাইয়া গিয়া গাধার ঝুঁটি ধরিয়া তাহার পিঠে হেলান দিয়া রহমতের সহিত মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল ; বলিল, "তোমাদের মত ইস্কুলের পোড়ো নয় যে একটা বেতের ঘায়ে 'ভ্যা' করে উঠবে ; আস্ত একখানি বাঁশ পিঠে ভাঙলেও মাতুধন টুঁ শব্দ করবে নি।....ওকে কাঁদাবার অন্য হদিস্ আছে। কিন্তু ঐ যে কইনু—শাঁক যা বাজবে তাতে কানে তালা লাগিয়ে থোবে।"

দু-জনেই আগ্রহের সহিত বলিল, কি, কি হদিস্, বল্ না শীগগির, ওদিকে গাড়ি যে প্রায় ইস্টিশনে এসে পড়ল।

সাতকড়ে বড় রাস্তার এ-মোড় ও-মোড় একবার দেখিয়া লইল, তাহার পর—"দাঁড়াও, দেখছি একবার" বলিয়া যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। রূপচাঁদ হাঁকিয়া বলিল, "দেরি করিস্ নে সাতকড়ে, গাড়ি ওদিকে এসে গেল !"

একটুখানির মধ্যেই সাতকড়ে আবার ঘুরিয়া আসিল। একটু নিরাশ-ভাবে বলিল, "নাঃ, পাওয়া গেল না।"

রহমৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি খুঁজছিলি তুই ?"

সাতকড়ে বলিল, "কুকুরের গায়ের মাছি। গাধাকে ডাকাতে একেবারে ধন্বন্তরি, তবে আর বলছি কি ? ছটি মাছি একটু ধুলোর মধ্যে করে ছেড়ে দাও গায়ে, তার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পহর ধরে শোন না কত ডাক শুনবে। তা দিন বুঝে একটাও পাওয়া গেল না কুকুর—দরকার কি না....সব বেটা ভাবলে উপ্‌গার হবে।"

স্টেশনটা গোটাকতক গাছের আড়ালে পড়ে, দেখা যায় না, তবু হাঁকডাক, ব্যস্ততার আওয়াজ কানে আসিল। রহমৎ আবার নির্লিপ্ত-ভাবে ঘুরিয়া বসিয়াছিল, সেই ভাবেই বলিল, "মাছির কামড়ে যদি ডাকে তো বিছুটি ছোঁয়ালে ডাকবে না কেন ?....আমি কিন্তু এর মধ্যে নেই বাবা ; তোমাদের যা মনে হয় কর। একটা কথা বলিল, তার উত্তর দিতে হল ; ব্যস।"

সাতকড়ে বিস্ময় এবং প্রশংসায় চোখ ছুইটা বড় বড় করিয়া এমন ভাবে চাহিল যেন সে রহমতের মধ্যে স্বয়ং মক্কার পীরকে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

বরযাত্রীর দল স্টেশনের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া রাস্তায় নামিয়াছে। প্রায় জন-ত্রিশেক লোক। গ্রামে তিনখানি গাড়ি। যত দূর সংকুলান হইয়াছে তাহাতে বরপক্ষীয়দের বসান হইয়াছে। বাকি আর সকলেই পায়ে হাঁটিয়া আসিতেছে। রূপচাঁদের খবর ঠিকই ছিল, বর, নিতবর, বরের বাপ এবং পুরুত রমজানের গাড়িতে চড়িয়াছে। সেটা সর্বাগ্রে রাখা হইয়াছে।

সমস্ত দলটা ধীরে ধীরে চলিয়াছে। বুড়া রমজান কিন্তু তাহার পেটমোটা ঘোড়া ছুইটার রাস এমন কায়দা করিয়া কশিয়া ধরিয়া আছে, মনে হইতেছে যেন অন্যমনস্ক হইয়া রাস একটু ঢিলা করিলেই তাহারা একেবারে তীরবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিবে।

দলটা সামনে আসিতেই রূপচাঁদ গুঁড়ি হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সেলাম রমজান-চাচা।

তীব্র উৎকণ্ঠায় মুখটা একটু শুকাইয়া গিয়াছে।

রহমতেরও মনে একটা শঙ্কা এবং উদ্বেগ লাগিয়া ছিল। অনেকটা, পূর্বাহ্ণেই ভাব জমাইয়া রাখিবার জন্য বলিল, "সেলাম-আলেকুম।"

রমজান কোন উত্তর দিল না, শুধু গাধাটার পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া রাসটা আরও সতর্ক হইয়া ধরিল।

সাদা ঘোড়াটাও একবার ঘাড়টা ঘুরাইয়া দেখিয়া অস্বস্তির সহিত কান দুইটা সঞ্চালিত করিতে লাগিল। রূপচাঁদ আর রহমৎ দু-জনেই সঙ্গ লইল। রূপচাঁদ একবার গাড়ির ভিতরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পর রমজানের সঙ্গে গল্প জমাইবার জন্য প্রশ্ন করিল, "রং ধরাতে কত খরচ পড়ল রমজান-চাচা ?

কোন উত্তর হইল না। রহমতের বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল, চকিতে ঘুরিয়া একবার গুঁড়িটা যেখানে আছে সেইখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর নির্লিপ্ত ভাবে বলিল, "আচ্ছা, রং ধরাতে যা-ই খরচ পড়ুক, তুমি একটু সরে থেক তো, যদি জানের ডর থাকে ; রমজানী খালার ঘোড়া একটি যদি লাথি ঝাড়ে তো উঠে আর তোমার জল খেতে হবে না।....এ তোমার বাংলা দেশের পিলেরোগা ঘোড়া নয় যে মনে করেছ...."

এমন সময় "হাঁক্কা"—করিয়া একটা অতি উগ্র আওয়াজ পিছনে শোনা গেল এবং পর মুহূর্তেই দেখা গেল আকাশপাতাল হাঁ করিয়া, লেজ সিধা করিয়া চীৎকার করিতে করিতে একটা গাধা বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। পিছনের লোকেরা ত্রস্তভাবে রাস্তা ছাড়িয়া দিতেছে। নানা রকম সন্ত্রস্ত রব উঠিয়াছে—'সাবধান'! 'গাধারা কামড়ায়ও আবার'



'সাবধান!' 'গাধারা কামড়ায়ও আবার'

....'দেখো, যেন ছুঁয়ে ফেল না'....'কি বিপদ!....ও মাড়িয়ে চলেছে মশাই, আর আপনি ছোঁবার ভয় করছেন!'

রমজানের গাড়ির সাদা ঘোড়াটা দাঁড়াইয়া পড়িল। রাসটাতে একটা তীব্র ঝাঁকানি দিয়া পিছনে ঘুরিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর রমজান নামিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবার পূর্বেই পাশের ঘোড়াটাকে এক রকম টানিতে টানিতেই সামনে গলা বাড়াইয়া মত্ত গতিতে ছুট দিল। একটা "সামাল সামাল" রব পড়িয়া গেল। গাড়িটা খানিকটা সিধাই ছুটিল, তাহার পর সাদা ঘোড়াটা রাস ছিঁড়িয়া পলায়ন করায়, একটা ঘোড়ার টানে খানিকটা একপেশে হইয়া ছুটিতে ছুটিতে রাস্তার ধারে একটা সেগুন-গাছের গুঁড়িতে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিয়া হেলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

৩

এর পরের দৃশ্য রূপচাঁদদের বাড়ির চিলেকোঠার অভ্যন্তর। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। রূপচাঁদ ধূলিশয্যায় শয়ান; কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া বোধ হয় এইমাত্র নিদ্রা গিয়াছে। চোখের কোলে, গালে শুষ্ক অশ্রুর কলঙ্ক-রেখা। নেড়ীর সঙ্গে আসন্ন বিরহের অশ্রু নয়; অবশ্য পরোক্ষ হেতু এইটাই বটে। আসলে রূপচাঁদের পিঠে আজ একটি আস্ত কঞ্চি ভাঙিয়াছে।

মাতৃধন-ঘটিত ব্যাপারটা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। ডাকের মূলে বিছুটি,—বিছুটি থেকে সাতকড়ে, সাতকড়ে থেকে রহমৎ, তাহার পর রহমৎ থেকে রূপচাঁদে বেশ সহজেই পৌঁছান গেল। রূপচাঁদের পিতা দুর্ভাগ্যক্রমে দলের মধ্যেই ছিলেন। কান ধরিয়া বাড়ি লইয়া গেলেন, তাহার পর চোরের মার দিয়া চিলেকোঠায় পুরিয়া বাহির হইতে তালা আঁটিয়া দিয়া বলিলেন, "সমস্ত দিন সমস্ত রাত আজ শুকো, রাস্কেল কোথাকার....নেমন্তন্ন বাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ...."

বিয়ে-বাড়ি।

দুইটা বাড়ি বাদে রায়েদের বৈঠকখানায় বরযাত্রীদের তোলা হইয়াছে। কতকগুলা ছোকরা আসিয়া অবধিই গণ্ডগোল বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের গাড়ি করিয়া আনা হয় নাই, তাহাদের অপমান হইয়াছে। যাহারা গাড়িতে আসিয়াছিল তাহাদের অনেককেও তাহারা দলে টানিয়াছে —বলিয়াছে গাড়ি চড়াইয়া জখম করিবার মতলব ছিল এদের, তাদের গুরুবল ছিল তাই তাহারা চড়ে নাই। অবশ্য বরের গাড়িতে কাহারও বিশেষ আঘাত লাগে নাই, অন্যান্য গাড়িগুলা একেবারে নিরাপদ ছিল, কিন্তু কি সর্বনাশটাই-না হইতে পারিত, সেই দুশ্চিন্তায় সকলে স্তম্ভিত হইয়া আছে। সর্বনাশের চেয়ে তার কল্পনাটাই আরও ভয়ংকর, কারণ সে-কল্পনার তো কোন সীমা বাঁধা থাকে না। তাই, কিছু না হওয়ার চেয়ে বড় বিপদ আর কিছুই হইতে পারে না। স্নানে, আহারে, চায়ে, পানে—যত রকম ভাবে পারিল ইহারা কন্যাপক্ষীয়দের সমস্ত দিন বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের দিকের পুরুতকেও ইহারা দলে টানিল।

পুরুতঠাকুরের চা আসিলে একজন কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং চায়ে চুমুক দিয়া পুরুতঠাকুর মুখটা কুঞ্চিত করিয়া উঠিতেই, নিরীহের মত প্রশ্ন করিল, "খুব মিষ্টি দিয়েছে বুঝি? তা বেচারীরা তো জানে না যে আপনি কম মিষ্টি খান… "

পুরুতঠাকুর ঠোঁটে জিবটা অস্বস্তির সহিত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "মিষ্টি কোথায় হে, এ যে নুন!"

"নুন!! না পুরুত-মশায়, আপনি নিশ্চয় ভুল করেছেন। অবিশ্যি, যা ছোটলোক এরা….কিন্তু আপনি বরপক্ষের পুরুত, আজকের কাজে আপনি দেবতার তুল্য, তায় সমস্ত দিন উপোস করে আছেন, আপনার

সঙ্গেও কি এ-রকম ঠাট্টা-প্রবঞ্চনা করতে সাহস করবে? বোধ হয় ভুল করেছেন,—দেখুন তো আর একটা চুমুক....”

পুরুতঠাকুর একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, চায়ের বাটিটা আছড়াইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “আমি পুরোহিত, তিন কুড়ি বয়স হ’তে চলল, আমার সঙ্গে তঞ্চকতা! আমি যদি আজ এ-বিবাহে পৌরোহিত্য করি তো....”

সকলে আসিয়া পড়িল—কি ব্যাপার!....একটি ছোকরা বলিল, “থাক্ পুরুত-মশাই, এই উপোসের মুখে যদি একটা প্রতিজ্ঞা করে বসেন সে তো আর স্বয়ং বিধাতা এলেও রদ হবে না; থাক্, সয়ে যান....”

এক জন সামনে ঠেলিয়া আসিয়া বরের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “তার চেয়ে বরং বর আসনে বসবার আগে, কাকা একবার গয়নাপত্র, দানসামগ্রীগুলো দেখে নিন্....”

কন্যাপক্ষের দিক থেকে এক জন বেশ ষণ্ডাগোছের লোক উগ্রদৃষ্টিতে ছোকরার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, “জিগ্যেস করি—কেন?”

ছোকরা রোগাগোছের, থতমত খাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, “আজ্ঞে, এম্‌নি বলছিলাম—সবাই তাহ’লে একবার দেখতাম।” তাহার পর পাশের একটি সঙ্গীকে প্রশ্ন করিল, “তুই বলছিলি না রে—এখানকার সেকরারা চমৎকার গড়ন করে গয়নার?”

সে ছোকরা এসব ফ্যাসাদের কথায় একেবারেই না-থাকিবার জন্য বলিল, “যাঃ, আমি কি জানি এখানকার সেকরাদের কথা, দেখ তো! মিছিমিছি আমায় টানা....”

প্রথম ছোকরা একটু ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িল।

গোলমাল কিন্তু থামিল না। বরের পিতা একটু সন্দিগ্ধ-প্রকৃতির লোক, বলিল, “ছেলেমানুষ যদি তুলেই থাকে কথাটা, আপত্তির কারণও

তো দেখি না আপনাদের। বিয়ের আগে গয়নাপত্র দেখে নেঁওয়া, এ রকম তো আখছারই হচ্ছে আজকাল।"

কন্যাপক্ষের লোকটির রাগে তখন শরীরটা কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে, কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিল, "এ বাড়িতে হয় নি।"

অপর এক জন বলিল, "এ তল্লাটে নয়।"

বরকর্তার হাতে এক জন সুবিবেচনার সহিত নিজের হুঁকাটা তুলিয়া দিল। সে দু-তিনটা টান দিয়া শান্তস্বরে বলিল, "নাই বা হ'ল, আজ হোক্। দোষ কি? পুরুতের চায়ে যখন নুন রয়েছে, তখন....কি যে বলে বেশ....

যে হুঁকা জোগাইয়া দিয়াছিল তাহার আবার সুযোগের মাথায় কথা জোগাইয়া দেওয়াও অভ্যাস আছে, বলিল, "তখন কনের গয়নায় খাদ থাকবে না, কে বলতে পারে?"

"মুখ সামলে"—বলিয়া কয়েক জন একসঙ্গে হুংকার করিয়া উঠিল!

বরকর্তা বলিল, "তা সামলাচ্ছে, কিন্তু গয়না যাচাই না-হ'লে বর পিঁড়িতে উঠবে না"

—"আলবৎ উঠবে।"

কন্যাপক্ষীয়দের সকলেই সমস্ত দিন নানা রকম আবদার-অত্যাচার সহ্য করিয়া অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রতিশোধের আঁচ পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। এক জন ভিড়ের মধ্যে থেকে বলিয়া উঠিল, "তাকে কান ধরে টেনে এনে বসান হবে।"

"কোথায় গেল বর?"

"পাকড়ো উস্‌কো!"

অবরুদ্ধ আক্রোশের বাঁধ ভাঙিয়া একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। এ-পক্ষের দল যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া গেল, ও-পক্ষের দল সেই

অনুপাতে কমিয়া আসিতে লাগিল; যে যেখানে পারিল সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বরের কিন্তু খোঁজ পাওয়া গেল না। আনাচে, কানাচে, অন্ধকারে, গলি-ঘুঁজিতে, বন-বাদাড়ে যে কয় জনকে ধরা গেল তাহাদের কেহই বর নয়।....

"গেল কোথায় বর!"

প্রশ্ন উঠিল, "স্টেশনে যায় নি তো?"

এক জন উত্তর করিল, "তাদের বাড়ির দিকে এখন গাড়ি নেই তো; কলকাতার গাড়ি আছে একটা।"

একটা দল স্টেশনের দিকে ছুটিল।

তখন কলিকাতার গাড়ি আসিয়া গিয়াছে। পাতলা অন্ধকারে দূর হইতে দেখা গেল টিকিট-ঘরের দিক থেকে খুব ঢিলাঢালা জামা-কাপড়-পরা একটি ছোকরা গাড়ির দিকে ছুটিয়াছে।....গার্ড হুইস্‌ল্ দিল।

দলের তিন-চার জন ছোকরা ছুটিল। প্লাটফর্মে যখন পৌঁছিল তখন গাড়ি বেশ একটু জোর দিয়াছে। তবুও বোধ হয় টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সাহেব-গার্ডের ধমক খাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

এক জন বলিল, "হাজ্‌ব্যাণ্ড স্যার, হাজ্‌ব্যাণ্ড রানিং এওয়ে!"

বিবাহ না করিয়াই পলাইতেছে সেইটে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য অপর এক জন হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আন্‌-ম্যারেড হাজ্‌ব্যাণ্ড অফ আন্‌-ম্যারেড ওয়াইফ, স্যার!!"

গাড়ি কিন্তু চলিয়া গেল।

তখন দুর্ভাবনা জুটিল—জাত-কুল বাঁচে কি করিয়া ?

সন্ত বর কাঁড়িয়া বিয়ে দিতে হইবে। প্রথমে মিত্তিরদের শম্ভুর কথা মনে পড়িল সকলের। বিয়ে-বাড়ি তোলপাড় করিয়াও শম্ভুর সন্ধান পাওয়া গেল না। শম্ভু নিমন্ত্রণে আসে নাই—একটা অভাবনীয় ব্যাপার! কয়েকজন উৎসাহী ছোকরা তাহার বাড়ি ছুটিল।

বাড়িতে আর কেহই ছিল না, মেয়ে-পুরুষ সবাই বিয়ে-বাড়ি। বৈঠকখানার তক্তপোষে শম্ভু ঘুমাইয়া আছে। পাশে ত্রৈলোক্য কবিরাজের ছেলে মাখন। তক্তপোষের এক ধারে কতকগুলো শিশি আর একটা ওষুধ মাড়িবার খল।

আজ দিনের বেলায় মেয়ে খাওয়ান ছিল। টের পাওয়া গেল শম্ভু কোন সুযোগে এক জায়গায় বসিয়া পড়িয়াছিল। আহারটা অত্যধিক হইয়া গিয়াছে। মাখন এখন বাপের যত রকম হজমি বড়ি চূর্ণ, আরক আছে সবগুলা তাহার উপর পরীক্ষা করিতেছে।

বিয়ের কথা শুনিয়া মাখন কবিরাজোচিত গাম্ভীর্যের সহিত প্রশ্ন করিল, "লগ্ন কখন ?"

"সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে।"

মাখন শম্ভুর পেটে দুইটা টোকা মারিয়া চক্ষু ঊর্ধ্বে তুলিয়া একটু হিসাব করিল ; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাহ'লে হ'ল না, এখনও চোঁয়াঢেঁকুর আসছে, এগারটার আগে উঠে বসতে পারবে না। এগারটা পর্যন্ত খেতে যাবে—সেই চেষ্টা করছি ; সে-সময় হ'লে হয় তো দেখ।"

আর তাহা হইলে ছেলে কই ?

এক জন বলিল, "কেন আমাদের ফেলু কেমন হয়? রমানাথের ভাগনে ফেলারাম ..."

রমানাথ কাছেই ছিল। একটু লোভী লোক। ভাগ্‌নেকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করিয়াছে এবং তজ্জনিত খরচের একটা হিসাব রাখিয়া গিয়াছে, আশা ছিল বিয়েতে সেটা পুষাইয়া লইবে। সৌভাগ্যটা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আসায় উল্লসিত হইয়া উঠিল। মোচড় দিয়া আরও কিছু আদায় করিবার জন্য বলিল, "ওর মা কি রাজি হবে? ওই একটি ছেলে। আর কেউ তো নেই...."

গরজের বালাই, দর আর একটু উঠিল। ফেলারামের ডাক পড়িয়া গেল। তাহাকে পাওয়া গেল না। রমানাথের ছেলে কানাই বরযাত্রীদের টিট্‌কারি দিতে দিতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিয়া বলিল, "সে তো আজ বিয়ে করতে পারবে না।"

রমানাথ একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল, "আজ পারবে না মানে?—এ কি পরাণে মণ্ডলের কর্জ শোধ দেওয়া নাকি?—আজ পারব না, কাল—কাল নয়, পরশু।....ডাক্‌ সে হারামজাদাকে। দেখি, কেমন না করে...."

কানাই বলিল, "ডাকলে আসবে কি করে?—নেমন্তন্নর জন্যে জোলাপ নিয়ে বসে আছে—মাখনের কাছ থেকে। মাখ্‌না ভুল করে কি একটা দিয়েছিল—এখনও জের কাটে নি।....সে আসতে চাইলেও বরং রোখা উচিত।"

কন্যাকর্ত্তা আর সমাজের মাতব্বরেরা মাথায় হাত দিয়া বসিল। গ্রামে আর ছেলে নাই। এদিকে লগ্ন বুঝি বহিয়া যায়।

কানাই-ই প্রশ্ন করিল, "রূপচাঁদকে হ'লে কাজ চলবে না? হারু কাকা তো ওকে সমস্ত দিন উপোস করিয়ে রেখেছে—পেটফাঁপার হাঙ্গামাও নেই, জোলাপের হাঙ্গামাও নেই।"

এ-হেন পাজি বরযাত্রীর দলকে গাড়ি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করায় সকলেই রূপচাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল, "ঠিক তো! হ্যাঁ, ওর সঙ্গেই দিয়ে দাও বিয়ে।"

এক জন সন্দেহ প্রকাশ করিল, "কিন্তু ঠিক মিল হবে কি? প্রায় এক বয়সই যে ছুটোতে!"

—"আরে বেশ হবে নাও, আগে জাত তো বাঁচুক, তারপর মিল আর টিল।"

একটি ছোকরা আবেগের মাথায় একেবারে গুরুলঘু ভুলিয়া সামনে আসিয়া বলিল, "আর ওদের ছু-জনের মধ্যে যে লব্ রয়েছে! লবের চেয়ে মিল...."

"বেরো!"—বলিয়া কে এক জন তাহার গালে ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল।

কনের মা মূর্ছা গিয়াছে, হারু সেইখানেই ছিল। কয়েক জন তাহাকে ডাকিতে ছুটিল। ওদিকে কানাই আর রূপচাঁদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কয়েক জন তাহার বাড়ি ছুটিল।

বাড়িতে শুধু রূপচাঁদের ঠাকুরমা আর একটা বুড়ী ঝি। সকলে খোঁজ লইয়া চিলেকোঠার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে তালা বন্ধ, ভিতরে কোন সাড়াশব্দ নাই। সকলে একবার সভয়ে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিল। তাহার পর ভূতো দোরে একটা ধাক্কা দিয়া ডাকিল, "রূপো!"

কোন উত্তর হইল না।

আরও জোরে ধাক্কা দিয়া ডাকিল, "রূপো, এই রূপচাঁদ!"

অতি ক্ষীণ একটা আওয়াজ ছিদ্রপথে বাহির হইল। একেবারে তিন-চার জন একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "বিয়ে করবি?"

রূপচাঁদ শরীরটাকে টানিয়া দুয়ারের কাছে সরিয়া আসিল। দুইটা কপাটের মাঝে ঠোঁট দিয়া প্রশ্ন করিল, "কিছু খাবার আছে রে?.... ভূতো নাকি?"

—"হ্যাঁ,....ওদের বর পালিয়েছে! তোর সঙ্গে নেড়ীর বে ঠিক হয়েছে।"

রূপচাঁদ চিঁচিঁ করিয়া বলিল, "দোরটা খুলে দে; কিছু খাবার এনেছিস্ তোরা? কেনো কোথায়?"

—"কানাই চাবি আনতে গেছে, ভুলে গিয়েছিল....একেবারে বিয়ের পর খাবি রূপো, ঘণ্টা-দুয়েক একটু সবুর করে থাক্ না।"

—"ওরে বাপ রে। দু-ঘণ্টা?....তবে থাক্।"

...."তুই অত ভালবাসতিস্ নেড়ীকে রূপো, একবার অন্য জায়গায় হয়ে গেলে বিয়ে...."

রূপচাঁদ ভিতর হইতে একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল, "মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস্ নে ভূতো....সমস্ত দিন পেটে অন্ন নেই, বলে এরও ওপর দু-ঘণ্টা চাপিয়ে বিয়ে কর্‌সে।....দোর খুলে কিছু খেতে দিবি তো দে, নইলে বেরো....সব উপগার করতে এসেছেন!...." কণ্ঠস্বর ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

কানাই চাবি লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুয়ার খুলিয়া যতক্ষণ তাহারা নীচে নামিয়া আসিল ততক্ষণে রূপোর বাপ, নেড়ীর বাপ আরও সব লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ-রকম অর্ধমৃত অবস্থায় বিবাহ হয় না। এক জনকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, সে ছুটিয়া গিয়া একটু দুধ আর সন্দেশ লইয়া আসিল। রূপচাঁদ চাঙ্গা হইয়া

উঠিতে উঠিতে বাড়িটা মেয়েপুরুষের কলরবে, হঠাৎ বিবাহের ত্রস্ত আয়োজনে গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল।

কন্যাকর্তা স্নেহ-দ্রব কণ্ঠে রূপচাঁদের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বাবা রূপচাঁদ, তোমার যদি কিছু সাধ থাকে তো বল····বল না, লজ্জা কি ?····রূপোর আমার লজ্জা হয়েছে গো, তোমরা দেখ !"

পিঠে কঞ্চির দাগে, আঙ্গুল কটা আটকাইয়া যাইতেছে।

পুরুত, আরও কয়েক জন বয়স্থ ব্যক্তি বলিল, "হ্যাঁ, চাইবে বইকি, লজ্জা কি ?··· পা-গাড়ি, হারমোনিয়াম, যা ইচ্ছে হয় বল।"

কোন উত্তর নাই।

—"বল, বল, ওদিকে আবার লগ্নের সময় হয়ে এল····"

রূপচাঁদ একবার সমবয়সীদের পানে চকিতে চাহিয়া মাথাটা গুঁজিয়া লইয়া অর্ধস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, রহমৎ আর সাতকড়েকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে ?"

১৩৪৫]

পীতু

ভগবানের সম্বন্ধে আপনাদের কোন রকম স্পষ্ট ধারণা আছে?—বোধ হয় নাই। না-থাকিবারই কথা; কেন-না সম্ভবত আপনারা সকলে সেই পন্থাই ধরিয়াছেন যাহা অবলম্বন করিয়া আমায় হার মানিতে হইয়াছে। ওসব আগম-নিগম বেদপুরাণে কোনই ফল হয় না। অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়ানো, শুধু সংশয়ের ঘন অন্ধকার—যেটাকে একটু পথ বলিয়া মনে হয়, দেখা যায় সেটা আরও নিবিড়তর অরণ্যে লইয়া আসিয়াছে মাত্র!

তাই বলিতেছিলাম বেশ একটা বিশদ ধারণা না থাকিবারই কথা। আমারও ছিল না; তবে সম্প্রতি লাভ করিয়াছি এবং আপনাদের মত যাঁহারা অজ্ঞ, তাঁহাদের কাছে প্রকাশ না-করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। জানেনই তো—থাকিতে পারা যায় না, জিনিসটা এই রকমই।

অতএব আমি যাহা জানিয়াছি শুনুন—ভগবান্ আকাশের চেয়েও বড়, ইচ্ছা করিলে হাতীর চেয়েও বেশি খাইতে পারেন. আর প্রয়োজন হইলে রেলগাড়ির চেয়েও জোরে দৌড়াইতে পারেন।

এ ঈশতত্ত্ব অপৌরুষেয় কি না বলিতে পারিলাম না। আমার পাওয়া আমার ভাইঝি ছবির কাছে। তত্ত্বটি অপূর্ণ হইতে পারে, কেন-না ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যের মধ্যে তিনটি মাত্র পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু এই তিনটিতেই ধারণা এত স্পষ্ট করিয়া দিতেছে যে অপর তিনটির জন্য মাথা ঘামাইবার দরকারই হয় না। নয় কি?

আমার দীক্ষা ছবির কাছে। ছবির গুরু পীতু। খানবাগের পীতু—আপনারা নিশ্চয় জানিতে পারেন। জানেন না?—আপনারা যে অবাক্ করিলেন। অবশ্য আমিও জানিতাম না। কিন্তু ছবির কাছে যে-রকম

পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং তাহাতে ধানবাদের দিকের পৃথিবীটা সে একাই যে-রকম ভরাট করিয়া আছে বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে তাহার সম্বন্ধে লোকে অজ্ঞ থাকিতে পারে—বিশ্বাসই করিতে পারা যায় না; আমি নিজেও কি করিয়া ছিলাম আশ্চর্য হইতেছি।

যতটা আন্দাজ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় পীতুর বয়স চার হইতে সাতের মধ্যে। আমাকে ছবির বয়সের তুলনায় আন্দাজটা করিতে হইতেছে। ছবির নিজের যাইতেছে পাঁচ বৎসর। নূতন কোন সঙ্গীর নিকট পরিচয় দেওয়ার সময় বলে, "আমার নাম ছবি—ছ, বয়ে হস্বই, ছবি"—অর্থাৎ প্রথম ভাগ ধরিয়াছে। অনেকটা, যেমন সঙ্গতি থাকিলে আপনারা নাম লিখিয়া 'এম-এ, ডি-লিট্' অথবা 'বিদ্যাবিনোদ' প্রভৃতি জুড়িয়া দেন আর কি।

পীতুর বয়স চার হইতে সাতের মধ্যে ধরার কারণ এই যে, সে ছবির চেয়ে ছোট কি বড় ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

যখন পীতু-কথিত কোন তথ্যে সংশয় প্রকাশ করি, ছবি তাহাকে যতটা সম্ভব বাড়াইয়া তোলে। ধরুন, যেন বৃষ্টির কথা উঠিল। আপনারা যে মনে করেন বাষ্পে শৈত্যস্পর্শ হইয়া বৃষ্টি সংঘটিত হয়, আসলে তাহা নহে। ওটা কতকগুলি হাতীর কীর্ত্তি। তাহারা ভগবানের 'আকাশের-মতো-বড়' পুকুর থেকে কলসী কলসী জল আনিয়া স্বর্গের রাস্তায় ছিটায়, তাহাতেই বর্ষা হয়। স্বর্গের পথ যে পিচ্ছিল এ-কথা আপনারাও স্বীকার করিবেন। জল পড়িবার পূর্বে হাতীরা নিজে যে পড়িয়া যায় না, তাহার কারণ তাহাদের পাখা আছে। যদি বলি, "হাতীর তো পাখা হয় না ছবি?" ছবি উত্তর দেয়, "পীতু বলেছে সগ্‌গের হাতীদের হয়, তুমি পীতুর চেয়ে বেশি জান? পীতু আমার চেয়েও বড় মশাই, অনে—ক জানে।"

এক এক সময় আবার পীতু ছোটও হইয়া যায়।

আমি বলি, "পড়াশুনো করছ না ছবি, খালি রোদে রোদে দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছ, এবার যখন ধানবাদে যাবে, দেখবে পীতু আকাশের মতো পড়ে ফেলেছে, তোমার সঙ্গে কথাও কইবে না।"

ছবি তাচ্ছিল্যের সহিত বলে, "ইস্, পীতুর সাধ্যি! পীতু তো আমার চেয়ে ছোট।"

নিজে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, বলে, "আমি তো এত্তো বড়।" তাহার পর ডান হাতটা নামাইয়া বুকের কাছাকাছি আনিয়া মাথাটা নীচু করিয়া বলে, "আর পীতু তো এত্তোটুকু।" যখন ঈর্ষা প্রবলতর হয়, হাতটা আরও নামাইয়া একেবারে হাঁটুর কাছে লইয়া আসিতেও বাধে না। পীতুর বিদ্যার্জনের দিক্ দিয়া সে যে অন্য হিসাবেও নিশ্চিন্ত, তাহাও এক-এক সময় জানাইয়া দেয়; বলে, "ওর মা বলে—'তোর কিচ্ছু বিদ্যে হবে না পীতু'....মার কথা মিথ্যে হয় না মশাই, পীতু নিজে বলেছে।"

মোট কথা, পীতুর ছোট হওয়া কি বড় হওয়া একবারেই ছবির তৎকালীন মেজাজের উপর নির্ভর করে। তবে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, বয়সটা চার থেকে সাত পর্যন্ত যাহাই হোক, পীতু যে অসামান্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ, পীতুর সব বিষয়ে নিজস্ব একটি মত আছে এবং সাধ্যমত সে সেটা দেশ-বিদেশে ছড়াইতে কসুর করে নাই। কোথায় ধানবাদ আর কোথায় সুদূর বিহারে আমাদের এই নগণ্য নগরী—এখানে ইতিমধ্যে তাহার থিয়োরীগুলি আসিয়া পড়িয়াছে এবং বেশ চারাইয়া গিয়াছে। যে-কোন পাড়ার যে-কোন শিশুমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেই পীতুর নাম এবং এক-আধটা অভিমত কানে আসিবে।

বৃষ্টির কথা বলাই হইয়াছে। আরও আছে। যেমন এঞ্জিনের মধ্যে যে-রাক্ষস বসিয়া থাকিয়া অত হাঁকডাক করিতে করিতে গাড়ি টানিয়া

লইয়া যায়, তাহারই একটি ছোট্ট মেয়ে গ্রামোফোনের মধ্যে বসিয়া মিষ্ট মিষ্ট গান করে। মেয়েটি পলাতক—দুর্দান্ত, নিষ্ঠুর, পিতার ভয়ে রেল-জগৎ ছাড়িয়া সে মানব-পরিবারে আসিয়া লুকাইয়া আছে। ধানবাদ কিংবা যে-কোন স্টেশনে গেলেই দেখা যাইবে কতকগুলি ছোট-বড় নানা আকারের এঞ্জিন অবিশ্রান্তভাবে গর্জন করিতে করিতে এদিক-ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, এই মেয়েটিকে খুঁজিয়া বেড়ানো। তাই, কাছে অনেক লোক না-জুটিলে মেয়েটি কোন শব্দই করে না, গান গাওয়া তো দূরের কথা। আহা, রাক্ষস-বাপের লক্ষ্মী মেয়ে বেচারী। পীতু ওকে উদ্ধার করিয়া নিজের কাছে রাখিতে পারিত, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে এঞ্জিনের দল বড় বড় আলোর চোখ মেলিয়া খোঁজাখুজি করে, অনেক দূরের পাহাড়ের মাথা থেকে গাছের ডগায় ডগায়, বাড়ির জানালায় জানালায় তাহাদের দৃষ্টি আসিয়া পড়ে। বড় হইয়া পীতু একটা ব্যবস্থা করিবে। ইতিমধ্যে ঝাল মাংস খাইয়া গায়ে খুব জোর করিয়া লইতেছে। ছবি চোখ বড় বড় করিয়া বলে, "খু—ব ঝাল মাংস খেয়ে পীতু একটুও উস্‌আস্‌ করে না, পার তুমি মেজকা ?"

কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া সকলেই কথা কয়, এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে ;—মনে করেন বুঝি মাছেরা কথা কহিতে পারে না ?—পারে। কয় না পেটে জল ঢুকিয়া যাইবার ভয়ে। পুকুরে ডুবিয়া একবার কথা কহিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না—পীতুর কথা সত্য কি না। পুকুরে যদি জল না-থাকিত তো মাছেরা খুব কথা কহিত। অবশ্য যে-পুকুরে মাছও নাই, জলও নাই, সে-সব মাছ আর সে-সব পুকুরের কথা হইতেছে না।

গোটাকতক নমুনা দেওয়া গেল, মোটের উপর সব জিনিস সম্বন্ধেই পীতুর এই রকম নিজের একটি স্বাধীন মতামত আছে। আপনাদের সঙ্গে

মেলে না বলিয়াই যে সেগুলা অবহেলার যোগ্য, এমন মনে করি না। একই সৃষ্টি—আপনারা দেখেন এক রকম চোখে, পীতু এবং পীতু-পন্থীরা দেখে অন্য রকম চোখে। কে ঠিক দেখে, কি করিয়া বলিব? এই যে মায়াবাদীরা বলে আপনারাই ভুল দেখিতেছেন। পীতুও এক ধরণের মায়াবাদী।

আমার দৃষ্টিতে আসুক সেই মায়া যাহা পীতুর চক্ষে বুলান আছে। আপনারা বলিবেন, ছবির শিষ্য বলিয়াই আমার এ ধরণের অভিরুচি; ছবি দিন দিন ওদের কল্পলোকের কাহিনী শুনাইয়া, দৃশ্য জগতের নিত্য-নূতন ব্যাখ্যা দিয়া আমাকে, আপনাদের চক্ষে যাহা সত্য, তাহা হইতে স্খলিত করিতেছে। সম্ভব।

কিন্তু এই সত্যচ্যুতিতে আমার কোন দুঃখ নাই। এ আমার পরম বিলাস; তাই প্রতিদিনের আপনাদের এই গতানুগতিক জীবনে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, বার-বার পড়া একই কাহিনীর মত জীবন যখন ঠেকে নিতান্ত বিস্বাদ, অনুচ্চাবচ সমতলের মত বৈচিত্র্যহীন, ছবিকে কাছে ডাকিয়া লই, ধানবাদের পীতুর কথা পাড়ি। দেখিতে দেখিতে নীল পাহাড়ের স্তবকে স্তবকে, অসমতল ভূমির তরঙ্গলীলায়, শিশু-শালের বনে, আর শরৎকালের স্বচ্ছ জলে ভরা সাহেব-বাঁধের দীঘিতে ধানবাদ জাগিয়া উঠে। ও-সবের মধ্যে যদি থাকেই কিছু কঠোরতা তো এই তিন শত মাইলের দূরত্বে তাহা যায় গলিয়া মিলাইয়া। অনির্দেশ-সঞ্চরমাণ দুইটি শিশু পাহাড়ে ঘেরা এবং পাহাড়কেও অতিক্রান্ত-করা সমস্ত জায়গাটিকে করিয়া তোলে একটি স্বপ্নপুরী।

ছবি প্রশ্ন করিয়া সুরু করে, "ভারি তো জান—ভগবানের বাড়ি কোথায় বল তো মেজকাকা?"

সরল প্রশ্ন, উত্তর দিই, "স্বর্গে।"

উত্তরটা নিশ্চয় নির্ভুল, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ছবি যাহা চায় তাহা নয়। মনের ভাবটা ঠিক করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য ছবি একটু ভাবে, তাহার পর বলে, "সে তো ভগবানের কলকাতার বাড়ি,—দেশের বাড়ি কোথায় ?"

প্রশ্নটা আর ততটা সরল থাকে না, আমি উত্তর খুঁজিতেছি, ছবি বলে, "পীতুদের বাড়ির জানলা থেকে ধানবাদে যে পাহাড়টা দেখা যায় না ?—অনে—ক দূরে, দেখেছ তুমি ?"

পীতুদের বাড়ি সম্বন্ধেই কোন ধারণা নাই, তাহার জানালা দিয়া কোন্ পাহাড় দেখা যায় কি করিয়া বলিব ? বলি, "না, দেখি নি তো !"

ছবি গম্ভীর হইয়া বলে, "কিচ্ছু দেখ নি তুমি, ধানবাদে গিয়ে তবে কি করতে ? পীতুদের জানালা দিয়ে আকাশে—র মতো মস্ত একটা পাহাড় দেখা যায়। ভগবানের বাড়ি তার পেছনে, মশায়।....হ্যাঁ !—হাসছ তুমি, ভারি তো জান ; ভগবানের বাড়ি ঠিক তার পেছনে। সেখান থেকে রোজ সক্কালবেলা—কোথাও যখন কেউ ওঠে না—ভগবান্ সূয্যি-ঠাকুরকে পাঠিয়ে দেন। আহা, অত ভোরে উঠতে কষ্ট হয় না মেজকাকা সূয্যিঠাকুরের ? কি করবেন বল ? ভগবানের গায়ে হাতী—র মত জোর, ভয় করেতো ? বাবা দাদাকে ভোরবেলায় যখন পড়তে তুলে দেন, দেখ নি ?—সেই রকম চোখ রগড়াতে রগড়াতে ওঠেন সূয্যিঠাকুর। রাঙা হয়ে যায় চোখ।"

ছবি হাতটা সঞ্চারিত করিয়া বলে, "তখন কোথাও কেউ ওঠে না, খালি পীতু ওঠে। পীতুর মাও ঘুমিয়ে থাকে। পীতুর মা খু—ব সুন্দর মেজকাকা, জান ? যখন সূয্যিঠাকুর ওঠেন, পীতুর মার মুখ রাঙা হয়ে যায় ; দুগ্‌গা ঠাকুরের যেমন ঝকঝকে মুখ নয় ?—সেই রকম। এমন চমৎকার দেখায় মেজকা ! পীতু বলেছে আমায় একদিন দেখাবে। পীতু

অনেকক্ষণ ধরে দেখে। চাঁদের মতো মুখ পীতুর মার। এক-এক দিন জেগে উঠে জিগ্যেস করে, 'কি দেখছিস্ রে পীতু অমন করে?' মেজকাকা, চাঁদ কে বল তো?"

বলি, "সুয্যিঠাকুরের ছোট ভাই।"

ছবি এমন হাততালি দিয়া হাসিয়া ওঠে যে সত্যই নিজের মূঢ়তার জন্য অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হয়। ও বলে, "কিছু জান না মেজকাকা তুমি, শুধু দোরের মত উঁচু হয়েছ,—চাঁদ সুয্যিঠাকুরই মশাই, রাত্তিরে চাঁদের মতন দেখায়; পীতু বলেছে।"

আমি ওকে এক রকম হারাইবার জন্যই বলি, "চাঁদ যে সুয্যিঠাকুর বলছ, তবে অত চক্‌চক্ করে না কেন?"

দুবল প্রতিপক্ষকে হারাইবার উপযোগী অবজ্ঞার সহিত ছবি বলে, "রাত্তিরে যে রোদ্দুর থাকে না মশাই, কি করে করবে চক্‌চক্?....উনি পীতুর চেয়ে বেশি জানেন!....এবারে ধানবাদে গিয়ে পীতুকে বলব তোমার বুদ্ধির কথা, হেসে গড়িয়ে যাবে'খন।"

হঠাৎ হাঁ-টি ছোট এবং গোল করিয়া লইয়া চোখ দুইটা বড় করিয়া ছবি প্রশ্ন করে, "মেজকাকা, তুমি ভগবানকে দেখেছ?"

বলি, "না, তাঁকে কি দেখা যায় ছবি?"

—"নাঃ, দেখা যয় না! তবে পীতু কি করে দেখলে মশাই?"

—"পীতু দেখেছিল নাকি?"

ছবি খুব টানিয়া জোরের সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ—! পীতুর পাঠশালের গুরুমশাই মরে গিছলো কিনা, তার শ্রাদ্ধতে পীতুকে দই দিতে বলেছিল। আহা, কোথায় পাবে দই পীতু, মেজকাকা? গরীব মানুষ, গেরো-দেওয়া কাপড় পরে—চালের পিটুলিকে দুধ বলে ওর মা ওকে খাওয়ায়; কোথায় দই পাবে মেজকাকা? পীতুর মা বললে, 'তোর মধুসূদন দাদাকে

ডাকিস, তিনি দেবেন দই।' যে দিন শ্রাদ্ধ না মেজকাকা?—পীতু ওদের বাড়ির ওদিকটায়, একলা পলাশ-বনের ধারে গিয়ে—কোথায় মধুসূদন দাদা, কোথায় মধুসূদন দাদা, এস, দই দিয়ে যাও' ব'লে কাঁদতে লাগল। আহা, কাঁদবে না মেজকা?—দই না নিয়ে গেলে ওকে মারবে যে। কেঁদে কেঁদে ওর চোখের জলে একটা নদী বয়ে, পলাশ-বনের মধ্যে দিয়ে ছোট পাহাড়ের পাশ দিয়ে ভগবানের বাড়ির দিকে—যেদিকে সূয্যি ওঠে—কত দূর চলে গেল। অমনি এক জন থুড়থুড়ে বুড়ো লাঠি ধরে ঠুক্‌ঠুক্ করতে করতে, হাতে করে এক ভাঁড় দই নিয়ে এসে বললে 'এই নাও দই, এর জন্যে কি এত কাঁদে?'....এ বুড়ো কে বল তো মেজাকা?"

বুঝিতেই পারিতেছেন গল্পটি একটি প্রাচীন উপাখ্যান। কল্পনাপ্রবণ পীতু ওটিকে নিজের জীবনে আত্মসাৎ করিয়াছে,—গেরো-দেওয়া কাপড় আর চালের পিটুলির দুধ-সমেত সমস্ত গল্পটি তাহার তরুণ মনে বড় লাগিয়াছে। অবশ্য, আবশ্যক-মত একটু পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে। মূল উপাখ্যানে বোধ হয় গুরুমহাশয়ের মায়ের শ্রাদ্ধ ছিল, নিজের গল্পে পীতু খোদ গুরুমহাশয়েরই অন্ত্যেষ্টি ঘটাইয়াছে। এটা পীতুর মরজি বলুন, সাধই বলুন বা সুবিধাই বলুন।

আমি প্রশ্ন করি, "বুড়ো, ভগবান্ বুঝি?"

ছবি সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলে, "ঠিক বলেছে রে! তুমি বুঝতে পার মেজকাকা, খুব বোকা নয় তো!"

আমি বলি, "কিন্তু এই তুমি বল—ভগবান্ আকাশের মত বড়, আর রেলগাড়ীর চেয়েও দৌড়ুতে পারেন?"

—"সে তো যখন রাক্ষসের সঙ্গে কুস্তি করেন, মশাই। দই আনবার সময় অত জোর নিয়ে কি হবে? যদি দই না আনলে ওরা পীতুকে

মারত তো দেখতে ভগবানের জোর!"—খপ্ করিয়া আমার হাতের কড়ে-আঙুলটা ধরিয়া বলিল, "ভগবানের এই আঙুল দিয়ে ওদের সব্বার গায়ে একটা পাহাড় ঠেলে দিতেন।....হুঁ, চালাকি নয় মশাই!"

ভীত হইয়া বলি, "ভাগ্যিস তাহলে দই এনে দিয়েছিল বুড়ো, নইলে...."

ছবি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরে, শঙ্কিত কণ্ঠে নিম্নস্বরে কহে, "জিব কামড়াও মেজকাকা, শিগ্‌গির, ভগবানকে বুড়ো বললে! এক্ষুণি এ-রকম শাপ দেবেন...."

চাপা ঠোঁটে বলি, "হাতটা সরাও, বের করি জিবটা কামড়াবার জন্যে। বড্ড রাগ করেন বুঝি 'বুড়ো' বললে?"

—"হ্যাঁ। পীতু কখ্খনও 'বুড়ো' বলে না। তাই কত ভালবাসেন। বাড়ি গেলে কত আদর করেন, কত্তো খাবার দেন...."

বলি, "খেতে দেন? তাহ'লে তো একবার গেলে হ'ত ছবু। পীতু জানে পথটা?"

"ওমা, জানে না?"—বলিয়া ছবি গুছাইয়া বসে। রাফেলের আঁকা শিশু-পরীর মত করতলে চিবুক রাখিয়া, আমার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দেয়। চোখে কোন্ এক অজানা লোকের আলোক ঝলমল করিতে থাকে।....

পীতু জানে বইকি, ছবিও জানে। পীতুতে ছবিতে মিলিয়া কতবার গিয়াছে। পীতু একবার একলা গিয়াছিল। ওর মার কাছে যেদিন ধ্রুবের-গল্প শুনিয়াছিল না?—সেই দিন, রাত্রিবেলা। সেদিন সকাল-বেলা ঠিক যেখান দিয়া সূর্য ওঠে, রাত্রে ঠিক সেইখান দিয়া সূর্যটা চাঁদ হইয়া বাহির হইল। শোবার সময় পীতুর মার মুখে অন্ধকার ছিল, গল্প বলিতে বলিতে খোলা জানালা দিয়া আলো ফুটিয়া উঠিল! কপালে কাচপোকার টিপ 'আকাশে—র' মত নীল হইয়া উঠিল। চাঁদের চেয়েও



জিব কামড়াও মেজকাকা,...শীগ্‌গির

পীতুর মার মুখ সুন্দর, মশাই! চাঁদের কপালে মায়ের মত রাঙা পাড় আর সিঁদুর নাই, পান খাইয়া চাঁদের ঠোঁট মায়ের মত রাঙা হয় না।.... পীতু মাকে বড় ভালবাসে—ভগবানের চেয়েও। গল্প শুনিতে শুনিতে

দিন পীতু কাঁদিয়াছিল। আহা, ধ্রুবের মায়ের মতন পীতুর মায়ের যদি মোটে একখানি কাপড় হয়, আর ওর বাবা যদি ঝড়ে বৃষ্টিতে বনে বনে ঘুরিয়া হঠাৎ রাত্রে আসিয়া পড়ে! তাহা হইলে তো মাকে তাই থেকে আধখানা ছিঁড়িয়া দিতে হইবে? তাই গল্প শুনিতে শুনিতে পীতু খুব কাঁদিয়াছিল। ওর মাকে জানিতে দেয় নাই—আস্তে আস্তে চোখের জল গড়াইয়া বালিস ভিজিয়া গিয়াছিল। পীতু খুব সেয়ানা ছেলে মশাই। পীতুর বাবা বকিলে ওর মা যেমন চুপ করিয়া কাঁদিতে পারে না?—পীতুও সেই রকম ভাবে কাঁদিতে পারে।...ছবি বলিল, "খু—ব আস্তে আস্তে, খালি ভগবান সে-রকম কান্না শুনতে পারেন। মেজকা, পার তুমি কাঁদতে সে-রকম করে?"

পীতু গল্প শুনিতে শুনিতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ঠিক করিল, মা ঘুমাইলে সে ধ্রুবের মতো ঘুমন্ত মায়ের পাশ হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া ভগবানের কাছে চলিয়া যাইবে এবং গিয়া বলিবে—মায়ের যেন কখন মোটে একখানি কাপড় না হয়, আর বাবা বনে বনে ঘুরিয়া যদি রাত্রে হঠাৎ আসিয়া পড়ে, ভগবান যেন দুয়ারের পাশটিতে চুপি চুপি খাবার রাখিয়া যান। কাহারও কাছে চাহিতে গেলে মার বড্ড লজ্জা করে, চোখে জল আসে; সে-সময় মাকে দেখিলে বড কষ্ট হয়। ভগবান্ তো পীতুর মাকে জানেন না, পীতু গিয়া সব বলিবে।

সেদিন রাত্রে মা যখন গল্প বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িল, ভগবান আসিয়া পীতুর চোখে তাঁহার ঘুমের মত ঠাণ্ডা আর নরম হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার পর পীতু উঠিল। ধ্রুবের মায়ের মত পীতুর মা পীতুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেই গেরোটা বাঁতি দিয়া কাটিল, তাহার পর ভগবানের বাড়ির দিকে চলিল। তাহার আগের দিন মধুসূদন দাদাকে ডাকিয়া ডাকিয়া চোখের জলের যে নদী হইয়া গিয়াছিল—না?

পীতু তাহার ধারে দাঁড়াইয়া খুব কাঁদিয়া কাঁদিয়া মধুসূদন দাদাকে আবার ডাকিতে লাগিল। তাহার চোখের জলের নদী বাড়িতে বাড়িতে 'আকাশে—র' মতো বড় হইয়া গেল এবং একটা সোনার নৌকা আসিয়া ধারে দাঁড়াইল। ছবি মামার বাড়িতে যে নৌকা চড়িয়া গিয়াছিল তাহারা চেয়ে অনে—ক ভাল নৌকা, অনে—ক বড নদী, অনে—ক বেশি হাওয়া; নৌকার সোনার পাল হাওয়ায় ফুলিয়া গিয়াছে।

যাইতে যাইতে কত দূর চলিয়া গেল পীতু। বাবার সঙ্গে কিংবা একলা চুরি করিয়া যতদূর বেড়াইতে যায় তাহার চেয়ে আরও অনেক দুর। অত আলো ছিল তো? ভগবানের বাড়ির যত কাছে যাইতে লাগিল, আলো ততই আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ধানবাদ ইস্টিশানের চেয়ে ঢের বেশি আলো। পীতুর এক একবার ভয় করিতেছিল। পীতুর একটুও ভয় করে না, মশাই! ঝাল মাংস খাইয়া ওর গায়ে খুব জোর হইয়াছে। ওর মা যদি কাছে থাকে, আর রাক্ষস যদি 'দুঃখিনী সীতার মতন' ওর মাকে ধরিতে আসে তো এ—ক চাপড়ে রাক্ষসকে মারিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু ওর মা তো কাছে ছিল না, তাই পীতুর....ভয় করিতেছিল না....পীতুর একটুও ভয় করে না....মায়ের জন্য শুধু মন কেমন করিতেছিল। তখন ভগবান ওর নৌকা দুলাইয়া দুলাইয়া ওকে ঘুম পাড়াইয়া দিলেন। যখন ঘুম ভাঙ্গিল না?—পীতু দেখিল পাহাড়ের ওদিকে, ভগবানের আরও আলোর দেশে পীতু পৌঁছিয়া গিয়াছে। কত বড় দেশ! কত বড় সোনার বাড়ি! 'আকাশে—র' মতো উঁচু। ঝরিয়ার রাজার বাড়িতে যেমন ঝাড়-লালঠেম টাঙানো আছে না?—ছবি দেখে নাই কিন্তু পীতু একবার পূজার সময় দেখিয়াছিল—তাহার চেয়েও অনেক ভাল ভাল অনে—ক লালঠেম টাঙান....

পীতুর অভিজ্ঞতায় গরবিনী ছবি আমায় পরীক্ষার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, "কিসের আলো বল তো মেজকাকা ?"

বোধ হয় আমা হেন অনভিজ্ঞের পক্ষে উত্তরটা নিতান্তই অসম্ভব ভাবিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বলিল, "তারার ঝাড়-লালঠেম !....হ্যাঁ মশাই, তুমি তো ভারি জান ! পীতুর মা বলেছে ভগবানের বাড়িতে খালি তারার ঝাড়-লালঠেম টাঙান আছে !—তারার লালঠেম না হ'লে পীতুর নৌকায় অত আলো করেছিল কি করে ?—বল না এবার মশাই ।"

এমন অকাট্য প্রমাণের সামনে আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

ছবির বর্ণনা চলিল—

ভগবান জানিতেন পীতু আসিবে। তাহা না হইলে নৌকা কে পাঠাইয়া দিয়াছিল ? নৌকা ঘাটে লাগিলে ভগবান নামিয়া আসিয়া পীতুকে কোলে করিয়া লইলেন। চুমা খাইলেন। কি সুন্দর যে দেখাইতেছিল ভগবানকে !....ভগবান যখন ভালবাসেন তখন আর প্রকাণ্ড থাকেন না, তাঁহাকে দেখিলে ভয় হয় না। তখন তিনি খুব সুন্দর হইয়া যান। তখন, মা পূজার সময় যে-মালা পরান, ভগবানের গলায় সেই মালা দুলিতে থাকে। মায়ের দেওয়া মালাশুদ্ধ তাঁকে খুব আপনার লোক বলিয়া মনে হয়। একটুও ভয় করে না। পীতুর কিন্তু লজ্জা করিতেছিল। বিকালের গাড়িতে পীতুর বাবা এক-এক দিন আসিয়া পীতুকে কোলে লইয়া যখন চুমা খায় তখন যেমন লজ্জা করে, সেই রকম লজ্জা।

পীতু তো বড় হইয়াছে ? ওদের ছোটখুকীর মতো তো ছোট নয়,—লজ্জা করিবে না ?

ছবি আবার প্রশ্ন করিল, "ভগবান পীতুকে কেন কোলে করে নিলেন বল তো মেজকাকা ?"

বলিলাম, "ভালবাসতেন বলে।"

নির্বুদ্ধির ক্রমাগত ভুল উত্তরে লোকে যেমন জ্বালাতন হইয়া যায়, সেইভাবে ছবি ঈষৎ ঝংকার করিয়া উঠিল, "আর কাদা লেগে যাবে না বুঝি পীতুর পায়ে? কিচ্ছু যদি জান তুমি!"

আমি প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, "আর ভগবানের পায়ে কাদা লেগে গেল না? তিনি বুঝি বুট জুতো পরে ছিলেন?"

ছবির হিউমারের দৃষ্টিটা বেশ প্রখর, হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল তাহার পর আবার গম্ভীর হইয়া, বিচক্ষণের মত মাথা দোলাইয়া একটু ব্যঙ্গ হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবানের পায়ে বুঝি কাদা লাগে? কি বুদ্ধি তোমার মেজকাকা!"

বলিলাম, "লাগে না বুঝি?"

ছবি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, না,—একটুও না।"

একটু চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "ভগবানের পায়ে কাদাও লাগে না, হাতে কালি লাগে না, সাবান মাখলে চোখ জ্বালা করে না, বিষ্টিতে ভিজলে সর্দি করে না, ওরা সব যে ভগবানের চাকর, মশাই; পীতুর মা বলেছে! আর জান মেজকা?"

প্রশ্ন করিলাম, "কি?"

"ওল খেলে ভগবানের মুখ কুট্‌কুট্ করে না, একটুও তেঁতুল খেতে হয় না।"

ভগবানের এই গূঢ় শক্তির আবিষ্ক্রিয়াটা নিশ্চয় ছবির নিজের, কেন-না আজ সকালেই ওল খাইয়া তাহার নিজের নির্যাতন গিয়াছে। আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "তাই নাকি? খুব সুবিধে তো ভগবানের! আচ্ছা তারপর ভগবান কি করলেন বল।"

ভগবানের বাড়িতে অনেক চাকরানী আছে। বুঝি মনে করিয়াছেন তাহারা আমাদের বাড়ির 'বিদেশিয়া-কে-মা'-এর মতো লম্বা, কালো এবং

ময়লা কাপড় পরা ? না, তাহারা সব খুব সুন্দর ; পীতুর মায়ের মুখে চাঁদের আলো পড়িলে যেমন সুন্দর দেখায়, সেই রকম। তাহাদের শাদা পায়রার মত বড় বড় ডানা আছে ; পীতুদের ঘরে টাঙানো মেমসাহেবদের ছবিতে যেমন আছে না, সেই রকম। এক-এক দিন সকালবেলা পাহাড়ের ওদিকে ভগবানের বাড়ির উপর যখন ছোট ছোট রাঙা রাঙা মেঘ করে, এরা মেঘের সিঁড়ি দিয়া, আলোর রাস্তা ধরিয়া, গান করিতে করিতে আকাশে উঠিয়া যায়। পীতু ভোরবেলা উঠিয়া যখন জানালা দিয়া মেঘের দিকে চাহিয়া থাকে, ঘুমন্ত মায়ের আর খুকীর মুখে, আর ডানাওয়ালা মেমসাহেবদের ছবিতে আলো আসিয়া পড়ে, তখন অনেকবার ইহাদের দেখিয়াছে। পীতুর মা বলেন এদের পরী বলা হয়, পীতুদের খুকী মায়ের কোলে আসিবার আগে পরী ছিল।....পরীরা নরম ডানার মধ্যে করিয়া পীতুকে লইয়া গেল....বেশ লাগে, মনে হয় ঠিক যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া হইতেছে আর মা আঁচলে করিয়া পীতুকে ঘিরিয়া আছে। পীতুর মাও নিশ্চয় আগে পরী ছিল, পীতুকে এমনি করিয়া ডানায় ঢাকিত, এখন যেমন রাঙা পাড়ের আঁচলে করিয়া ঢাকে।

তাহার পর সোনার জলের ঝরনায় নাওয়া। পীতুর মা যে বলে সেখানকার জলে স্নান করিলে সমস্ত পাপ ধুইয়া গিয়া আলোর শরীর হয় তাহা একটুও মিথ্যা নয়। দেখিতে দেখিতে পীতুও পরীদের মত হইয়া গেল। মেমদের ছবিতে ডানা-বসানো খোকা সব হাতজোড় করিয়া আছে না ?—সেই রকম। তখন কিন্তু তাহার মায়ের জন্য বড় মন কেমন করিয়া উঠিল,—মা যদি চিনিতে না পারে ! যদি মনে করে পীতু আসলে সত্যই তাহাদের ঘরের মেমসাহেবদের ছবির শাদা পাখাওয়ালা ছোট ছেলে ; মিছামিছি পীতু হইয়া নামিয়া আসিয়াছে ! তাহা হইলে কি হইবে ?

না, পীতুর এসব ভাল লাগে না ; ছেঁড়া কাপড় পরা ধ্রুবের মতো সে মায়ের কাছেই থাকিবে। ভগবানের চেয়ে মা অনেক ভাল। আর পীতু না থাকিলে ভগবান তো বাঁচিয়া থাকেন, মা কিন্তু কোন মতেই বাঁচিবে না যে!

ভগবান সবার মনের কথা বুঝিতে পারেন, মশাই! পীতুকে কোলে লইয়া চুমা খাইয়া তাহার মনের ভয় সরাইয়া দিলেন। পীতু মার কথা ভুলিয়া গেল। কত খাবার দিলেন। গোবিন্ হালুয়াইয়ের দোকানের চেয়ে আরও অনেক মিষ্টি খাবার। তাহার পর আরও কত কি দিলেন; —পীতুর বাবা, পূজার সময় টাকা ছিল না বলিয়া যে বড় জাপানী ডলটা কিনিয়া দিতে পারেন নাই, সেইটা ; নেমন্তন্নর দিন ওদের বাড়ির অজু যেমন জরি-বসানো জামা পরিয়াছিল, সেই রকম জামা ; ইস্টিশানের সাহেবদের বাগানের পোষা হাঁস ;—পীতুর মনের কথা নিজে নিজেই জানিয়া সমস্ত দিলেন পীতুকে। আরও কত কি দিলেন, কত জায়গায় লইয়া গেলেন—কত রাঙা রাস্তার ওপর দিয়া—লতার ফুলে ঢাকা কত বাড়ির কাছ দিয়া—কত পাহাড়ের গা বাহিয়া, সাঁওতালরা যেমন করিয়া যায়—কত রাঙা, হল্‌দে, বেগুনে মেঘে পা ফেলিয়া—সাতরঙা রামধনুর নীচে দিয়া কত জায়গায় লইয়া গেলেন। ভগবানের গায়ের আলোয় পরীদের গায়ের রং কত সুন্দর হইয়া উঠিল· ··

বর্ণনায় হারিয়া ছবি বলিল, "সে তুমি বুঝবে না মেজকাকা, কখনও দেখনি কিনা। পীতুর মা বলে, 'বড়রা সে পায় না দেখতে।' পীতুদের বাড়ীর জানলা দিয়ে যে পাহাড় দেখা যায় তার ওধারে আছে সব। সেখানে যখন পাহাড়ের মাথায় রামধনু ওঠে, কি মেঘের মধ্যে মধ্যে চাঁদের রূপোর নৌকো ঢেউ ভেঙে ভেঙে চলে, সে সময় পীতু দেখতে পায় ভগবানকে, পরীদের,—কত বাজনা-বাদ্যি করে আগে-পিছে



কত রাঙা, হল্‌দে বেগুনে মেঘে পা ফেলিযা…

ভগবানের লোকেরা যাচ্ছে। পীতু সব দেখে; আমায়ও কতবার দেখিয়েছে মশাই, ওর মাকেও দেখিয়েছে। কিন্তু পীতুর মা দেখতে পায় না; পীতুর মা বলে—কেউ বড়রা দেখতে পায় না; ভগবান বড়দের ওপর রাগ করেন।”

ঐ সব রাস্তা দিয়া ভগবানের স্বর্গের বাড়িতে যাওয়া যায়। যাইতে যাইতে পীতুরা কত দূর গেল,—মেঘের রাজ্য অতিক্রম করিয়া, রামধনুর ফটক পার হইয়া, কত উঁচুতে—রাত্রে যেখানে তারার জানালা খুলিয়া দিয়া আকাশের ওদিক থেকে দেব-বধূরা দলে দলে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে—সেইখানে। সে-জায়গাটায় একটু ভয়-ভয় করে, কেন-না সেটা রাত্রির অন্ধকারের দেশ। এদিককার আলো কমিয়া কমিয়া সেইখানটায় শেষ হইয়াছে, আর উপর থেকে স্বর্গের আলোও পৌঁছায় নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পৃথিবীর হাজার হাজার দুষ্টু ছেলে যখন খেলাধূলা শেষ করিয়া আসিয়া মায়েদের, দিদিদের ঘাড়ে পিঠে চড়িয়া দুরন্তপনা করে, সেই দেশ থেকে তখন অন্ধকার আস্তে আস্তে ভগবানের দেশের ওপরও কালো ডানার ছায়া ফেলিয়া নামিয়া আসে।....সেখানে পৌঁছিয়া পীতুর মায়ের জন্য বড্ড মন কেমন করিয়া উঠিল। চোখ নামাইয়া পীতু দেখিতে পাইল নীচে অনেক—অনেক অনে—ক দূরে, তাহাদের ধানবাদের ছোট্ট ঘরটিতে পীতুর মা খুকীকে সঙ্গে লইয়া ঘুমাইয়া আছে; ঘুমাইয়া থাকিলে মায়ের মুখে যে-হাসিটি লাগিয়া থাকে সেই হাসিটি এখান থেকে দেখা যায়। মায়ের শাড়ির রাঙা পাড়, মায়ের পায়ের রাঙা আলতার ওপর দিয়া, গায়ের ওপর দিয়া মায়ের চুড়ি-পরা হাতের সঙ্গে খুকীকে জড়াইয়া, বুকের ওপর দিয়া, কালো চুলের সঙ্গে মিশিয়া গেছে; ভোরের মেঘে যেমন সোণার পাড় বসানো থাকে না?—ঠিক সেই রকম। ঘরের এদিকটায় চাঁদের আলো, কিন্তু ও-পাশটায়—পীতু যেখানটায় নাই, সেইখানটায় চাঁদের আলো নাই। পীতু সমস্ত রাত মায়ের হাতটি বুকে লইয়া শোয়, যেখানে তাহার বুক ছিল হাতটি এখনও সেইখানে পড়িয়া আছে। পীতুর মা না-জানিয়া মনে করিতেছে তাহার হাত এখনও পীতুর গায়েই আছে, মনে করিতেছে ওটা বালিশ

নয়, পীতুর নরম বুক। তাই তাহার মুখে হাসি। পীতুকে বড্ড ভালবাসিত কি না,—ভগবানের চেয়েও।

পীতুর ভয়ানক মন কেমন করিয়া উঠিল। অন্ধকারের দেশ পার হইয়া আবার যদি ফিরিয়া আসিতে না পারে! যদি ভগবানের স্বর্গের বাড়ি এত সুন্দর হয় যে মায়ের কথা একেবারেই মনে না পড়ে!—কলকাতায় একবার রতন-দিদির বাড়িতে গিয়া যেমন একেবারে মনে পড়ে নাই!....মায়ের ঘুমন্ত মুখে এখনও হাসি দেখা যাইতেছে, মা মনে করিতেছে পীতুর বুকে হাতটি রহিয়াছে, তাই। ঘুম ভাঙিলেই মা যখন দেখিবে পীতু নাই, যখন বুঝিবে পীতু তাহার অত করিয়া বাঁধা আঁচলের গেরো কাটিয়া, তাহার চোখের জলের নদী দিয়া, ভগবানের পাহাড়-ঘেরা বাড়ি পার হইয়া অন্ধকারের দেশ পার হইয়া ভগবানের স্বর্গের বাড়ি চলিয়া গিয়াছে—তখন!

ভয়ানক মন কেমন করিয়া উঠিল পীতুর। ভগবান তো মনের কথা টের পান? টের পাইয়া আগেকার মত ভুলাইয়া দেওয়ার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পীতু আর কিছুতেই ভুলিল না,—পীতুর বাবা একবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় পীতুকে যেমন কোন মতেই ভুলাইতে পারে নাই, সেই রকম। পরীরা কত বুঝাইল, আদর করিল, বলিল, অন্ধকারের ওপারে গিয়া তাহাকে ঝরিয়ার রাজার মতো বাড়ি দিবে, গাড়ি দিবে, অজুর চেয়েও ভাল ভাল জামা দিবে; পীতুর কিন্তু সব জিনিসের চেয়ে মাকে ভাল লাগিতেছিল। তখন ভগবান আরও চেষ্টা করিলেন, আরও লোভ দেখাইলেন; বলিলেন—ধ্রুবকে যেমন ধ্রুবলোক করিয়া দিয়াছিলেন—আকাশের অনেক দূরে এখনও দেখা যায়—পীতুকেও সেই রকম আকাশের চেয়েও আরও উঁচুতে ধ্রুবলোক করিয়া দিবেন; আরও কত কথা সব....

পীতুর একবার মনে হইল, যাই; মার যদি কষ্ট হয়?—খুকুকে কোলে

লইয়া ভুলিবে। ভগবান এমন করিলেন যে পীতু একটুখানি ভুলিয়া গেল মাকে, এ—কৃটুখানি,—ঘুমাইবার সময় একটুখানি যেমন ভুলিয়া যায় না লোকে?—সেই রকম। ঠিক সেই সময় হঠাৎ সে রাস্তার পাতলা অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখিতে পাইল—অনেক নীচে, ধানবাদের ঘরটিতে তাহার মা পাশ ফিরিতেই কাটা আঁচলটা কাপড়ের মধ্যে থেকে বাহির হইয়া পীতু যেখানটায় শুইয়াছিল সেইখানটায় লুটাইয়া পড়িল যাঁতি দিয়া কাটার দরুন পাড় হইতে সূতা বাহির হইয়া যেন রক্তের মত দেখাইতেছে।....মা যদি এখনই উঠিয়া পড়ে!....মুখের হাসি এখনও মুখে লাগিয়া আছে।

পীতু ভগবানের বুকে ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল। না সে যাইবে না;—তাহার চাই না কিছু—চাই না ধ্রুবলোক। সে মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইবে। ভগবান বড় দুষ্টু, ভগবানের চেয়ে মা ঢের ভাল। মা তো রোজ ভগবানকে পূজা করেন, সন্ধ্যার সময় তুলসী-তলায় প্রদীপ দেন, সকালবেলায় স্নান করিয়া মাটির ভগবান গড়িয়া ফুলচন্দন চড়ান। মায়েরই দেওয়া মালা তো এখনও ভগবানের গলায়; তবুও কেন পীতুকে মায়ের কাছে যাইতে দিতেছেন না? পীতু যাইবেই যাইবে। ভগবান যদি না ছাড়েন, ধ্রুব যেমন আগুনের মধ্য থেকে, বাঘেদের মধ্য থেকে ভগবানের তপস্যা করিয়াছিল, পীতুও ধ্রুবলোকে গিয়া মার জন্য সেই রকম তপস্যা করিয়া আবার সেখান থেকে মায়ের কাছে নামিয়া আসিবে। না; পীতুকে ভগবান জানেন না,—পীতু মাকে বড্ড ভালবাসে—ভগবানের চেয়েও—পরীদের চেয়েও—স্বর্গের চেয়েও—ধ্রুবলোকের চেয়েও....

বলিলাম, "ভগবান চটে গেলেন না ছবি?"

ছবি একটি স্বপ্নের মধ্যে ছিল যেন, মুখে একটি শান্ত করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটু ভাবুকতার সঙ্গে, একটু ক্ষমার সঙ্গে, একটু আর

একটা কি অনির্বচনীয়তার সঙ্গে স্মিত হাস্যের সহিত ধীর কণ্ঠে বলিল, "না মেজকাকা, ভগবান যে বড্ড ভাল। পীতুকেও যেমন ভালবাসেন, ওর মাকেও সেই রকম ভালবাসেন কি না। আর ওপরে গেলেন না। আর অন্ধকারও রইল না। পীতুকে কত চুমু খেলেন, কত আদর করে কত সব কথা বললেন, পরীরাও কত চুমু খেলে, কত গালে হাত বুলিয়ে বললে, 'তোমার মায়ের কাছেই এবার থেকে তোমার জন্যে ভগবান থাকবেন পীতু ; সেইখানেই তোমার জন্যে ধ্রুবলোক গড়ে দেবেন।'.... তার পর আবার কত আলোর মধ্যে দিয়ে, কত বাজনাবাদ্যির মধ্যে দিয়ে, চাঁদের নৌকো করে নদী বেয়ে পীতুকে নামিয়ে নিয়ে এলেন।....হ্যাঁ মশাই, নিয়ে এলেন নামিয়ে, না-হ'লে পীতু যখন উঠল, কি করে দেখলে ঠিক যেমন করে মায়ের হাত বুকে নিয়ে শুয়েছিল, সেই রকম করেই রয়েছে ?....আর মেজকাকা, কি আশ্চর্য জান ?"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ?"

"আঁচল যে কেটে পীতু চলে গিয়েছিল কি না ?—উঠে দেখলে একটুও কাটা নেই। ভগবান যদি আসেন নি তো কে জুড়ে দিয়ে গেল মেজকাকা ? তুমি পার ? আর পীতু দেখলেও যে নিজে। যখন চোখ খুললে না ?—দেখলে ভগবানের পাহাড়ের বাড়ির ওপরে নতুন স্থয্যির আলো কেঁপে কেঁপে উঠছে—কত গান হচ্ছে—মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে ; আর রাঙা মেঘ দিয়ে গড়া সোনার সিঁড়ি বেয়ে ভগবান, তার পরীরা আর সোনার পোষাক প'রে বাজনা বাজিয়ে যারা সঙ্গে এসেছিল—সব ফিরে যাচ্ছে....হ্যাঁ, দেখলে পীতু মেজকাকা ; তখন আর একটু মনও কেমন করেছিল—মনে হচ্ছিল, ভগবান এত ভাল, এত লক্ষ্মী ; কিন্তু পরীরা যে বললে পীতুর মায়ের কাছে থাকবেন সর্বদা—যদি ভুলে গিয়ে না-থাকেন কোন দিন !...."

১৩৪৫]

ল্যান্স্‌ডাউন ও বিপিনপাল

কলিকাতা কংগ্রেসী কর্পোরেশনের মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে। গুরু-লঘু জ্ঞান হারান মতিচ্ছন্ন ধরারই লক্ষণ বৈকি, আর ল্যান্স্‌ডাউন্‌-বিপিনপালের প্রভেদ না বোঝা গুরুলঘুভেদ-জ্ঞানের অভাব বলিব না তো কি বলিব?

ল্যান্স্‌ডাউন্‌ কে ছিল?—ও প্রশ্ন তুলিয়া আর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবেন না। কথাটা জিহ্বাগ্রে লইয়া একবার মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করুন দেখি—একবার টাগরায় ফেলুন, একবার এ-গালে নিন, একবার ও-গালে··· কেমন? আভিজাত্যের রসে মুখটা ভরিয়া উঠিতেছে না?—ল্যান্স্‌ডাউন্‌ ঐ জিনিস! **"It stands for dignity, it stands for aristocracy; Landsdowne is Lansdowne and is not to be coupled with your Bepin Pauls or Bhopen Boses"** (ল্যান্স্‌ডাউন মহত্ত্ব আর আভিজাত্যের প্রতীক; ল্যান্সডাউন ল্যান্স্‌-ডাউনই—ওর সঙ্গে তোমাদের ঐ বিপিন পাল কি ভূপেন বোসেদের মিশ খাওয়াতে গেলে চলবে না)।

বাক্যগুলা আমার নয়, একজন অ্যারিস্টোক্র্যাটেরই। ব্যারিস্টার বিরাজ শঙ্কর মৌলিক (B. S. Molek) শ্বশুরের পয়সায় বৈঠকখানা রোড থেকে বিলাত যান। সেখানে মনে যে সব উচ্চাশা জন্মগ্রহণ করে তাহার মধ্যে ল্যান্স্‌ড়াউন রোড ছিল একটি। বহুদিন ঠাঁই হয় নাই, সম্প্রতি কর্পোরেশন রাস্তাটি একটু বাড়াইয়া দেওয়ায় একটি ছোটখাট বাড়ি তুলিয়াছেন। বনেদী ল্যান্স্‌ডাউনে হইল না—আহা, তবুও তো ল্যান্স্‌ডাউনই?—নয়া-পুরানোর প্রভেদ ঘুচিতে কতদিন লাগিবে?

এমন সময় খবর পাওয়া গেল কংগ্রেসী কর্পোরেশনের মতিচ্ছন্ন

রিয়াছে,—কথা উঠিয়াছে নূতন রাস্তাটির নামকরণ হইবে বিপিনচন্দ্র পাল
ড।

মৌলিক বার-লাইব্রেরীতে একটু উষ্ণ গুঞ্জন তুলিবার চেষ্টা করিল। াহার বিলাতের সঙ্গী রঞ্জন বোসের কাঁধে হাতটা চাপিয়া প্রশ্ন করিল, 'শুনছ, হ্যা, ল্যান্স্‌ডাউন এক্স্‌টেনশন্ যেটাকে বলছি আমরা এখন, কর্পোরেশন সেটার নাম করেছে বিপিনচন্দ্র পাল রোড!"

রঞ্জন বনেদী ল্যান্স্‌ডাউনের বাসিন্দা; ঘুরিয়া পাঁশ্‌নেটা নাক থেকে সরাইয়া প্রশ্ন করিল, "You really don't mean that!" (তাই নাকি? ঠাট্টা নয় তো?)

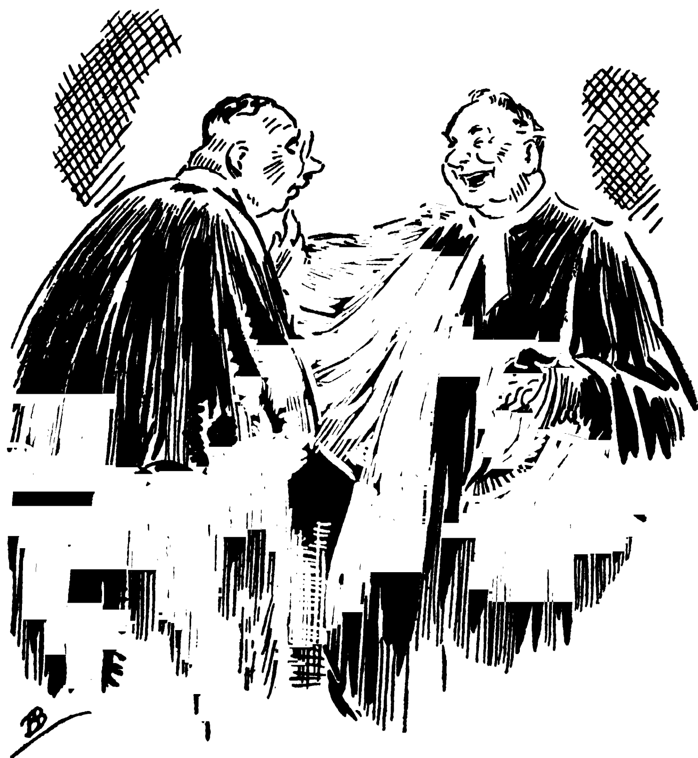
—"I mean nothing less; see—" (মোটেই নয়, দেখ বরং)—বলিয়া মৌলিক হাতের সংবাদপত্রটার একটা স্থানে নখ টিপিয়া রঞ্জনের সামনে ধরিল। রঞ্জন চশমাটা আবার যথাস্থানে বসাইয়া ভীতভাবে বলিল, "I wonder what they are up to next with their Khaddar mentality?" (ওদের এই খদ্দরা মন নিয়ে ওরা এর পরে যে আরও কি ক'রে বসবে তাই ভাবি!)

রঞ্জন একটা মোকদ্দমার নথি ঘাটিতেছিল, ঘুরিয়া আবার মনঃসংযোগ করিল।

মৌলিক মনের উত্তেজনায় একজন প্রবীণ সাহেব-ব্যারিস্টারকে বলিল দুঃসংবাদটা। সাহেব মৃদু হাসিয়া তাহার কাঁধে লঘু আঘাত করিয়া বলিল, "সোব চরখা হৈয়া যাবে মিস্টার মোলেক; I will live to see that!" (মরবনা—দেখে যাব।)....হাঃ, হাঃ, হাঃ ...

প্রাচীন এড্‌ভোকেট মিস্টার রায়চৌধুরীও নূতন রাস্তায় বাড়ি করিয়াছেন, উৎসাহভরে মৌলিক তাঁহাকেও খুঁজিয়া বাহির করিল। ব্যস্ত ছিলেন, বলিলেন "সত্যি নাকি? একটু ভাল করে খোঁজ নাও

তো। আমিও পালের নামটা সেদিন সাজেস্ট্ করেছিলাম একজন কাউন্সিলারের কাছে....নামটা মনে আসছে না...."



সোব চরখা হৈয়া যাবে মিস্টার মোলেক!

একজন ছোক্‌রা ব্যারিস্টার আলোচনাটা শুনিতেছিল। মিস্টার রায়-চৌধুরী চলিয়া গেলে মৌলিক অবজ্ঞাভরে বলিল, "**That's what I call vernacular mentality!**" (একেই নিছক দেশীমনোভাব বলি!)

কোর্টে তেমন জমিল না, জমিবার কথাও নয়। বাড়ি আসিয়া কিন্তু মৌলিক সদ্য সদ্য এক তুমুল আন্দোলন সুরু করিয়া দিল। রাস্তার দুধারে যাহারা বাড়ি তুলিয়াছে তাহাদের অনেকের সহিতই সেই দিনই দেখা করিয়া ফেলিল, এবং বিপদের কথাটা জানাইল। উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ব্যবসাদার, নানারকমের লোক। অনেকে জানিত, তাহার মধ্যে কয়েকজন মনে মনে একটু নিরাশও হইয়াছিল, কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ বা যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইতেছিল না, সঙ্গী পাইয়া তাহারা স্পষ্টভাবে নৈরাশ্য জানাইল এবং চটিল। যাহারা গায়ে মাখে নাই, উদাসীন ছিল—অর্থাৎ যাহাদের ল্যান্স্‌ডাউন, কি বিপিন পাল কি সওদাগর মুন্সি—যে কোন একটা নাম হইলেই চলিত তাহারাও আভিজাত্যের নেশায় মাতিয়া উঠিল। দু'একজন আর্মেনিয়ান সাহেব আছে, তাহারা তো যোগ দিলই। একজন মাড়োয়ারী খানিকটা জমি লইয়া খানকয়েক বাড়ি তুলিতেছে, সে একটু পিছনে থাকিয়া বলিল, "হামি ও সব অ্যাড়িস্টোকেসি-ফেসি সমঝে না; মকান্‌কা ভ্যালুয়েশন ঘাটনেসে ড্যামিজ-সুট্‌ লে আবেগা!"

আন্দোলনটা কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ ঘোরাল হইয়া উঠিল। কিন্তু বেশ কেন্দ্রীভূত না করিয়া ফেলা পর্যন্ত লাগসই হইতেছে না। মৌলিক প্রমুখ কয়েকজন খুব মাথা ঘামাইতে লাগিল এবং তাহাদের ঘর্মাক্ত মস্তকের উষ্ণতায় সমস্ত আবহাওয়টা উত্তপ্ত করিয়া তুলিল।

রঞ্জন এর মধ্যে ছিল, বলিল, "I have a brain-wave, Biraj. Let us take a leaf out of the Huq ministry's book!" (আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, বিরাজ;—এস, হক্‌ মিনিস্ট্রির পন্থা অবলম্বন করা যাক্‌) "মানে, কর্পোরেশনের ইউরোপীয়ান গ্রুপ্‌কে ভাঙ্গাও; What are they there for, if not to help us out of such

scrapes ?" (এই রকম সব বিপদ থেকে ওরা যদি আমাদের টেনে না তুলতে পারে তো আছে কি করতে ?)

মৌলিক বিপুল বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "You are a brick, Ranjan !" (তুমি একখানি রত্ন।)...."কিন্তু কথা হচ্ছে, How to do it ?" (ওটা ঘটান যায় কি করে ?)

রঞ্জন বুড়া আঙ্গুলের নখ দাঁতে খুঁটিতে খুঁটিতে গূঢ় সংকেতের সহিত বলিল, "ভাবা হয়ে গেছে, Dinner,—Lansdown Dinner !" (ল্যান্স্-ডাউন ভোজ।)

মৌলিক বিস্ময়ে, প্রশংসায়, হর্ষে খানিকক্ষণ একেবারে নির্বাক হইয়া রহিল, তারপর একটু নিরুৎসাহ হইয়া বলিল, "কিন্তু টাকা !"

"তাও ভেবে রেখেছি,—ফাদার-ইন্-ল—পরমপূজনীয় শ্বশুরঠাকুর গৌরীসেনকল্পেষু...."—বলিয়া সামনে পিছনে দুলিয়া দুলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মৌলিক একটু হাসিল, তারপর ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়িয়া বলিল, "No go" (হবার নয়)।...."তবে দাঁড়াও—হয়েছে—আমার প্রতিভাও এবার জেগে উঠেছে—শেঠজিকে ধরা যাক—সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না—যদি হিসেব খতিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় ডিনারের দামটা শেষ পর্যন্ত বাড়ির ভ্যালুয়েশনকে পুষ্ট করবে—শেঠজি ঠিক নেমে পড়বে। দিব্যি প্ল্যান—ল্যান্স্ডাউন্ ডিনার !—স্পীচেজ্—ল্যান্স্ডাউন্ জিন্দাবাদ ?—ডাউন উইথ বিপিন পাল !....কিন্তু তোমার প্ল্যানটাকে আরও মডিফায়েড্ করতে হবে ! —ইউরোপীয়ান গ্রুপকে সোজাসুজি ধরলে হবে না, খরচও অনেক।.... Here the original genius of the Maulik brand comes in (এইখানে মৌলিক-মার্কা আদি মূল প্রতিভার আবির্ভাব)।....মৌলিক মানে, অরিজিনাল, জানই। আমি লোকও ঠিক করে ফেলেছি মনে

মনে,—ম্যাকার্থি হে, তোমার শ্বশুরের বাড়ির সামনেই প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড-ওয়ালা বাড়ি। মস্ত বড় মার্চেন্ট আর ইউরোপীয়ান মহলে হিউজ ইনফ্লুয়েন্স, আর এবভ্ অল্—স্কচ্,—বাঙাল, ডাণ্ডীতে বাড়ি, সে হিসেবে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের বাঙাল বলতে পার; মাথায় একটা আইডিয়া ঢুকিয়ে দিলে না করে ছাড়বে না। ফাদার-ইন্-ল'র সঙ্গে খুব দহরম মহরম—আমাকেও চেনে, ধরা সহজ হবে। ল্যান্স্ডাউন 'ডিনার!—গেস্ট অব অ্যানার স্যার অমুক ম্যাকার্থি, কে, টি, এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা!—ওর ক্রিশ্চান নেম্ আর ডেকরেশনস্‌গুলো জেনে নিতে হবে ...Severe condemnation of Congress Corporation methods! (কংগ্রেস কার্যপদ্ধতির তীব্র নিন্দা)।....বোল্ড হেডলাইন দিয়ে 'স্টেটস্‌ম্যানে' বেরুবে। কর্পোরেশনের একেবারে গোড়া পর্যন্ত নেড়ে ছেড়ে দেব। Mr. Zakahria will simply have to shake in his shoes! Bepin Paul, indeed!" (মিঃ জাকেরিয়ার থরহরি কম্প লাগিয়ে দেবে।...বিপিন পাল—বটে!)

সকলের পরামর্শে তাহাই ঠিক হইল। একজন ইউরোপীয়ানকে খাওয়াইয়া যদি ইউরোপীয়ান যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় তো সেই ভাল; তাহা ভিন্ন গোড়া হইতে সব ইউরোপীয়ানদের ডাকিয়া একটা হল্লা করিয়া ফেলা সমীচীন নয়। এদিকে, ডিনারের সুবিধাও অনেক, সব মাথাকে একত্রিত করিতে হইলে সব রসনাকে লুব্ধ করার চেয়ে ভাল ফন্দি আর নাই।

শেঠজি বাঙালীর বাচ্ছা মৌলিক-রঞ্জনের চেয়ে হিসাব জিনিসটা ঢের বেশি বোঝে, ফাঁকা আওয়াজের ওপর সমস্ত ডিনারের খরচটা গছিয়া লইবার পাত্রই নয়, তবুও একটা মোটা চাঁদা দিল, বাকি টাকাটা নিজেদের মধ্যেই তুলিতে হইল; বৈঠকখানা রোডের যে ভদ্রলোকটি মৌলিকের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহারও কিছু খসিল।

ম্যাকার্থির ভারটা মৌলিক নিজে লইল এবং শ্বশুরের একটা চিঠি লইয়া গিয়া একদিন বাসায় দেখা করিল। লোকটা বুড়ো ঘাঘী, তেত্রিশ বৎসর যাবৎ কত বিচিত্র ঘটনা সংঘাতের মধ্য দিয়া অটুট একাগ্রতার সঙ্গে এদেশের মাটির রস শোষণ করিয়া আসিয়াছে। অনেক অভিজ্ঞতা।··· খুব সহানুভূতি দেখাইল। বলিল, "ইয়ং ম্যান্, তোমাদের মধ্যে এরকম civic sense (নাগরিক মনোবৃত্তি) দেখে আমি আবার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশান্বিত হচ্ছি। আমার সাহায্যের ওপর তোমরা পূর্ণভাবেই নির্ভর করতে পার; ইউরোপীয়ান গ্রূপ্ যে শেষ বেথা পর্যন্ত লড়বে এ একরকম আমি কথাই দিচ্ছি তোমায়—তাদের না জিগেস করেই।····ল্যান্স্‌ডাউন্ ডিনারে অধ্যক্ষতা করতে বলবার জন্যে ধন্যবাদ;—আর কে কে আসবেন?"

মৌলিক নাম করিতে লাগিল। গোটা চার পাঁচ শুনিয়া সাহেব বলিল, "না, কোন ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক আছেন কিনা?"

মৌলিক একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, "না, তাঁদের যোগ্যতম প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকেই ডেকেছি আমরা। প্রথম বারেই সবাইকে ডেকে একটা তুলকালাম করা সবার মত হল না।"

সাহেবের মুখটায় একটু ছায়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল;—মৌলিক বোধ হয় লক্ষ্য করিবারও সময় পাইল না। বলিল, "বেশ, তা আমি নিশ্চয় যাব, আর আমার, সহানুভূতির কথা বললামই—একচুলও নড়চড় হবে না····ধন্যবাদ মিস্টার মোলেক্, রাইট্ ইও; তোমার শ্বশুরকে আমার অভিবাদন জানিও।"

ঘরের বাহির পর্যন্ত আসিয়া উষ্ণ করমর্দনের সঙ্গে বিদায় দিল।

মৌলিক আসিয়া বলিল, "কেল্লা ফতে !

ডিনার হইল মৌলিকের বাড়িতে। একটু খুঁৎ থাকিয়া গেল ম্যাকার্থি সাহেব আসিতে পারিল না, একটা চিঠি লিখিয়া জানাইল, সে হঠাৎ একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করিতে হইবে।

ডিনার কিন্তু নিতান্ত অসফল হইল না। খুব চোখা চোখা স্পীচ্ হইল। ম্যাকার্থি থাকিলে বোধ হয় একজন সাহেবের সামনেই যাহারা তাহার মাতৃভাষার কোর্বানি করিতে কুণ্ঠিত হইত তাহারা পর্য্যন্ত প্রাণ খুলিয়া বক্তৃতা করিল। ঠিক হইল রাস্তা তো বিপিন পালের নাম দিয়া কলুষিত করিতে দেওয়া হইবেই না ; অধিকন্তু আসেপাশে ল্যান্স্ডাউন রোডের সংলগ্ন কোণ-কাণ যেখানে যা আছে সমস্তগুলাকে যোগ্যতা অনুযায়ী ল্যান্স্ডাউন স্পার (Lansdowne Spur), ল্যান্স্ডাউন ক্রেসেণ্ট (Lausdowne Crescent), ল্যান্স্ডাউন কর্নার (Lansdowne Corner) প্রভৃতি উপযুক্ত নাম দিয়া আভিজাত্য-গৌরব-মণ্ডিত করিতে হইবে। কংগ্রেসী কর্পোরেশন উত্তর কলিকাতা তাহাদের ঘোষ-বোস-মিত্তির-পালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলুক, পূর্বে দক্ষিণেও তাহাদের ঔদ্ধত্য চরিতার্থ করিবার অনন্ত পথ খোলা আছে ; কিন্তু তাহারা যদি ল্যান্স্ডাউন রোডের পবিত্র গণ্ডির মধ্যে পা বাড়াইতে যায় তো তাহাদের অপরিণাম-দর্শিতার জন্য পরিতাপের আর অন্ত থাকিবে না। বুঝিয়া-সুঝিয়া, ভাবিয়া-চিন্তিয়া অগ্রসর হোক !....ইউরোপীয়ান গ্রুপের সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য ম্যাকার্থিকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ার জন্য সকলেই বিশেষ দুঃখিত। স্থির হইল এই দুঃখের কথা এবং সমবেত মণ্ডলীর আন্তরিক ধন্যবাদ মিষ্টার মৌলিক গিয়া স্বয়ং

ম্যাকার্থি সাহেবকে জানাইবেন এবং এও বলিবেন তিনি শারীরিক অনুপস্থিত থাকিলেও তাঁহার আশাময়ী বাণী ল্যান্স্‌ডাউন ডিনারের সাফল্যে পূর্ণভাবেই সাহায্য করিয়াছে।

পরদিন সকালেই মৌলিক হাজিরা দিল। সাহেব বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিল,—একেবারে শেষ মুহূর্তে তাহার শরীরটা একটু অসুস্থ হইয়া পড়িল।....কিন্তু মিষ্টার মোলেক এবং বিপিন পাল-বিরোধী মহোদয়েরা যেন জানেন ইউরোপীয়ান গ্রুপের সাহায্য সম্বন্ধে তিনি যে কথা দিয়াছেন তাহার নড়চড় হইবে না। একটু সুযোগও সামনে আছে,—সামনের শনিবারে পেলিটিতে তাহাদের ডাণ্ডী ডিনার (Dundee Dinner); কর্পোরেশনের ইউরোপীয়ান কাউন্‌সিলারদের অনেকেই উপস্থিত থাকিবেন—কথাটা সেইখানেই পাড়িবে।

কাঁচ-পোকার কবলে পড়িয়া আরশোলা কাঁচ-পোকা হইয়া যায়।—ইচ্ছায় হয়, কি অনিচ্ছায় হয় জানি না, তবে নাকি হয়। মানব সমাজের একপ্রান্তে অনুরূপ একটা ঘটনা ঘটে। সাহেবের সংসর্গে আসিলে বাঙালী সাহেব হইয়া যায়,—ঠিক হইয়া যায় বলিতে পারি না, তবে ভাবে—হইয়া গিয়াছি। সাহেব কাঁচ-পোকাকে আয়াস করিতে হয় না,—দুবার একটু দেখা করা, দুটা মিষ্ট কথা—বারদুয়েক করমর্দন—এইতেই রূপান্তরের পালা আরম্ভ হইয়া যায়।....

পেলিটিতে 'ডাণ্ডী ডিনার!'—কী সম্মোহন শব্দটার মধ্যে!....মৌলিক একটু মাথাটা নীচু করিল, তাহার পর অন্তরের লালসা চাপিতে না পারিয়া মুখটা তুলিয়া একটু অপ্রতিভ-ভাবে বলিয়া ফেলিল, "সেখানে—ইয়ে—আমার নিজের তাঁদের অনুরোধ করবার সুবিধা হ'তে পারে না, স্যার?"....

ম্যাকার্থির মুখে ছায়াটা যেন এবার একটু গাঢ় হইয়া পড়িল, কিন্তু

তখনই সামলাইয়া লইয়া উৎসাহের সহিত বলিল, "Oh yes! To be sure, Mr. Molek, you *will* have a card; in fact, we would feel honoured." (হ্যাঁ, নিশ্চয় তুমিও একটি নিমন্ত্রণ-পত্র পাবে; আসলে তুমি উপস্থিত হ'লে আমরা গৌরবান্বিতই হব।)

আবার ঘরের বাহির পর্য্যন্ত আসিয়া করমর্দন করিয়া বিদায় দিল।

শনিবার রাত্রি। ডিনার হলের দরজার সামনে নিখুঁত ডিনার-স্যুট-পরা একটি বাঙালী যুবক উপস্থিত হইল। বেয়ারা আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া একটু বিস্মিতভাবে সেলাম করিয়া বলিল, "সাহেব লোগকা ডিনার্ হ্যায় হুজুর।" যুবক পকেট হইতে কার্ড বাহির করিয়া হাতে দিল। বেয়ারা আর একটা সেলাম করিয়া বলিল, "তব্ ভি, সাহেব নেহি হোনেছে মানা হ্যায় হুজুর।"

মৌলিকের ভ্রূজোড়া অধৈর্য্যতায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কয়েক জায়গায় ট্র্যাফিক্ পুলিসের হাতে অতিরিক্ত রকম বাধা পাইয়া তাহার দেরি হইয়া গিয়াছিল। একটু চিন্তা করিল, পকেট হইতে একটা পাঁচটাকার নোট বেয়ারার হাতে দিয়া বলিল, "কার্ডঠো ম্যাকার্থি সাহেবকো দেও। হাম ইঁহা ঠাড়া হ্যায়।"

ম্যাকার্থির চোখে, গালে তখন রং ধরিতে সুরু হইয়াছে। কার্ডটা হাতে লইয়া একবার দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ইংরাজী—অথবা খাঁটি স্কচ ভাষায় কি একটা বলিল, তাহার পর বেয়ারার দিকে চাহিয়া হিন্দিতেই বলিল "বেঙ্গলী বাবুকো বোলো—খালি হিণ্ডুস্টানীকা ডিনারমে অস্‌লি সাহেব লোগ নেহি যাটা, ইসিবাষ্টে হামারা বেমারি হুয়াঠা; অওর অসলি সাহেব লোগকা ডিনারমে হিণ্ডুস্টানী নেহি আ সাকৃটা—বাবুকা ভি বিমারি কা চিটৃঠি আনা চাহটা-ঠা। যাও।" (বাঙালী বাবুকে বল যে খাঁটি হিন্দু-

স্থানীদের ভোজে সাহেবরা যেতে পারে না, সেই জন্যেই আমার অসুখ



ইউ! সুনো,—বাবুকো বোলো!

হ'য়েছিল, তেমনি খাঁটি সাহেবদের ভোজেও হিন্দুস্থানীদের প্রবেশ নিষেধ, বাবুরও অসুখের চিঠি আসা উচিত ছিল)।

আবার ঘুরিয়া ডাকিয়া বলিল, "ইউ! সুনো,—বাবুকো বোলো—

সাহেবলোগ্‌ হেল্‌প্‌ করেগা, মডট্‌ করেগা, ইস বাস্টে কে অস্‌লি সাহেব ল্যান্স্‌ডাউনকে সাঠ কোই কালা আডমিকা নাম নেহি মিল্‌সাক্‌টা। যাও,—গেট্‌ এওয়ে!" (শোন, বাবুকে বল যে সাহেবেরা সাহায্য করবে,—এই জন্যে যে খাঁটি সাহেব—ল্যান্স্‌ডাউনের নামের সঙ্গে কোন 'কালা-আদমি'র নাম মিশতে পারে না। যাও!)

আবার একটা খাঁটি স্কচ্‌ গালাগাল দাঁতে পিষিয়া, ঘুরিয়া ডিনারে প্রবৃত্ত হইল।

স্বয়ংবর

[১]

শিবপুরের স্টীমার-ঘাট। জেটির কাছে ঘাসের উপর সব বসিয়া আছে,—গন্‌শা, ঘোঁৎনা, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর রাজেন। ত্রিলোচন উপস্থিত নাই, শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে।

ছয়টা বাহান্নর স্টীমার আসিয়া লাগিল। আর সব প্যাসেঞ্জার বাহির হইয়া গেলে ছোটখাট একটি পশ্চিমা বরযাত্রীর দল নামিল, বোধ হয় তক্তাঘাট হইতে আসিয়াছে। বরের কানে দুইটা বড বড় কুণ্ডল, গায়ে ফিনফিনে সবুজ সিল্কের পাঞ্জাবি, গলায় আরও মিহি জাপানী সিল্কের গোলাপী রঙের চাদর। মাথায় প্রচুর তেল এবং চোখে প্রচুর কাজল। জেটি হইতে বাহির হইয়া বোধ হয় নিজের বিশিষ্টতাকে আরও ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সে চোখে কেমিকেলের ফ্রেমের একটা নীল চশমা আঁটিয়া একটা হাওয়াগাড়ি সিগারেট ধরাইল।

স্টীমার ছাড়িয়া গেলে গনশারা সব আসিয়া জেটির রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ চুপচাপের পর রাজেন বলিল, "এদের খুব ছেলে-বেলায়ই দিব্যি বিয়ে হয়ে যায়, নিশ্চিন্দি।"

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে ঘোঁৎনা জিজ্ঞাসা করিল, "গণৎকারের কাছে তো গেছ্‌লি গন্‌শা; কি বললে র‍্যা?"

গন্‌শার মুখটা একটু কুঞ্চিত হইল মাত্র, কোন উত্তর না দিয়া ঘুরে হাওড়ার পুলের দিকে চাহিয়া রহিল। গোরাচাঁদ বলিল, "আম্মো তো সঙ্গে ছেলাম। বললে, বউ তো ওদিকে ডাগোরডোগোরটি হয়ে তোয়ের রয়েছে, কিন্তু গন্‌শার আজন্মের একটা দোষ আছে, সেটা না খণ্ডালে

তো বিয়ে হতে পারে না। তাতে কম করে সারতে গেলেও সওয়া পাঁচ টাকা লাগবে।....না গেলেই ছেল ভাল,—ওর মামা অত টাকা বের করবে না, মাঝে পড়ে বউ কোথায় ডাগর হয়ে উঠছে শুনে ভাবনায় ও বেচারীর মনটা...."

রাজেন বলিল, "যা যাঃ, ওসব ধাপ্পাবাজি, বিশ্বাস করি না।"

গন্‌শা হাওড়ার পুল হইতে দৃষ্টি সরাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিল, "তু-তুই কি বলতে চাস এখনও হা-হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে ?....

রাজেন বলিল, "না তোর বউয়ের কথা বলছি না, সে তো ডাগরটি হবেই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে। বলছি এই গণৎকারদের কথা—তুই বিশ্বাস করিস ? এই দোষ খণ্ডানোর কথা ?"

গন্‌শা কোন উত্তর দিল না। ঘোঁৎনা বলিল, "বিশ্বাস না করে কি করবে ? শানাপাড়ায় 'কায়েৎ মহারাজ' বলে এক সাধু এসেছেন। বলছেন নাকি এতদিন আত্মবিস্মৃত হয়ে ছিলেন, হঠাৎ যোগনিদ্রায় স্বপ্ন দেখেছেন তিনি আসলে চিত্রগুপ্তের নাতজামাই। মন বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে। শীগ্‌গিরই দেহত্যাগ করবেন। সেখানে গিয়ে চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে দেবেন বলে, যে-সব পুরোনো পাপী হাতে পায়ে ধরেছে তাদের নামধাম একটা থেরোর খাতায় লিখে নিচ্ছেন; পনর টাকা ফী—বলেন, দাদাশ্বশুরের একটা মন্দিরের ব্যবস্থা করেই দেহ রাখবেন—উকিল, ব্যারিস্টার, এটর্নির ভিড় লেগে গেছে। বল,—তারা ঠকবার লোক !"

গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে আমিও কয়েক দিন গেছলাম—যা খেতে চাইবে মুঠো খুলে হাতে দিয়ে দিত। এখন শুনছি আর সময় পায় না। আর এখন গেলে কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করে লোকটাকে দেখে। ওর দাদাশ্বশুর যমের পাশেই বসে খাতা লেখে কিনা !"

গন্‌শা একটা বিড়ি ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিল। রাজেন বলিল, "সত্যিই যদি আর জন্মের কোন দোষে বিয়ে হচ্ছে না, তো কাটাবার কি আর উপায় নেই? তীর্থ-টীর্থ করা, গঙ্গাস্নান করা....আর বিড়ি সিগারেটগুলোও ছাড়্ গন্‌শা—নেশাও একটা পাপ তো?...."

কে. গুপ্ত বলিল, "গঙ্গাস্নানের তো একটা মস্তবড় যোগও আসছে—দশহরা...."

ঘোৎনা, ঠিক হয়েছে রে!"—বলিয়া এ-ধারের রেলিং থেকে ও-ধারের রেলিঙে গিয়া গন্‌শার মুখোমুখি হইয়া বলিল, "সেদিনকার গঙ্গার ঘাটের মেলার জন্যে বাজেশিবপুর থেকেও এবার ভলন্টিয়ার দল গড়ছে। চল্ না, গঙ্গাস্নানও হবে, লোকসেবাও হবে; যদি সত্যিই কিছু দোষটোষ থাকেই তো একসঙ্গে দুটো পুণ্যির ধাক্কায়...."

গোরাচাঁদ বলিল, "আর ওদের বেশ খ্যাটের বন্দোবস্তও আছে, শিবপুরের দলের সঙ্গে ওরা টেক্কা দিচ্ছে কি না...."

রাজেন বলিল, "তাহ'লে দেখ্ না গন্‌শা, ন্যায়রত্ন মশাই বলছিলেন—এর পরেই উপরো-উপরি তিনটে ভাল লগ্ন রয়েছে, যদি সত্যিই কেটে যায় দোষটা....অন্তত গণৎকারের কথাটা হাতে হাতে মিলিয়ে দেখবার মস্ত একটা সুবিধে।"

গন্‌শা বোধ হয় পুণ্য অর্জনের হাতে খড়ি হিসাবে অর্ধদগ্ধ বিড়িটা গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, "নে-নেবে ভলন্টিয়ার? যাই তো কিন্তু স-সবাই যাব।"

ঘোৎনা বলিল, "লুফে নেবে গণেশের দল শুনলে। শিবপুরের দলের এরাই তো কতবার বলেছে আমায়—ঘোঁতন, তোমাদের সবাই এস না; একটা সৎ কাজ।....তখন গা করি নি। অবিশ্যি এখন আর ওরা নিচ্ছে না, বন্ধ করে দিয়েছে।"

পরের দিন সকালে ছয় জনে স্বেচ্ছাসেবকদলে ভর্তি হইবার জন্য বাহির হইল। রাত্রে ত্রিলোচন আসিয়াছে। তাহার শ্বশুরবাড়ির গল্প শুনিতে শুনিতে সকলে চৌধুরী-পাড়ার রাস্তা ধরিয়া বাজেশিবপুরের দিকে অগ্রসর হইল এবং এ-গলি সে-গলি করিয়া একটা দোতলা বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রেলিং-দিয়া ঘেরা, সামনে ছটাকখানেক বাগান। ঘোংনা বলিল, "এই তো সতের নম্বর।"

গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়িটাই? লোকজন কাউকে তো দেখছি না!"

ঘোৎনা উত্তর করিল, "নম্বর তো সতের ঠিকই রয়েছে। আয় না দেখাই যাক।" বলিয়া ভেজানো ফটক ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ইতস্তত করিতে করিতে একে একে সবাই অনুসরণ করিল—শুধু গোরাচাঁদ সব পিছনে ফটকের একটা পাল্লা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাড়িটার গম্ভীর আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া সবাই একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

ত্রিলোচন বলিল, "একটা হাঁক দে না ঘোৎনা।"

ঘোৎনা তাহার দিকে ঘুরিয়া বলিল, "তুই দে না। ঘোৎনা পথ দেখিয়ে নিয়েও আসবে, ডেকেও দেবে, তারপর বলবি গাড়ি করে ফিরিয়ে নিয়ে চল্‌....আবদার!"

গন্‌শা চটিয়া উঠিয়া বলিল, "প-পথ দেখিয়ে কোন চুলোয় নিয়ে এলি আগে তাই বল্‌ তো? ভ-ভলণ্টিয়ার তো গিজ্‌ গিজ্‌ করছে দেখছি!"

এমন সময় উপরের বারান্দায় কালো মোটাগোছের একটি মাঝবয়সী লোক বাহির হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি চাই আপনাদের?"



কি চাই আপনাদের ?

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে একবার চাহিল। ঘোৎনা বলিল, "আজ্ঞে চাই না কিছু।"

"তবে ?"

"একবার নীচে আসবেন ?"

গোরাচাঁদ নিঃসাড়ে ফটকের বাহির হইয়া দাঁতে একটা ঘাস চিবাইতে চিবাইতে রাস্তায় পায়চারি করিতে লাগিল। উপর হইতে রুক্ষস্বরে উত্তর হইল, "কিছু চাই না, অথচ নীচে আসতে হবে—মানে ?"

রাজেন ঘোৎনাকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "গুছিয়ে বল্ না, চটিয়ে তুলছিস যে।"

নিজেই সামনে একটু আগাইয়া গিয়া বলিল, "আজ্ঞে নামতে হবে না আপনাকে কষ্ট করে,—বলছিলাম গঙ্গাস্নানের মেলা হবে, তাই ভলন্টিয়ার...."

আরও রুক্ষস্বর এবং বিকৃতভঙ্গিতে উত্তর হইল, "তাই আমায় ভলন্টিয়ারী করতে হবে....? তা রাজি আছি—বল তো নেমে একটু শক্তির পরিচয়ও দিই গিয়ে।"

গোরাচাঁদ বাড়ির সুমুখ হইতে সরিয়া গিয়া স্যাণ্ডাল জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া এবং মাথা নীচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে বুড়া আঙ্গুলের নখ খুঁটিতে লাগিল।

গন্‌শা ঘোৎনার পিছনে নিজের জায়গায় সরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, ইয়ে...ভ-ভলন্টিয়ার তো আমরা....দশহরার মেলায়....গঙ্গার ঘাটে...."

"বাড়িটাতে গঙ্গার ঘাট বলে ভুল করবার মত কিছু পাচ্ছ কি সব ?" গলা আরও কর্কশ হইয়া উঠিল, "ভজুয়া !....

রাজেন গন্‌শার জামার খুঁটে টান দিয়া নিম্নস্বরেই বলিল,

"চল্, বুঝতেই পারা যাচ্ছে এ বাড়ি নয়। সব কথার উল্টো মানে করছে...."

গোরাচাঁদের সহিত এদের দেখা হইল অনেকটা দূরে গলির একটা মোড়ের অন্তরালে। সে স্যাণ্ডালে পা সাঁদ করাইতে করাইতে একটু অপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল, "ভজুয়া বেটা বেরিয়েছিল নাকি?"

গন্‌শা ভেঙ্‌চাইয়া বলিল, "তুই আর কথা কস্ নি গোরে; ঘেন্না ধরালি! পা-প্লালালি কি বলে র‍্যা? এদিকে ভলন্টিয়ারি করবার শখও আছে!"

গোরাচাঁদ পূর্বে পূর্বে এর প্রতিবাদ করিত, আজকাল তাহার এ-দুর্বলতাটুকুর প্রমাণের সংখ্যা নিয়তই বৃদ্ধি পাওয়ায় চুপ করিয়া থাকে; সে দলের মাঝখানে একটি নির্বিঘ্ন জায়গা করিয়া লইয়া চলিতে লাগিল। সবাই মন-মরা হইয়া গিয়াছে; কিছুক্ষণ কেহ কোন কথাই কহিল না। শেষে ঘোৎনা নিতান্ত যেন মৌনতার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্যই বলিল "কেন যে এমনটা হ'ল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

কে. গুপ্ত বলিল, "আপনি বোধ হয় ঠিকানাটা ভুল শুনেছিলেন।"

ঘোৎনা বিরক্তির সহিত বলিল, "আপনি কি বলতে চান ওটা সতের নম্বর ছিল না? একের পিঠে সাত তাহলে কি হয় বলুন তো শুনি? তেষট্টি?"

কে. গুপ্ত একটু থতমত খাইয়া বলিল, "না সে কথা বলছি না, বলছি বোধ হয় অন্য কোন নম্বর বলেছিল।"

"অন্য নম্বর বললে আমি সতের বলতে যাব কেন মশাই? আমাকে বলেছিল ছিয়ানব্বই, আমি এসে বললাম সতের?....আপনাকে কেউ যদি বলে গন্‌শাকে একবার ডেকে দিন, আপনি ত্রিলোচনকে ধরে নিয়ে আসবেন?

কে. গুপ্তের প্রশ্নটা সকলেরই মনে জাগিয়াছিল; কিন্তু ঘোঁৎনার তর্কের ভাষা ও ভঙ্গি দেখিয়া কেহ আর উত্থাপন করিল না।

কে. গুপ্ত স্বভাবতই একটু মোটাবুদ্ধি, পেঁচালো তর্কের ধাঁধাঁয় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল এবং কি ভাবে তাহার মনের কথাটা গুছাইয়া বলা চলে ভাবিতে লাগিল।

ত্রিলোচন গন্‌শাকে বলিল, "তোর বোধ হয় বিয়ের ফুলটা এখনও ফোটে নি গনেশ, নইলে...."

গন্‌শার মনটা অত্যন্ত খিঁচড়াইয়া ছিল, উষ্মার সহিত বলিল, "ন-ন্নৈলে ঐ কেলে যমদূতটা ভলন্টিয়ারিতে নাম লিখে নিত? তোর বিয়ের ফুলই ফুটেছে তিলে, বু-ব্বুদ্ধির ফুল কিন্তু শুকিয়ে আসছে...."

কে. গুপ্ত একটু ভয়ে ভয়ে ঘোঁৎনাকে বলিল, "না আমি সে কথা বলছি না; বলছিলাম ধরুন, যাকে আপনি জিগ্যেস করেছিলেন সেও তো ভুল বলতে পারে...."

ঘোঁৎনা আবার একটু ধমকের সুরে বলিল, "পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আমি বেছে বেছে এমন লোককেই জিগ্যেস করতে যাব কেন শুনি? আর তার নিজেরই যদি সন্দেহ থাকবে তো বলতেই বা যাবে কেন মশাই?"

কে. গুপ্ত আবার চুপ করিয়া গেল এবং একটু পরে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ডগা দাঁতে চাপিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

গোরাচাঁদ বলিল, "তা হলে শুধু গঙ্গাস্নানই করে নে গন্‌শা। দশহরার দিন ভোর থেকে এসে সব গঙ্গায় পড়ে থাকা যাবে এখন। মা গঙ্গা যদি মুখ তুলে চান তো পুণ্যির একটু ব্যবস্থা করে দেবেন না?—দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেও একটা-আধটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে না?—অত বুড়ী-টুড়ী, কচি ছেলেমেয়ে সব আসবে। আমার হাতের কাছে যেটা পড়বে সেটা তোকেই দিয়ে দেব।"

রাজেন বলিল, "হ্যাঁ, সেবা করা নিয়ে বিষয়, ভলন্টিয়ার হয়েই যে সেবা করতে হবে শাস্ত্রে এমন কথা তো ধরে লিখে দেয় নি ?"

ত্রিলোচন বলিল, "স্ত্রী স্বামীর সেবা করে কি ক'রে ? সে তো আর ভলন্টিয়ার নয় ?"

গন্‌শার মাথায় মা-গঙ্গার মুখ তুলে চাওয়ার কথাটা ঘুরিতেছিল ; বিরক্তভাবে বলিল, "ধ্যাৎ, আর ঠা-ট্‌ঠাকুর দেবতার ওপর বিশ্বাস চলে যাচ্ছে। যদি দ-দ্দয়াই হবে তো আজ ছ-বছর থেকে ভোগা দিচ্ছে কেন ?"

গোরাচাঁদ পাঞ্জাবির পকেটে দুইটি হাত সাঁদ করাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কে. গুপ্ত বলিয়া উঠিল, "নিন ঘোঁতন বাবু, এবার কি বলবেন বলুন !"

আর সবার কাছে একটু অপ্রতিভ হইয়া ঘোৎনা কে. গুপ্তকে মাঝে মাঝে থাবা দিয়া একটা তৃপ্তি এবং সান্ত্বনা পাইতেছিল, বলিল, কি শুনতে চান বলুন।"

"আপনি বাড়িটা রাধানাথ মিত্তিরের গলিতে বলেছিলেন না ?"

"এখনও তো বলছি মশাই, কারুর ভয় না কি ?"

"ঐ দেখুন।"

কয়েক পা সামনে গলির মোড় ফিরিয়াছে, আর সেই মোড়ে অন্য দিক দিয়া একটা সরু গলি বাহির হইয়াছে। সেই মোড়ে একটা জরা-জীর্ণ কাঠের ফলকে গলিটার নাম লেখা রহিয়াছে। পাশের দেওয়ালের পিছন থেকে একটা পেঁপের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ফলকটা ভাল করিয়া দেখা যায় না ; ক্রমাগত ঠকিয়া কে. গুপ্তের নজর ঐদিকে ছিল বলিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে—সকলে পড়িল, 'রাধানাথ ঘোষ লেন।'

সকলে একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘোঁৎনার মনে

হইতেছিল কে. গুপ্তকে চিবাইয়া খায়। নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিল, "তাই তো দেখছি, একটু যেন ভুল হয়ে গেছে।"

গন্‌শা অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল। মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "তুই কি ভেবেছিলি যখন ঘোষ-মিত্তির দুই-ই কু-কুলীন কায়েৎ, তখন গলিতেও বেশি তফাৎ হবে না?"

দলের মধ্যে এক ঘোঁৎনাই গন্‌শাকে সব সময় খাতির করে না, রাগিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল এমন সময় ত্রিলোচন দু-জনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিল, "শুভ কাজে নেমে তোরা ঝগড়া করতে লাগলি। আমার একটা মতলব এসেছে—থাম্ দিকিন্ তোরা।"

সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, "এই কইপুকুরের কাছাকাছি ন্যায়রত্ন মশায় থাকেন। তাঁকে খুঁজে বের করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—পুরুতমানুষ, শিবপুর-বাজেশিবপুরের অলিগলি নখদর্পণে।"

গোরাচাঁদ একটু উৎসাহিত হইল, বোধ হয় পুরোহিতবাড়ির সন্দেশ, কলা, নারিকেল-নাড়ুর কথা মনে পড়িল। বলিল, "মন্দ নয়, জলতেষ্টাও পেয়েছে বেজায়।"

রাজেন বলিল, "তাহ'লে সামনে কেমন দিন-টিন আছে, সেটাও একবার দেখিয়ে নেওয়া যায়।"

গন্‌শার মেজাজটা ঠিক হয় নাই। রুক্ষস্বরে বলিল, "খুব মতলব খাড়া করেছিস্—সতের নম্বর বাড়ির জন্যে ন্যায়রত্ন মশায়ের বাড়ী খোঁজ, ন্যায়রত্ন মশায়ের বাড়ী খোঁজবার জন্যে শিষ্যিদের বাড়ি খোঁজ, তা-তাদের বাড়ি খোঁজবার জন্যে...."

এমন সময় রাজেন, ত্রিলোচন, কে. গুপ্ত তিন জনে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওই ন্যায়রত্ন মশাই আসছেন!—নাম করতেই!"

সত্যই দেখা গেল, তালতলার চটি পায়ে নামাবলী গায়ে ন্যায়রত্ন মহাশয় সামনের একটা বাড়ির বারান্দা হইতে নামিতেছেন। সবাই যেন হাতে স্বর্গ পাইল, অবশ্য এক গোরাচাঁদ ভিন্ন। ঘোঁৎনা অগ্রসর হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কানের উপযোগী আওয়াজ করিয়া বলিল, "প্রণাম হই ন্যায়রত্ন মশাই।"

সবাই ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ডান কানটা আগাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি বলছ?

ঘোঁৎনা বলিল, "প্রণাম।"

আরও কাছে কানটা আনিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, "ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, কাল উপবাস ছিল কিনা, কাহিল হয়ে রয়েছি বলে কানটা একটু...."

গন্‌শা বলিল, "ক-কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্‌না বাপু।....'কাহিল হয়ে রয়েছি!'.... কবে যে কা-কাহিল কম তা তো বুঝি না!"

রাজেন বলিল, "পেন্নামের হাঙ্গামা তুলে দিয়ে কাজের কথাটাই পাড় না একেবারে—তোরও যেমন ভক্তির রোখ চেপে গেছে!"

গোরাচাঁদ বলিল, "তার চেয়ে ওঁর বাড়িই নিয়ে চল ওঁকে; মাঝ্‌রাস্তায় চেঁচামেচি করার চেয়ে বরং....একে তো এমনিই গলা শুকিয়ে কাঠ...."

ঘোঁৎনা কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিল, "এই প্রণাম করছি।"

"দীর্ঘজীবী হও, রাজরাজেশ্বর হও, তা কোথায় এসেছ তোমরা? রোদে ঘুরে ঘুরে মুখ যে রাঙা হয়ে গেছে!....গণেশ....?"



রাধানাথ মিত্তিরের গলি জানেন.

গন্‌শা বাজে কথার দিকে গেল না, চেঁচাইয়া বলিল, "রাধানাথ মিত্তিরের গলি জানেন? ঘোঁৎনা বে-ব্বেশি ওস্তাদি করতে গিয়ে রাধানাথ ঘোষের গলিতে এনে চ-চ্চরকি ঘোরাচ্ছে।"

ঘোঁৎনা বিরক্ত ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় হাসিয়া রাজেনের দিকে চাহিলেন। সে আরও চেঁচাইয়া বলিল, "জিগ্যেস করছে—রাধানাথ মিত্তিরের গলি চেনেন?"

"খুব চিনতুম, সে তো মারা গেছে।"

রাজেন নিরাশ ভাবে একটু এলাইয়া পড়িয়া বলিল, "এ এক দোসরা ফ্যাসাদে পড়া গেল। 'রাধানাথের গলি চেনেন?'—না, সে তো মারা গেছে।"

এমন অবস্থায় ন্যায়রত্ন মহাশয় কখন কখন চটিয়াও যান আবার।

সেই দিকটা সামলাইয়া ত্রিলোচন বলিল, "মারা গেছেন শুনে বড় কষ্ট হ'ল। তাঁর গলিটা চেনেন?" রাস্তাটার উপর ইসারায় হাতটা চালাইয়া বলিল, "গলি—গলি।"

"ও বুঝেছি, সে তো এখানে নয়। আমার সঙ্গে এস; ওই দিক হয়েই না-হয় চৌধুরীদের বাড়ি চলে যাব। তাক চৌধুরীর খুড়োর বড কঠিন পীড়া শুনছি, চান্দ্রায়ণ করবার জন্যে একবার বলে দেখি।....এই তো গোরাচাঁদ, তোমাদেরই তো পাড়ার; কেমন আছে বলতে পার যদুনাথের পরিবার? আহা, যদু চৌধুরী ছিল...."

গোরাচাঁদের মুখটা যেন শুকাইয়া গেল, সহজ ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, তিনি তো দিব্যি সেরে উঠেছেন। কাল গেছলাম—ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে কত জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আপনি কষ্ট করে আর যাবেন না; বুড়োমানুষ,—এই কাঠফাটা রোদ্দুর। আমাদের গলিটা দেখিয়ে ফিরে আসুন।"

পিছনে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত চটিয়া হাত-পা নাড়িয়া গন্‌শাকে বলিল, "দেখতো বে-আক্কেলপনা!—সে ধুঁকছে—এখন-তখন—সঙ্গে কেত্তন-পার্টি বেরুবে সব ঠিকঠাক্ করছি—কদ্দিনকার আশা—ওর মাঝে পড়ে আবার তাকে চান্দ্রায়ণ করে চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা! এ কি শত্রুতা বল্ দিকিন!....এর ওপরও যদি যেতে চায় তো বলব পাঁচটা সায়েব ডাক্তারে ঘিরে আছে, তাদের কুকুর নিয়ে—বাজে লোককে ভিড়তে দিচ্ছে না—বিশেষ করে পুরুতদের।....কদ্দিন পরে একটা চান্স্! —শুনছি নাকি আবার বৃষোৎসর্গ করবে।"

গনশা ব্যঙ্গ-হাসিতে ঠোঁট দুইটা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুই বোকা, বুঝিস না। ও চা-চ্চান্দ্রায়ণ করলে আরও শীগ্‌গির টেঁসে যাবে বরং। একে বদ্ধ কালা হয়ে গেছে, তায় আবার ভয়ংকর ভুলো মন, একটা বিভ্রিটিভ্রি হবেই, ভ-ভ্ ভগবান্ না করুন।"

গোরাচাঁদের মুখটা আবার পরিষ্কার হইল। তবুও একটু সন্দিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, "যাঃ, ঠাট্টা করছিস্! ওদিকে একজন মরতে বসেছে আর গন্‌শার যেন স্ফূর্তি বেড়ে গেছে! যাঃ...."

গন্‌শা ভারিক্কে হইয়া বলিল, "গ-গ্‌গন্‌শা সব কথা নিয়ে ঠাট্টা করে না।"

রাস্তার ডানদিকে একটা গলি আরম্ভ হইয়াছে, ন্যায়রত্ন মহাশয় দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, "এই রাধু মিত্তিরের গলি, আমি তা হ'লে চললাম। তাহ'লে যদুনাথের পরিবার ভালই আছে বলছ গোঁরাচাঁদ? শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আজ আর হ'ল না, অপর একদিন দেখে আসব'খন।"

গন্‌শার অভিমত শুনিয়া গোরাচাঁদের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। সে চিন্তিতভাবে নিজের দলের সঙ্গে খানিকটা অগ্রসর হইল, তাহার পর

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া দাঁতে বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটিল এবং আর দ্বিধা না-করিয়া ফিরিয়া দ্রুতপদে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাশে গিয়া বলিল, "একটা কথা ভুলে যাচ্ছিলাম ন্যায়রত্ন মশাই, দরকারী কথা—ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল! ওই যে বললাম কিনা—যদু চৌধুরীর স্ত্রী—চৌধুরী-জেঠাইমা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে কত কথা জিগ্যেস করলেন?—সে সময় একটা কথা বলে দিয়েছিলেন—মাথার দিব্যি দিয়ে—বললেন, গোরে, বাবা, ওদিকে যখন যাবি একবার ন্যায়রত্ন ঠাকুরকে ডেকে দিস্; সেরে তো উঠলাম, কিন্তু কবে আছি কবে নাই—তাঁর দয়ার শরীর; একবারটি বললেই আসবেন। কুলের পুরুত, দেবতার সমান কিনা।....তাহ'লে না-হয় এখুনি হয়ে আসবেন একবার—ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে?"

[৪]

গঙ্গা, দশহরা। এবার যোগটা বিশেষ বড় গোছের; অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে। একে ভিড় তায় ছোট বড় অনেকগুলি ভলন্টিয়ারের দল; রেষারেষির ঝোঁকে তাহারা প্রায় বাড়ি হইতেই সেবার জন্য পিছনে লাগিয়াছে। সমস্ত যাত্রীর—বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের এবং তাহার মধ্যেও আবার আরও বিশেষ করিয়া বৃদ্ধাদের-মনটা প্রায়ই বড় খিঁচড়াইয়া রহিয়াছে।

ভলন্টিয়ারদের সকলেরই চেষ্টা অণুমাত্র ত্রুটি হইতে দিবে না। ঘাটের কাছে বাঁশ দিয়া মেয়ে-পুরুষের রাস্তা আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে প্রবেশপথের মুখে, বাছাইয়ের জন্য ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। এসব মেলায় একটু ষাঁড়-গরুর আমদানি হয়। অন্যান্য বার তাহাদের অগ্রাহ্য করা হইত, এবার তাহাদের গতিবিধিতেও

ভেদাভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করায় গোলমাল বাড়িয়াছে। একটা ষাঁড় মেয়েদের নির্দিষ্ট পথে কোন দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছিল।



জানাইয়া গেল—সে সত্যই গরু নয়

সে গাই নয় বলিয়া তাহাকে বাহির করিতে সবাই লাগিয়া যায়। সেও বাঁশের বেড়া ভাঙিয়া, যাত্রী-ভলন্টিয়ার মর্দিত করিয়া জানাইয়া গেল—সে সত্যই গরু নয়।

লোকে—বিশেষ করিয়া বৃদ্ধারা—স্নান করিয়া যেটুকু পুণ্য অর্জন করিতেছে. সেটুকু অভিশাপে সভ্য সভ্য ব্যয়িত কবিয়া বাড়ি ফিরিতেছে।

বাজেশিবপুরের দল তেমন জমে নাই—তেমন কেন, মোটেই জমে নাই বলা চলে! ওরা শিবপুরের সঙ্গে টেক্কা দিয়া কেতাদুরস্তভাবে গঠনকার্য করিতে চাহিয়াছিল। সকাল বিকাল মিলাইয়া ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা ড্রিল, তার পর সামনের ধোপাপুকুরে সাঁতাব। যাহাবা সাঁতার জানিত, তাহাদের অনেকের সর্দিগর্মি হওয়ায় ছাড়িয়া দেয়। যাহাদের হাতেখড়ি হইতেছিল তাহাদেরও বেশির ভাগ সাজিমাটিগোলা পানাপুকুরের জল উদরস্থ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। এখন কয়েকজন ব্যাজ লাগাইয়া মনমরা হইয়া কাশিতে কাশিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শত্রুপক্ষের ভলণ্টিয়াররা রটাইতেছে, "কাশি-ই ওদের ব্যাজ!"

গন্‌শা প্রভৃতি পুণ্যার্জনের পূবে প্রায়শ্চিত্তের বহর দেখিয়া ছাড়িবে ছাড়িবে করিতেছিল, এমন সময় খবর পাইল সমস্ত ভলণ্টিয়ারের মধ্যে সাহস এবং কার্যকুশলতার জন্য কয়েকটি স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে বলিয়া কে একজন নাম গোপন করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

রাজেন কবি, বলিল, "মেডেল পেলে আবার অনেক সময় প্রেমও হয়ে যায় গন্‌শা; ধর্, কোন বডলোকের মেয়ে যদি ভালবেসে ফেললে, তখন তোর মামাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারবি।"

মেডেলের লোভেও, আবার অন্য কোন কাজের অভাবেও ওটা আর ছাড়া হয় না।

গন্‌শা, ঘোৎনা আর রাজেন জেটির উপর দাঁড়াইয়া আছে। উপকারের সুবিধাও হইতেছে না এবং কি ভাবে করিতে হয় জানাও নাই। মোটামুটি একটা ধারণা ছিল এমন বড় বড় যোগে লোকে খুব ডুবিয়া মরে; কিন্তু যাহাকেই ডুব দিতে দেখিতেছে তাহারই মাথা

আবার জল ফুঁড়িয়া উঠিতে দেখিয়া বেজায় নিরাশ হইয়া পড়িতেছে। শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াইয়াছে যে পুণ্য অর্জনে হতাশ হইয়া মনে হইতেছে এক-একটা মাথা জলে টিপিয়া ধরিতে পারিলে গায়ের জ্বালা মেটে। দু-বার আক্রোশের দাঁত কড়মড়ানি শোনা গেল; কার ঠিক ধরা গেল না—সম্ভবত গন্‌শা কিংবা ঘেঁাৎনার।

গোরাচাঁদ, কে. গুপ্ত এবং ত্রিলোচন এখানে নাই; তাহারা তিন জনে দুর্ঘটনার প্রত্যাশায় ভিড়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোন দুর্ঘটনাই তাহাদের হাতে ধরা পড়িতেছে না। অথচ দুর্ঘটনার যে নিতান্ত দুর্ভিক্ষ পড়িয়াছে এমন নয়। একটি বৃদ্ধা কি রকম ভাবে হঠাৎ উঁচুনীচুতে পা মচকাইয়া বেসামাল হইয়া পড়িয়া যায়; প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল, শিবপুরের দল সন্ধান পাইয়া এম্বুলেন্স্ খাটে করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল; একটা গুণ্ডা একটি ছোট মেয়ের কানের দুল ছিঁড়িয়া লইয়া পলাইতেছিল, শিবপুরের ব্যাজপরা একটি ভলন্টিয়ার তাহাকে ধরিল; এমন কি একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতে করিতে মৃগী-রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় পাবাড় হইবার দাখিল হইয়াছিল, যেন পাতাল ফুঁড়িয়া কোথা হইতে শিবপুরের একটি ভলন্টিয়ার তাহাকে বাঁচাইল এবং বেশ ঘটা করিয়াই তাহাকে ক্যাম্পে লইয়া গেল।

গোরাচাঁদ বলিল, "এরা বেশ কপাল করে নেমেছে, টপাটপ কেমন পেয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের পোড়া অদিষ্টে...."

ত্রিলোচন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "গন্‌শাটার জন্যেই কষ্ট হচ্ছে। নিজে না পা'ক, যদি আমরাও একটা হাতে তুলে দিতে পারতাম, তবুও ষোল আনা না-হোক কতকটা পুণ্যি হ'ল মনে ক'রে বুক বাঁধতে পারত। এ যেন দেখছি একেবারে মুষড়ে পড়বে বেচারা।"

গোরাচাঁদও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে যাইতেছিল, মাঝপথে থামিয়া

সম্মুখে এক স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল এবং ত্রিলোচনের কাঁধে হাত দিয়া উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "তিলে, দেখেছিস ?"

ত্রিলোচন গলাটা উঁচু করিয়া সামনে দেখিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, "কি র‍্যা ?

"ওই যে মেয়েটা....?"

"হুঁ, তা কি ?

"ইডিয়ট্—দেখতে পাচ্ছিস না ?—নিশ্চয় কোন অ্যাক্সিডেণ্ট্ হয়েছে. না হ'লে ওরকম ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চারি দিকে চাইবে কেন ?"

"তাহ'লে নিয়ে আসব গন্শাদের ডেকে ?"

"হ্যাঁ, এমন না হ'লে আর বুদ্ধি! আমরা ডাকতে যাই আর সেই তালে শিবপুর এসে কেল্লা ফতে করে নিক্। ওকে হাত করে বরঞ্চ গন্শার কাছে নিয়ে যাওয়া যাক্!"

গোরাচাঁদ পা বাড়াইল, ত্রিলোচনও অগ্রসর হইল এবং শ্যেনদৃষ্টি শিবপুরের দলের ভয়ে, কাহারও ঘাড়ের উপর দিয়া, কাহারও কাঁকালের নীচে দিয়া, ঠেলিয়া, মাড়াইয়া দুইজনে লক্ষ্যস্থলে এক রকম ছুটিয়াই চলিল—কেহ গাল দিল, কেহ বা রাগের চোটে গালাগাল খুঁজিয়া না পাইয়া উগ্র বিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,—দু-জনের মধ্যে কেহই সেদিকে দৃক্‌পাত করিল না।

একটি ফুটফুটে বছর পাঁচেকের মেয়ে জল থেকে খানিকটা দূরে ইটের গাঁথুনি যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে একটা শুকনা কাপড়, নামাবলী আর ঘটি কোলের কাছে করিয়া বসিয়াছিল। গোরাচাঁদ উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে তোমার, খুকী?"

মেয়েটি ভ্যাবাচাকা খাইয়া দু-জনের মুখের দিকে চাহিল।

গোরাচাঁদ বলিল, "বল কি হয়েছে তোমার, কিছু ভয় নেই।"

একটি পশ্চিমা স্ত্রীলোক স্নান সারিয়া মাথা ঝাড়িতেছিল, তাহার পাশ দিয়া সামনে আসিয়া ত্রিলোচন বলিল, "ভয় কি? আমরা ভলণ্টিয়ার, এই দেখ।" বলিয়া বুকে পিন্‌-আঁটা রেশমের ফুলটা দেখাইয়া দিল।

মেয়েটি শুক্‌না মুখে ব্যাজটার দিকে চাহিয়া রহিল।

গোরাচাঁদ বলিল, "তুমি কার সঙ্গে এসেছিলে বল তো খুকুমণি?"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "মার সঙ্গে?....বাবার সঙ্গে?....ঠাকুরমার সঙ্গে?"

মেয়েটি মুখ চুন করিয়া একটু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না, দিদিমার সঙ্গে।"

মেলার ব্যাপার, ততক্ষণে ছেলেয়, মেয়েয়, বুড়োয় অনেকগুলি লোক ইহাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। একজন প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে মেয়েটির?"

গোরাচাঁদ বলিল, "ওর দিদিমার সঙ্গে এসেছিল, সে ডুবে গেছে।.... তুমি কেঁদ না খুকু। আমরা তোমায় তোমার মার কাছে রেখে আসব।"

কে. গুপ্ত সান্ত্বনা দিবার জন্য বুদ্ধি করিয়া বলিল, "আর দিদিমা তো বুড়োও হয়ে গিয়েছিল খুকুমণি...."

একটি নিম্নশ্রেণীর লোক উৎসুকভাবে শুনিতেছিল; বলিল, "সে কথা কইলে কি ছেলেমানুষ শোনে বাবু?—তা ছাড়া দিদিমা আর কার লবযুবতী হয়ে থাকে বলুন না!"

মেয়েটি এতক্ষণ কোন রকমে সামলাইয়া ছিল, এবার "ও দিদিমা গো!"—বলিয়া একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আরও লোক জমা হইয়া গেল এবং মাঝখানে পড়িয়া নানাবিধ প্রশ্নের আবর্তে মেয়েটি ক্রমেই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। উত্তর আর দিবে কি? অঝোর ঝোরে কান্নার মধ্যে তাহার কেবলই এক কথা "দিদিমাকে এনে দাও.... দিদিমার কাছে যাব!...."

খাঁটী, দুর্লভ অ্যাক্সিডেণ্ট্। আবিষ্কার করার জন্য গোরাচাঁদ আর ত্রিলোচন ভিতরে ভিতরে ফুলিতেছিল, সবার মোড়লিতে একটু বিরক্তও যে না হইতেছিল এমন নয়। ত্রিলোচন বলিল, "আপনারা যে যার কাজে যান না মশাই। বাজেশিবপুর সেবক-সংঘের হাতে পড়েছে, ওর আর কোন ভয় নেই।....কোন্‌খানে তোমার দিদিমা ডুবেছিল, খুকু?"

মেয়েটি একদিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে যেখানে ভিড়টা পৃথক্ হইয়া গেল, গঙ্গার উপর নজর পড়ায় মেয়েটি আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "ওই খানটায়... ওগো দিদিমা গো।"

বৃত্তটা আবার জুড়িয়া গিয়া মেয়েটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন আধবয়সী নিম্নশ্রেণীর লোক বলিল, "ওখানে তো জল বেশী নয় তবে...."

একজন বয়স্থগোছের লোক বলিল, "কাল পূর্ণ হ'লে, বলে গোষ্পদেই ডুবে মরে, ওখানে তবুও তো এক কোমর জল রয়েছে...."

শিবপুরের হাতের জলে-ডোবার কেসটা দেখিয়া ত্রিলোচনের হিংসা লাগিয়াছিল; বলিল, "মিরগি ছিল সে বুড়ীর, না হ'লে কখনও কি আর অতটুকু জলে ডোবে।"

একজন পরামর্শ দিল, "তা হলে জাল ফেলে জায়গাটা একবার ছেঁকে ফেলা দরকার; পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে?"

ত্রিলোচন বিরক্তভাবে বক্তার দিকে চাহিয়া বলিল, "পুলিসে জাল ফেলার কি জানে মশাই? জালফেলা কাকে বলে যদি দেখতে চান তো একটু দাঁড়ান।" কে. গুপ্তর পানে চাহিয়া বলিল, "যান তো, গন্‌শাকে ডেকে নিয়ে আসুন তো, আর তার আগে আমাদের ক্যাম্পে—(ভিড়ের দিকে চাহিয়া) বাজেশিবপুর সেবা-সংঘ ক্যাম্পে—বলে যান যে শীগ্‌গির একটা জালের বন্দোবস্ত করে পাঠিয়ে দিক্।"

কে একজন বলিল, "তবেই হয়েছে! ওনাদের গণেশঠাকুর আর জাল এসতে এসতে বুড়ী ত্যাতক্ষণ উলুবেড়েয় ঠেলে উঠবে! আর তানারে ক্লেশ দেওয়া কেন বাপু, তিনি তো মা-গঙ্গার কিরপেয় দিব্যি গিয়েছে! এখন মেয়েটাকে ঘরে লিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন, বেজায় কাঁদতেছে।"

ত্রিলোচন গন্‌শার অবর্তমানে বড অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; অনেক কষ্টে পাওয়া কেস, কি করিতে হইবে ঠিকমত জানা নাই, তাহা ভিন্ন শিবপুরের দল হাঁ করিয়া আছে, পুলিস আছে। বলিল, "তবে গন্‌শাকেই শীগ্‌গির ডেকে আনুন।....আর মিরগি রুগী, বাঁচিয়েই বা কি হবে? আজ বাঁচাও, কাল আবার জল ঘুলিয়ে মরবে—মেহনৎই সার.... চুপ কর খুকু তুমি, এক্ষুণি তোমার মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, মাঝে পড়ে সে বেচারীর বুড়ো বয়সে হু'বার মরবার কষ্ট, একে তো একবার মরতেই লোকের কণ্ঠাগত-প্রাণ।"

গোরাচাঁদ অগ্রসর হইবে এমন সময় সামনে ভিড়ের প্রান্ত হইতে প্রশ্ন হইল, "এখানে কি র‍্যা গোরে?"

গন্‌শার আওয়াজ, মুহূর্তেই সে ভিড় চিরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, পেছনে বাকি-দুই-জন।

ত্রিলোচন, গোরাচাঁদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "একটা পেয়েছি গন্‌শা।"

গোরাচাঁদ বলিল, "তোকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।"

রাজেন উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "কাদের মেয়ে?"

গোরাচাঁদ স্ফূর্তির চোটে বিশেষ ভাবিয়া না দেখিয়া উত্তর করিল, "ওর দিদিমার। মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে।"

"ডু-ড্ডুবে মরেছে! কোন্‌খানে?"

ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওই ওখানটায় বলছে খুকী।"

"একটা জাল নিয়ে আসুন না মশাই।"

"এরা তো তখন থেকে শুধু জল্পনাই করছে।"

"ভারি আমার চোটের ভলণ্টিয়ার সব!"

গন্‌শা বলিল, "একমুঠো তি-ত্তিল ছুঁড়লে এখন একটাও জলে পড়বে না এমন ভিড়! জাল ফেলবেন কোথায় মশাই? আর সে কি ততক্ষণ জা-জ্জালের ভরসায় বসে থাকবে? চল্‌ ঘোঁৎনা—"

ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল, "আর তোরা দু-জন মেয়েটাকে আগ্‌লা, তিলে আর গোরা।"

ইঁটের গাঁথুনির পরেই ভয়ানক কাদা, পিছল, ভিড়। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে জেটির পণ্টুনের কাছে জল। টলিতে টলিতে সামলাইতে সামলাইতে চার জনে অগ্রসর হইল। ভিড়ের মধ্য হইতে কয়েক জন সঙ্গ লইল; তাহাদের কথাবার্তায় দু-চার জন করিয়া আরও লোক জমিতে লাগিল। জলের ধারে আসিয়া গন্‌শা পিছন ফিরিয়া জামা খুলিতে খুলিতে চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল, "এইখানে, তিলে?"

এদিকে ত্রিলোচনদের, ওদিকে গন্‌শাদের ঘিরিয়া দু'টো ভিড় জমিয়া গিয়াছে, অত দূরে দেখা যায় না। ত্রিলোচন শব্দ লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিল। এমন অপ্রত্যাশিত সাফল্যে একটু ইংরাজীর লোভ সামলাইতে পারিল না, ভিড়ের মধ্য হইতে হাত তুলিয়া গলাটা উঁচু করিয়া বলিল, "ইয়েস, দেয়ার!"

• ঘোঁৎনা, কে. গুপ্তও জামা খুলিল, রাজেন ডাঙায় সকলের জামা লইয়া থাকিবে।

বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। গন্‌শা আবার গঙ্গামুখো হইতেই একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক প্রশ্ন করিল, "ওখানে ভিড় কিসের বাছা?" স্নান করিয়া উঠিয়াছে, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হইবে। দীর্ঘাকার, পুরুষালি ছাঁদের

চেহারা, গলার স্বর ভাঙা কাঁসির মত ঝনঝনে, হাতে একটি পিত্তলের কমণ্ডলু—সের-তিনেক জল ধরে।

গন্‌শা, শুধু গন্‌শা কেন, সকলেই একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটি শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করিল, "একটি মেয়ে বসেছিল—কিছু হয় নি তো তার ?"

কে. গুপ্ত অবস্থাটা চট্ করিয়া হৃদয়ংগম করিতে পারে না, তাহা ভিন্ন একটু ছাপরেয়ে-গোছের চেহারা দেখিলে খুশি হয়, একটু আলাপ করিতে চায় ; অগ্রসর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, সে তো বেশ আছে—আমাদের সেবা-সংঘের হেফাজতে ; তার দিদিমা মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে। শুনে পর্যন্ত আমাদের মনটা...."

"কে ডুবে মরেছে !"—এক মুহূর্তে মূর্তি আর স্বরে যে পরিবর্তন হইল তা সেই জাতীয় স্ত্রীলোকেই সম্ভব। কমণ্ডলুর ডাণ্ডির উপর মুঠাটা কড় কড় করিয়া উঠিল।

সকলে, এমন কি কে. গুপ্ত পর্যন্ত শঙ্কিতভাবে দুই-পা পিছাইয়া গেল।

"বলি কে ডুবে মরেছে ? খেন্তীর দিদিমা ? তাই বুঝি বলিয়েছিস্ তাকে দিয়ে ? ভলন্টিয়ার সব, না ?—উপ্‌গার হচ্ছে ? খেন্তীর দিদিমা যদি মরে থাকে, অমর্ত-বামনীর মরা যদি এতই সহজ তো আমি কে র‍্যা ড্যাক্‌রা ? এই কে তোর মুণ্ডুপাত করছে ?"

বাঁ-হাতটা বাঘের পাঞ্জার মত কে. গুপ্তর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। ফুটবলের দাঁওপ্যাঁচে অভ্যস্ত থাকায় একটা গোত্তা মারিয়া সে নিজেকে বাঁচাইয়া লইতেই থাবাটা কে. গুপ্তর পিছনেই রাজেনের উপর গিয়া পড়িল। সে কবি বলিয়া বাবরি রাখে, মুঠাটা কড়াক্কড় করিয়া জমিয়া বসিল তাহার মাথায়।

—"ঠিক ধরেছি—এ-ই সদ্দার ! বল্ মেয়েটাকে কোথায় রেখেছিস ?"
রাজেন ঝাঁকানির মধ্যে আর্তভাবে ডাকিল, "গন্‌শা ! গনেশ !!"



ঠিক ধরেছি—এ-ই সদ্দার !

গন্‌শা জলে নামিয়া পড়িয়াছিল—তিন জনেই ; উত্তর করিল, "এক খাবলা পাঁক তুলে মাথায় দে রাজেন।"

স্ত্রীলোকটা মুঠা এবং ঝাঁকানি ঠিক রাখিয়া, বরং উগ্রতর করিয়া মাথা ঘুরাইয়া বলিল, "বটে পাঁক দিয়ে আমার মাথা ঠাণ্ডা করবে—নাতনী চুরি করে? মিরগি রুগী করে? মাথা গরমের এখন দেখেছ কি?—তুই আয় না র‍্যা অলপ্পেয়ে, তুই আয়না উঠে, দেখি কত পাঁক বইতে পারিস্।"

সেই নিম্নশ্রেণীর লোকটি অগ্রসর হইয়া আসিল, সভয় ভক্তির সহিত যুক্ত-কর মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে মাঠান, দা'ঠাউর ওনাকে নিজের মাথায় পাঁক দিতে বলতেছে আর কি, এ্যাঁটেল মাটির পাঁক পেছল কিনা...."

"কে তুই? তুই নিজে এসে দে না। আয়....কই, এগুচ্ছিস্ না যে?"

লোকটা তাড়াতাড়ি পিছনের ভিড়ে একটা চাপ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহার দিকে মনটা যাওয়ায় মুষ্টিটা বোধ হয় একটু আলগা হইয়া গিয়া থাকিবে, রাজেন একটা মরি-কি-বাঁচি গোছের ঝাঁকানি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইল; কিন্তু পিছল, আর গঙ্গার ঢালুর জন্য আর সামলাইতে পারিল না, ওলট্ পালট্ খাইয়া, কাহারও হাতের ঘটি ফেলিয়া, কাহারও আহ্নিক নষ্ট করিয়া গঙ্গার গর্ভে গিয়া পড়িল এবং প্রচণ্ড হুংকারের সহিত অমর্ত-বামনীকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া একটা ডুব-সাঁতার দিয়া বহুদূরে গিয়া ফুঁড়িয়া উঠিল এবং দৈবক্রমে সেখানে আবার একটি স্ত্রীলোকের একেবারে সামনাসামনি হইয়া উঠায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা ডুব দিয়া একেবারে মাঝগঙ্গামুখো হইল। ততক্ষণে চারি দিকে বেশ একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছে খুন হইয়াছে, কেহ বলিতেছে ষাঁড় ক্ষেপিয়াছে, কেহ বলিতেছে বান ডাকিবে; কেহ অনেকটা কাছাকাছি আন্দাজ করিয়া বলিতেছে কচি মেয়ের গলার

হার চুরি। উহারই মধ্যে গন্‌শা একবার জাহাজের জেটির উপর উঠিয়া এক রকম তীব্র সাংকেতিক চীৎকারে ত্রিলোচনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

ত্রিলোচন মুঠোটা বাঁশির মত করিয়া তার মধ্য দিয়া তারস্বরে প্রশ্ন করিল, "ডেড্ উয়োম্যান্ গট্?"

গন্‌শা উত্তর করিল, "নট্ ডেড্, ডা-ড্ডাইং রাজেন;—রাজেনকে মেরে ফেল্‌ছে, চুলের মুঠি ধ'রে; তো-ত্তোরা সেইখানে চলে আয়—মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে, নো মিরগি। ম্যান-ট্রেডমার্ক উয়োম্যান এক্কেবারে বেটাছেলে মার্কা!..."

* * *

শিবপুর ঘাট থেকে অনেকটা উত্তরে।

ভাঁটার জন্য জলের কাছাকাছি একটা মাঝারি-সাইজের গাধা-বোট কাৎ হইয়া আছে। লোক নাই; অর্থাৎ গাধা বোটের লোক নাই, আছে গন্‌শা, ঘেঁাৎনা, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ। হঠাৎ দেখিলে কিন্তু কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই—আর কেহ চেনে উহারাও সেজন্য ব্যস্ত নয়। ভলণ্টিয়ারের ব্যাজ নাই এবং ব্যাজ আঁটিবার জামাও নাই গায়ে। গোরাচাঁদ একটা কামিজ পরিয়া আছে, যথাস্থানে নয়, কোমরের নীচে! বাঁধিবার কিছু না-থাকায় কামিজের গলাটার এক জায়গায় ছিঁড়িয়া ফাঁদটা বড় করিয়া নাভিকুণ্ডলের কাছে বোতামটা আঁটিয়া দিয়াছে। হাঁটুর কাছে কামিজের হাতা দুইটা লট্‌পট্ করিতেছে। কেহ বিশেষ কথা বলিতেছে না।

রাজেন আর ত্রিলোচন নাই। রাজেন একটু দূরে গঙ্গায় আবক্ষ ডুবিয়া যেন কিছুই হয় নাই এইভাবে কুলকুচি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ত্রিলোচন না আসিলে উঠিবে না। উঠিবার যো নাই।

ত্রিলোচন সবার জন্য কাপড় আনিতে গিয়াছে।



শিবপুর ঘাট থেকে অনেকটা উত্তরে

চাড়ু-শিল্প

(সাধ

মেয়ে দেখা হইল।

খাসা মেয়ে, বেশ আঁটসাট গড়ন ; সমস্ত শরীরটাতে স্বাস্থ্যের শ্রী ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মাথায় একটু দীর্ঘ, গায়ে মেদের বাহুল্য নাই, তবে হাড়কাঠ সাধারণ মেয়ের চেয়ে মোটা, তাহাতে শরীরটি একটু ভারি দেখায়—'সখী ধর ধর' গোছের একেবারেই নয়। হ্যাঁ ঠিক, এই ধরণের মেয়ে এখন দরকার বাংলার ঘরে ঘরে।....মাখনাটার কপাল ভাল।

পাশের ঘরে জলযোগের ব্যবস্থা—

ঠিক জলযোগ বলিলে ভুল হইবে—লুচি, ছোলার দাল, দই-মাছ, মাংসের কোর্মা, চপ্ ; ওদিকে রাবড়ি, মিষ্টান্ন, দই। বলিলাম, "করেছেন কি!—আপনাদের জামাই আবার ভয়ানক মিতাহারী—সবতো পড়েই থাকবে।"

'মিতাহারী'—মাখনার গালাগাল ; তবু এ-মিথ্যাটুকু বলিলাম মাখনাকে একটা ইঙ্গিত করিবার জন্য।—জানি ও বোধ হয় গ্রাহ্য করিবে না ; তবু, একেবারে পাতে পিঁপড়া না কাঁদিয়া যায়....অন্তত, কোন জিনিস চাহিয়া না-বসে বেহায়ার মত।

মেয়ের কাকা বলিলেন, "এর মধ্যে রুনুর রান্নার হাতও টের পাবেন। কোর্মা আর মাছটা ওকে দিয়েই রাঁধান হয়েছে।....আপনি মশাই মোটেই খাচ্ছেন না যে!—ওকি ?"

আমার অত বেশি ভদ্রতা করা অভ্যাস নয়, আর রান্নাও সত্যই

চমৎকার হইয়াছে, তবে এক্ষেত্রে মাখনের চোখের সামনেই একটা দৃষ্টান্ত ধরিয়া রাখিবার জন্য আমি সত্যই নিতান্ত খুঁটিয়া-খুঁটিয়া আহার করিতেছিলাম। কিন্তু হতভাগাকে শেখান কি এত সহজ?—আমার দিকে হঠাৎ মুখটা বাড়াইয়া আনিল, এবং আমি কানটা আগাইয়া নিলে নিম্নস্বরে বলিল, "একবার মাংসটা....তুই নিজের জন্যে চা না.... তাহ'লেই...."

মেয়ের মেজভাই, কাকা দুইজনে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল, "কি, কি; কিছু চাই নাকি? বল, এতে আর লজ্জা কি?"

লজ্জায়, রাগে আমার কর্ণমূল উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে না, চাইবে কি? ও বলছে.... থাক্ সে কথা....না, সত্যিই চমৎকার হাত রান্নার...."

কাকা, মেজভাইয়ের সঙ্গে আরও দুই একজন উৎসুক হইয়া উঠিল, "কি, কি বলছেন উনি?"

হাসিয়া বলিলাম, "দুষ্টুমি আর কি, এখন থেকেই! বলছে মাংসটা আলুনি হয়েছে। শোনেন কেন; সম্পূর্ণ মিছে কথা; এমন চমৎকার রান্না, আর বলে কিনা আলুনি!"

"না, না, শীগ্‌গির নুন নিয়ে এস, যাও; হতে পারে আলুনি, ছেলে মানুষ তো...."

বলিলাম, "ও একটু খায়; নুন বেশি।"

এক ছোকরা নুন লইয়া আসিল। বলিলাম, "দাও, দিয়ে দাও বাটিতে।" মাখনাকে বলিলাম, "নে, মিশিয়ে নে।"

নিরুপায় ভাবে মিলাইতে মিলাইতে মাখনা আমার পানে আড়চোখে এমন একটা কটাক্ষ হানিল যে, যুগের দোষ না থাকিলে তখনই একপিণ্ড অঙ্গারে পরিণত হইয়া যাইতাম।

যাহোক, সে ফাঁড়াটা কিন্তু ঐ করিয়া কাটিল। কোন রকমে মান বাঁচিল।

বাহিরে আসিয়া সকলে বসিলাম। এ-সব ব্যাপারে যেমন হইয়া থাকে—মেয়ের গুণ-গানই চলিতে লাগিল। পাড়ার বর্ষীয়ান্ আরও কয়েক-জন আসিয়া যোগদান করিলেন।—স্বাস্থ্যে, কর্মিষ্ঠতায়, চরিত্রের মাধুর্যে এমন মেয়ে এ তল্লাটে নাই। ঐ তো ছেলেমানুষ মেয়ে, গ্রামে কোন একটা কাজকর্ম যাগযজ্ঞ হইলে সমস্ত হিড়িকটা একলাই সামলাইবার ক্ষমতা রাখে—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা—যখন শ্বশুর গৃহে যাইবে, গ্রামখানিকে একেবারে অন্ধকার করিয়া যাইবে.... ।

আমি কিন্তু এদিকে গলদ্ঘর্ম হইতেছিলাম।—মাখন মাঝে মাঝে আমার পাঁজরার নীচে আঙ্গুল দিয়া এক একবার খোঁচা দিতেছে, এখনই অসামাজিক কিছু একটা করিয়া বসিবে, কি বেফাঁস্ কোন একটা কথা বলিয়া বসিবে। প্রথমটা অগ্রাহ্য করিলাম, কিন্তু চুপ করিয়া থাকা আর নিরাপদ নয় দেখিয়া অবশেষে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কিছু বলবি নাকি ?"—এবং যাহা বলিবে তাহা একেবারে প্রকাশ্যে না বলিয়া বসে এইজন্য কানটা বাড়াইয়া দিলাম। মাখন মুখটা আগাইয়া আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "সেই যে তোকে বলেছিলাম—গান, বোনাটোনা...."

হতভাগার উপর বেজায় রাগ হইল। এ মেয়ে কি গান আর উলবোনা লইয়া থাকিবার মেয়ে ? এ রত্ন কি ধাতে গড়া বুঝিবার ক্ষমতা নাই, মিছামিছি বুজরুকি করিতে যাইতেছে। চাপা গলায় বলিলাম, "চুপ কর্।"

সকলে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল,—বর বলে কি ?...."উনি কোন কথা বলতে চান কি ?—তা বলুন, লজ্জা কি ?"

লজ্জা যে ওর নাই সেটা কি ওরা এখনও টের পাইল না ?

"পানে নিশ্চয় চুন কম হয়েছে"—বলিয়া যে ছোকরা নুন জোগাইয়াছিল সে উঠিয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইল ; মুখ পোড়াইবার একটু লোভ হইলেও....

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না, ও উঠতে চাইছে, জিগ্যেস করছে—গাড়ির দেরি কত ?"

মাখন আর এবারে চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিবার চেষ্টা না করিয়া সোজাসুজিই বলিয়া উঠিল, "না, আমি বলছিলাম...."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল ; লজ্জা কি ?

"কোন রকম শিল্পটিল্প...."

গলার আওয়াজে রাগটা যাহাতে প্রকাশ হইয়া না পড়ে সেরূপ চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু বোধ হয় সমর্থ হইলাম না। মুখটা একটু নীচু করিয়া বলিলাম, "ও! ফিস্ ফিস্ করে বুঝি তাই বলছিলি ? আমি মনে করি....তা অমন হাতের রান্না—ওর চেয়ে বড় শিল্প...."

মাখনা বলিল, "না, আমি চাড়ু-শিল্পের কথা বলছি।"

গা আমার পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছিল। চাড়ু-শিল্প!—কথাটা জোগাড় করিল কোথা হইতে ? ওর মুখে তো এই প্রথম শুনিলাম।

দেখিলাম সকলেই চুপচাপ। শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে—কূলের কাছে আসিয়া তরী বুঝি ডুবিল। আমিও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম, জানিতো—ও ছোঁড়ার মাথায় একটা খেয়াল বসিয়া গেলে আর সহজে মেটান যায় না। খানিক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম, তাহার পর হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। মুখটা তুলিয়া বলিলাম, "ও! আপনারা বুঝি ধরতেই পারেন নি কথাটা ? তাই চুপ করে রয়েছেন ? ও বলছে—এই বোনাটোনা, ছবি আঁকা, রুমালে ফুলপাতা তোলা এই সব

আর কি! সহরে আজকাল এ খুব চলেছে কিনা। তা এসবে যে মেয়ের হাত কি রকম পাকা সে তো আমি ওর আঙুলের গড়ন দেখেই বুঝেছি....”

মেয়ের দাদার দিকে চাহিয়া বলিলাম, “যান তো, নিয়ে আসুনতো নমুনা সব, আর হঁ্যা—শুনুন।”

মাখনের কানে কানে বলিলাম, “দাঁড়া, এই সঙ্গে তোর শিল্পের সেরা শিল্পও আনিয়ে দিচ্ছি।”—বলিয়া একটু টিপিয়া দিলাম।

উঠিয়া গিয়া কনের দাদাকে একপ্রান্তে ডাকিয়া বলিলাম, “ও মেয়ের ওসব বাজে কাজের সময় কোথায় মশাই? আমি তো বুঝি। পরে ও হতভাগাও বুঝবে কদর। আপাতত আপনি এক কাজ করুন।—বাড়িতে উলের কাজ, কি রুমালে নাম-তোলা—এসব আছে কিছু?”

ছোকরা একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, “কনুর নিজের হাতের নেই, শিখতেই চায় না; সেজকাকীর—”

আমি তাহার কাঁধে দুইটা লঘু আঘাত করিয়া বলিলাম, “সেজ কাকীরই হোক, কি বড় জেঠাইয়েরই হোক—কিচ্ছু যায় আসে না—হাতের কাছে যা পান উঠিয়ে নিয়ে আসুন।” তারপর তাহার কুণ্ঠার কারণটা বুঝিতে পারিয়া তাহার পরিহিত খদ্দরের পানে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলাম, “আর দোহাই আপনার—সত্যি কথাটা বলে যেন ভেস্তে দেবেন না! এর পরে খদ্দরের ওপর না হয় একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেবেন। হঁ্যা, আর এককথা—একটি কাগজে কুনুদেবীর নিজের হাতে লেখা তাঁর নামটি দয়া করে নিয়ে আসবেন, নৈলে ভাববে ওকে ঠকাবার উপায় বাংলাতেই আপনাকে ডেকে নিয়ে এসেছি। এনে দিন —বিয়ে পাকা—এ আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি।”

(পরিণাম)

বছর দেড়েকের পরের কথা বলিতেছি।

আমি মাখনের বিয়ের সময়টায় ছিলাম; তারপরই কিন্তু ঘটনাচক্রে আমাদের এই দেড় বছরের ছাড়াছাড়ি। এতদিন পরে আবার হঠাৎ দেখা।

দুপুরবেলা কাঠ-ফাটা রোদ, রাস্তায় এক পা চলে কাহার সাধ্য! জায়গায় জায়গায় পীচ গলিয়া উপরকার স্তর ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে হাওয়া দিতেছে—যেন আগুনের অদৃশ্য শিখা।

দেখিলাম রাস্তা দিয়া আমাদের মাখনের মত কে যেন হন হন করিয়া চলিয়া আসিতেছে। আরও কাছে আসিলে বুঝিলাম মাখনই! কিন্তু এত বদলাইয়াছে মাখনা—ভাল করিয়া যেন চেনা যায় না! রোগা হইয়া গিয়াছে চুলগুলা উষ্কখুষ্ক, মুখে কেমন একটা অন্যমনস্ক ভাব। বাঁ কাঁধে প্রকাণ্ড ছবির ফ্রেমের মত কি একটা কাগজে মোড়া। অবশ্য বেশ সুসংস্কৃত মার্জিত চেহারা মাখনার কখনই ছিল না, কিন্তু অনবদ্য স্বাস্থ্য আর নিশ্চিন্ত সন্তোষের একটা দীপ্তি ওর চেহারায় চিরকালই দেখিয়া আসিয়াছি। এই কি সেই মাখন!

ও জানিত না যে আমি আসিয়াছি, তাই হন হন করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। আমি ডাক দিতেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া একটু চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "শৈলেন যে! কবে এলি!"

বলিলাম, "আজই। আয় বোস্।—তারপর? এই রোদে, ঠিক-দুপুরে চলেছিস কোথায়? আর শরীর তোর এমন কেন? কিছু অসুখ-বিসুখ—"

"নাঃ" বলিয়া মাখন কথাটাকে যেন একেবারেই উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেহারা যে ইহাতে সায় নিতেছে না সেটা ভাল

ভাবেই জানে বলিয়া, অস্বীকার করার পর যেন আরও নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কোথাও কিছু একটা গলদ আছে বুঝিতে পারিয়া আমি আর ও প্রসঙ্গটা চালাইলাম না ; জিজ্ঞসা করিলাম, "তোর হাতে ওটা কি মাখন?

মাখন যেন এতে আরও একটু জড়সড় হইয়া উঠিল ; মোড়কটা বাঁ হাত দিয়া চাপিয়া বলিল, "ও কিছু নয়।—তারপর, ছিলি কেমন ?"

হাসিয়া বলিলাম, "আমাদের থাকা আর না থাকা ! তোর নিজের কথা বল। গিন্নী কি রকম হ'ল ? ঠিক কথা, ভুলেই যাচ্ছিলাম—কেমন কোর্ম্মা-কালিয়া খাচ্ছিস্ ? না, তোর বউকে দেখতে গিয়ে যা চপ্ খেয়েছিলাম মাখন, এখনও যেন মুখে লেগে রয়েছে। এখন হাত নিশ্চয় আরও পেকেছে, একদিন খাওয়ান চাই, কবে আসব বল্ দিকিন ?"

উত্তরে মাখন লজ্জিতভাবে একটু ম্লান হাসি হাসিল মাত্র।

বলিলাম, "হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না।—না নেমন্তন্ন করিস্ এমনি গিয়ে জবরদস্তি খেয়ে আসব একদিন। কেন, বিয়েটা না হয় তুই-ই করেছিস, কিন্তু আমাদের কি কোন হক্ নেই ? যোগাযোগটা ঘটাল কে ?"

মাখন একটু থামিয়া বলিল, "আজ রাত্তিরেই আয় না শৈল, অনেক দিন একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করিনি দু'জনে। ও কিন্তু আর একেবারেই সময় পায় না রাঁধবার ভাই। যখন রাঁধত তখন তুই রইলিনি—"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "সময় পায় না ?"

"এখন মনটা অন্যদিকে গেছে কিনা।"

"অন্যদিকে ?—কোন দিকে ?"

"আজকাল বোনা, রেশমের ফুল তোলা এই সব নিয়েই থাকে যে ; হেঁসেলের দিকে আর যাবার ফুরসৎই পায় না।"

আমার ধাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল,—'চারু শিল্প।'

বলিলাম, "তাহ'লে তো খাসা আছিস্। হাত কেমন হইয়াছে বউয়ের ?"

মাখন আবার একটু হাসিল;—একটা অপ্রতিভ হাসি, যেন কি একটা বলিতে—কি করিতে চাহিতেছে, অথচ মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বলিলাম, "চপ্-কোর্মাও উড়িয়ে আসব, আর তোর বউয়ের হাতের কাজও দেখে আসব সেই সঙ্গে, বলে রাখবি গিয়ে। আজ আর নয়,—বড় তাড়াতাড়ি হয়ে পড়বে। এক হপ্তা সময় দিলাম। এক আধ খানা নমুনা আমায়ও দিতে হবে কিন্তু, ঘরে টাঙিয়ে রাখব।"

মাখন কোন কথা না বলিয়া ফ্রেমের মত সেই জিনিসটির কাগজের মোড়কটা ধীরে ধীরে খুলিয়া সেটা আমার দিকে ঠেলিয়া দিল।

কালো, নীল আর বেগুন রঙের উলে বোনা প্রায় তিন ফুট আড়াই ফুট মাপের কি একটা জিনিষ!—কোন একটা জানোয়ার বলিয়া মনে করা মুস্কিল, কেননা মুখ, চোখ, কান, বাহির করা শক্ত; কোন ঝাঁকড়া একটা ফুলের গাছ মনে করায় বিপদ আছে, কেননা কোথায় যেন তিনটি পায়ের আভাস পাওয়া যায়; এক একবার মনে হয় একটা মানুষ যেন হাতে মাথা টিপিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে; কিন্তু তাহাই বা হয় কেমন করিয়া? পিছনে একটা ল্যাজের মত কি একটা রহিয়াছে যে!—গাছ নয়, মানুষ নয়, জন্তুজানোয়ার নয়; আসবার পত্রের সঙ্গেও কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে না। ব্যাপারটা তাহা হইলে কি? ওদিকে মাখনা নিশ্চয় একটা প্রশংসার উচ্ছ্বাস আশা করিতেছে; কিন্তু কিসের প্রশংসা করিতেছি না বুঝিয়া, কি প্রশংসা করিব?

মাখন বলিল, "শনিবার টাউনহলে এক্‌জিবিশান কিনা....আরও গড়ছে বৌ—অষ্টপ্রহর খেটে।"

আর চুপ করিয়া থাকা নিষ্ঠুরতা, আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "হয়েছেও চমৎকার!—বাঃ!"

মাখন লজ্জিত ভাবে বলিল, "যাঃ, ঠাট্টা করছিস।"

"ঠাট্টা!"—আশ্চর্য হইয়া মাখনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

মাখন স্থির সপ্রশংস দৃষ্টিতে জিনিসটার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "পাবে প্রাইজ্ মনে করিস্? আমার তো আশা হয় না।"

বলিলাম, "মারে কে?—এরকম জিনিস ক'টাই বা আসবে এক্জিবিশানে শুনি?"

মাখন হাসিয়া ফেলিল; বুঝিলাম তাহার সব সন্দেহ কাটিয়া গিয়াছে। বলিল, "দেড টাকার উল আছে এতে শৈলেন, আর কটা দোকান ঘুরে রং মিশিয়ে কিনতে কি কম খাটুনিটা হয়েছে!"

"অথচ তুই বলছিস প্রাইজ্ পাবে না!—নগদ দেড়টা টাকার উল কি একটা হাসি-ঠাট্টা না কি? হুঁঃ।"

ঠাট্টাটা বুঝিল না মাখনা, নিজের গড়া স্বর্গলোকে বেশ আছে! তবুও কিন্তু কষ্ট হইল ওর দশা দেখিয়া। মাখনা নিশ্চয় ভাল করিয়া খাইতে পায় না; বরাবরই একটু ভাল রান্নার, ভাল জিনিসের পক্ষপাতী ছিল বেচারা! তাহার পর এই অযথা প্রাণান্ত মেহনৎ—রোদ নাই, বৃষ্টি নাই, উল মিলাইয়া বেড়ান—টাকার অপব্যয়ের কথা না হয় বাদই দিলাম।

রীতিমত রোগা হইয়া গিয়াছে। মাখনা হইল রোগা—তাও অমন গৃহিণী পাইয়া—রান্নায় যে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী! কি কোর্মাই না রাঁধিয়াছিল সেদিন! আর সেই রুয়ের পেটি দিয়া দই-মাছ! ব্যক্তিগতভাবে নিজেও যেন একটা বঞ্চনার সন্তাপ অনুভব করিতেছি। এই দেড় বৎসরের মধ্যে যখনই মাখনার কথা মনে পড়িয়াছে—দেখিয়াছি ঐ সেই

হৃষ্টপুষ্ট সেবাপরায়ণা কর্মিষ্ঠা বৌ ষোড়শোপচারে অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়া দিতেছে, আর পরিতোষের আহারে মাখনলালের চেহারা আরও রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। ফিরিয়া গিয়া মাঝে মাঝে ভাগ বসান যাইবে।.... হায়রে বরাৎ, অমন কোর্মার জায়গায় এই উলের পিণ্ড! খাল কাটিয়া কুমীর ঢোকাইল ঘরে মাখনা!

বলিলাম, "মাখন্, বউয়ের রান্নার দিকেও একটু খেয়াল রাখিস—তোকে দেখলেই মনে হয় ঠাকুরের বকেয়া ডাল চচ্চড়ি ছাড়া আর দেড় বছর তোর পেটে কিছু পড়েনি...."

কাকেই বা বলা?

মাখনা তাহার 'চাড়ু-শিল্প'টা আবার সযত্নে কাগজে মুড়িতেছিল, স্মিতহাস্যের সহিত আবার আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যিই প্রাইজ পাবে বলে তোর মনে হয় শৈলেন?"

বলিলাম, "অনিবার্য; কিন্তু আমি বলছিলাম অমন রান্নার হাত আজকালকার দিনে—পুরুষদের এই পোড়াকপালের যুগে—লাখে একটি মেলে না...."

মাখন ফ্রেমটা কাঁকালে লইয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িল।

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "উঠলি যে! ব'স্, আমি সরবতের কথা বলে দিলাম। আর রোদটা একটু পড়ুক—রোদের দিকে যে চাওয়া যায় না,—চোখ ঠিকরে পড়ে!"

মাখন ততক্ষণে দোরের দিকে পা বাড়াইয়াছে, ঘুরিয়া বলিল, "আজ থাক্ ভাই, অন্য একদিন খাব'খন। এখনই পেনোর দোকানে না দিয়ে এলে পরশু শনিবার পর্যন্ত বেঁধে দিতে পারবে না কিনা। বৌ ওদিকে আরও তিনখানা প্রায় শেষ করে এনেছে।....সত্যি বলছিস তো পাবে প্রাইজ?"

আবার সেই আগুনের হলকার মধ্যে নামিয়া পড়িল।

বৈরিগীর ভিটেয়

ভীষণ শীত! বাহিরে বৃষ্টি আর বাতাসে মাতামাতি চলিতেছে। তারাপদ বলিয়া দিয়াছিল, চাকর একটা তোলা উনানে এক উনান আগুন রাখিয়া গেল; সকলে নিজের নিজের চেয়ার টানিয়া লইয়া আগুনটা ঘেরিয়া ফেলিল। যে-প্রসঙ্গটা শুরু হইয়াছিল তাহারই জেরটা ধরিয়া রাখিয়া সুধেন বলিল, "অশ্বিনী, বিশ্বাস না কর, নেই-নেই; তুমি কিন্তু এত রাত্রে ও-পথ দিয়ে আর বাড়ি যেও না, তারাপদ যেমন বলছে এইখানেই খেয়ে-দেয়ে রাতটা কাটিয়ে দাও। ভূত না থাক্, এই রকম ভয়ঙ্কর রাত্রের একটা নিজস্ব স্পিরিট আছে, অবস্থাগতিকে সেইটেই মানুষের প্রাণঘাতী হ'তে পারে।"

অম্বিকা বলিল, "নটা থেকে আবার অমাবস্যা পড়েছে।"

অশ্বিনী উত্তর করিল, "যাক্, মানুষের স্পিরিট থেকে রাত্রির স্পিরিটে নেমে এসেছ; এইবার বলবে রাস্তার স্পিরিট, পুকুরের স্পিরিট!—আর এতই যদি চারি দিকে স্পিরিটের হুড়োহুড়ি তো অক্ষয় তো থাকবেই আমার সঙ্গে...."

অক্ষয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মাফ করতে হচ্ছে, শর্মা আর আজ এ-ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছে না। এই রাত্রে দু-মাইল পথ ভেঙে যাওয়ার শখ আমার নেই, তাও আবার সিদ্ধেশ্বরীর শ্মশানঘাটের কাছ দিয়ে! তোমার মত আমার নতুন বিয়ে নয় যে জবাবদিহি দিতে হবে; বরং অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বিয়ের কথাটা এত দিনে যে উঠেছে, তার জন্যে আমায় শত্তুরমুখে ছাই দিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।"

স্থানটা এদের দৈনিক তাসের আড্ডা—তারাপদর বাসা। মিল্-এরিয়াটা এইখানে প্রায় শেষ হইয়াছে। এর পরেই একটা প্রকাণ্ড মাঠ, তাহার কটা দিক্ গঙ্গা পর্যন্ত প্রসারিত। মুক্ত মাঠের উপর দিয়া এলোমেলো হাওয়া আসিয়া চারিদিক দিয়া ঘরটায় প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে, দুয়ার জানালার ছিদ্রপথে কখনও কান্না, কখনও অনুযোগ, হাওয়ার উগ্রতায় কখনও বা ভীত আর্তনাদের মত শব্দ হইতেছে। একবার দুয়ারের ছিটকিনিটা পর্যন্ত এমন ঝন্ঝনাইয়া দিল যে সবাইকেই ফিরিয়া চাহিতে হইল; অম্বিকা একটু নিস্প্রভ হাস্যের সহিত বলিল, "সত্যিই ভেতরে আসতে চাইছেন নাকি ওঁদের কেউ?"

অক্ষয় বলিল, "যদি চানই তো কিছু বিচিত্র নয়। এই যে প্রবল ধাক্কাটা লাগল দোরের গায়ে, এটা এই পাগলা হাওয়ার হওয়াই বেশি সম্ভাবনা,—পনের আনা; কিন্তু বাকি এক আনার মধ্যে আর একটা মস্ত সম্ভাবনা আছে। সেটাকে শুধু গঞ্জিকা বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না, কেননা তাতে দর্শনশাস্ত্রের সীলমোহর আছে। ব্যাপারটা এই;— তোমরা জান দর্শনের একটা থিয়োরি হচ্ছে যে আসলে সময়ের বিভাগ অর্থাৎ ভূত—ভবিষ্যৎ—বর্তমান বলে কোন বস্তু নেই, ও ধারণাটা নিতান্ত আপেক্ষিক। প্রকৃত তথ্য এই যে—There is one eternal 'Now',— অর্থাৎ কাল সর্বব্যাপী একটি শাশ্বত সত্তা। এখন, তাই যদি ঠিক হয় তো জগতের যা কিছু ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে আর ঘটবে বলে আমরা মনে করি সবই একই সময়ে উপস্থিত রয়েছে—শুধু time and space অর্থাৎ স্থান আর কালের বিভিন্ন স্তরে। তার মানে ঠিক এই স্থানে—আমরা যাকে অতীত বলি সেই সময় যদি কোন এক ঘটনা ঘটে থাকে তো এখনও তা ঘটচে—শুধু আমাদের জ্ঞানের অন্তরালে। জ্ঞানের অন্তরালে এই জন্যে যে, যে-স্তরে তা ঘটছে সেই স্তরে আমরা এই স্থূল চেতনা নিয়ে পৌঁছুতে

পারি না। অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হ'লে, বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে, আমরা হঠাৎ সেই ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। তার মানে....”

সুধেন বলিল, “দোহাই তোমার, আর 'তার মানে' নয়, টীকা ক্রমেই মূলের চেয়ে জটিল হয়ে উঠেছে। বরং প্রথমটা কিছু বুঝেছিলাম, এখন আর....”

অক্ষয় বলিল, “বুঝিয়ে দিচ্ছি খুব স্থূল ভাবে,—ধর কোন অতীতে ঠিক এই জায়গাতে একটা বাড়ি ছিল কারুর—এমনই এক দুর্যোগের রাত্রি,—সেদিনের সেই গৃহকর্তা বা বাড়ির অন্য কেউ—বা ধর কোন অতিথি বহু দূর থেকে এসে এই বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াল—শীতে বৃষ্টিতে, পথের শ্রান্তিতে একেবারে বিপর্যস্ত। দ্রুত ঘা পড়ল বন্ধ দরজার ওপর; হয়তো কাপড়ের আড়ালে প্রদীপ নিয়ে গৃহিণী কিংবা বাড়ির অন্য কোন বধূ গিয়ে দরজা খুলে দিলে। কিংবা হয়তো আগন্তুক বাড়ির কেউ নয়—কোন পথিক মাত্র আশ্রয়ভিক্ষায় এসেছে। কপাটে আঘাত হওয়ায় সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ভেতর থেকে প্রশ্ন হ'ল—

—“কে ধাক্কা দেয়?....”

তারাপদ, সুধেন, অক্ষয়, অম্বিকা রমেন, হঠাৎ চমকিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, অশ্বিনীও যেন বাদ গেল না। অক্ষয়ের কথার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বাহিরে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আওয়াজ হইল, “কে?”

দুয়ারের পানে শঙ্কিত নেত্রে একবার চাহিয়া প্রায় সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, “কে?—কে ধাক্কা দেয়?”

কিন্তু তখনই ঘরের পাশের ডোবাটায় একটা ব্যাঙের আওয়াজ পাইয়া কতকগুলা ব্যাঙ একসঙ্গে “কে-কেও, কে-কেও” করিয়া তারস্বরে আওয়াজ তুলিল। সকলে লজ্জিত হইয়া আবার পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল

অশ্বিনী হাসিয়া বলিল, "যাক, অক্ষয়ের থিয়োরিটা অনেকটা স্পষ্ট হ'ল এই দিয়ে—যেমন এই বায়ুর স্তরে বায়ু হানা দিচ্ছে আর জলের স্তরে ব্যাং 'কে-কেও' আওয়াজ করছে—তুটো সময়-হিসেবে এক সঙ্গেই হচ্ছে—মাঝখান থেকে আমরা তুটো জুড়ে একটা জিনিস খাড়া করে নিয়ে আঁৎকে উঠলাম।....কেমন হে অক্ষয়, এই তো?"

অক্ষয় একটু রাগিয়া বলিল, "অত উড়িয়ে দেবার কথা নয় হে অশ্বিনীবাবু, ঠিক এই ধরণের ব্যাপার আমাদের গ্রামে একবার হয়ে গেছে, আর মজার কথা এই যে তুমিও স্বয়ং তার মধ্যে ছিলে। এমন কিছু বেশি দিনের কথাও নয়; অথচ এখন দিব্যি ঠাট্টা করে যাচ্ছ আমায়।"

অশ্বিনী স্মৃতিকে আলোড়ন করিবার চেষ্টা করিয়া অক্ষয়ের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিল, "ও!—তুমি বৈরিগীর ভিটের সেই সেদিনকার কাণ্ডটার কথা বলছ?"

তারাপদ, সুধেন, অম্বিকা, রমেন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "কি, কি, ব্যাপারটা কি শুনি!"

অক্ষয় অশ্বিনীকে বলিল, "বল না অশ্বিনী, অবিশ্বাসীর মুখেই শোনা যাক ব্যাপারটা।"

অশ্বিনী বলিল, "তাতে জিনিসটার অমর্যাদা হবে। তুমিই বল, আমি না হয় শেষ কালে টীকা করে দোব'খন। যদি কারুর সন্দেহ থাকে তো পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

অক্ষয়ই বলিতে আরম্ভ করিল, "তারাপদ তুমি বৈরিগীর ভিটেটা দেখেছ, বলে দিলেই বুঝতে পারবে। সেদিন সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়ি যাবার সময় একটা উঁচুপানা জায়গায় একটা খেজুরগাছ দেখেছিলে মনে আছে?"

তারাপদ বলিল, "আছে মনে। সেই লম্বা উঁচু হয়ে গিয়ে আবার ঘাড়ের কাছটায় মুচড়ে নেমে এসেছে—সেইটে তো?

"হ্যাঁ, সেইটে। তুমি বলেও ছিলে—গাছটা বেয়াড়া দেখতে তো!···· আমি বলেছিলাম জায়গাটার ইতিহাস আছে একটা, বলব বাড়ি গিয়ে, তার পর তুমিও জিগ্যেস কর নি, আমিও বলতে ভুলে গেছি।····সেই উঁচু ঢিবিটা বৈরিগীর ভিটে। জায়গাটার একটা বিশেষত্ব এই যে, এক ঐ কাঁধ-মোচড়ান খেজুরগাছ ছাড়া সবুজ একটি ঘাসের কণা পর্যন্ত দেখতে পাবে না। কিছু হয় না ও টুকুতে। কলেজে দু-পাতা কেমিস্ট্রি পড়ে, আর সব জায়গার মত আমাদের গ্রামেও দু-এক জন দিগ্‌গজ বৈজ্ঞানিক গজিয়েছেন, নাকে চশমা দিয়ে তাঁরা অবশ্য বলছেন—ঘরের দেয়াল পড়ে জায়গাটা বড্ড নোনা হয়ে গেছে, তাই কিছু হয় না; কিন্তু যারা জানে তারা ঠিকই জানে যে সবুজ বা প্রাণবন্ত কিছু হবার জো নেই ও-ভিটেতে। ওর ওপর প্রাণের অভিশাপ আছে—পাশের চারি দিকেই সবুজ লতা-আগাছার ঘন জঙ্গল—ছাগল চরছে, গরু চরছে, ছেলেমেয়েরা বৈঁচি, আঁশফল সংগ্রহ করছে, শুধু বৈরিগীর ভিটেয় কিছু হবে না, জীবন্ত কারুর পায়ের দাগ পড়বে না। ঐ একটি খেজুরগাছ,—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, তার ভাঙা কাঁধ আস্তে আস্তে দুলিয়ে দুলিয়ে পাহারা দিচ্ছে—অভিশাপের কোথাও ব্যতিক্রম ঘটল কিনা। লোকে বলে না কি ওই গাছটার মাথায়ও কেউ কখনও একটা পাখি বসতে দেখেনি, অবশ্য সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন।

"বৈরিগীর ভিটের ইতিহাস—সে এক সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, আজকের যে ঘটনার কথা তুলেছি তার সঙ্গে যেটুকু সম্বন্ধ আছে সেই টুকুর কথাই বলব, সবিস্তারে না হয় অন্য এক দিন বলা যাবে।

"ঐ খেজুরগাছের নীচে গোকুল বৈরিগীর বাড়ি ছিল। পরিবারের

মধ্যে নিজে, স্ত্রী বিন্দু বোষ্টমী, গোকুলের প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে আর সাধন। এই সাধন যে আসলে গোকুল বৈরিগীর কে ছিল কেউ জানে না। কেউ বলত তার দূর সম্পর্কের এক ভাই, কেউ বলত প্রথম পক্ষের খুব দূরসম্পর্কের শালা, কেউ বলত গুরুভাই, মোট কথা খুব নিকট আত্মীয় কেউ না হয়েও সাধন গোকুলের বাড়িতে বহুদিন থেকেই ছিল। সাধন যাত্রার পালা বেশ বাঁধতে পারত; এদিকে ছিল পঙ্গু, তার ডান পা-টা জন্ম থেকেই শুকনো আর অসাড়। যখনই দেখ, শুকনো পা আর একটা মোটা খাতা কোলে করে সাধন পালা লিখে যাচ্ছে। উঠত খুব কম, কেউ এলে পালা নিয়ে কথাবার্ত্তা হ'ত, সন্ধ্যের সময় গোকুল গাঁজার ছিলিম হাতে এসে বসত, দুটো সুখ-দুঃখের কথা হ'ত। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক এক খাওয়া নিয়ে, সেটাও বেশি দিনই গোকুলের মেয়ে রেবতী দিয়ে যেত।

"এই রেবতী মেয়েটি যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল, ততই বাইরে ভাত নিয়ে আসাটা তার কমে আসতে লাগল। সাধন লোকটার পা শুকনো ছিল বটে, কিন্তু মন শুকনো ছিল না—বুঝতেই পার, শুকনো মন নিয়ে কেউ কখন যাত্রার পালা বাঁধতে পারে না। যেদিন বাইরে ভাত না আসত, সেদিন সে বগলে ক্রাচ্ দিয়ে ভেতরে উপস্থিত হ'ত—রেবতীর মার কাছে তার নতুন বাঁধা পালার কথা সবিস্তারে পাড়ত এবং দোরের আড়ালে, কিংবা উঠোনের ও-পাশে রেবতীর উপর তার প্রভাব কি রকম হচ্ছে তার খোঁজ রাখত। লোকটার বয়েস খুব বেশি হয় নি—এত দিন পালা বাঁধা নিয়েই ছিল, বোঝা গেল এবার তার মনে ঘর বাঁধবার তাগিদ জেগেছে। অবশ্য সে নিজে ছাড়া ভাল ভাবে কথাটা বুঝল রেবতীর মা, কিছু কিছু রেবতীও বোধ হয়। ক্রমে রেবতীর বাইরে আহার দিতে যাওয়া খুব কমে গেল, এবং সাধনের শুধু আহারের সময় ছাড়া অন্য

সময়েও ভেতরে আসার নানান রকম প্রয়োজন হয়ে উঠতে লাগল। এই সময়ে রেবতীর মা হঠাৎ বিসূচিকায় মারা গেল এবং তার মাস-দুয়েক পরে গোকুল বিন্দু বোষ্টমীর সঙ্গে মালা বদল করে তাকে বাড়িতে নিয়ে এল।

"গোকুল লোকটা ছিল যাকে বলে হ্যালাখ্যাপা গোছের। রেবতীর মায়ের সঙ্গে মালা বদল করে একটানা আঠার বছর ঘর করে এসেছে, এর মধ্যে একটা মেয়ে হয়েছে এই পর্য্যন্ত জানে; কিন্তু সে যে বড় হয়েছে এবং তার বড় হওয়ায় শুকনো-পা সাধনের বাড়িতে আসা বেড়েছে এসব তার চোখে পড়ে নি। বিন্দুকে আনার পর ব্যাপারটা সম্বন্ধে তার হঠাৎ চৈতন্য হ'ল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে চৈতন্য হ'ল না! সাধন যে রেবতীর জন্যই শুকনো পায়ের উপর উপদ্রব করছে এটা সে টের পেল না। তার মনে হ'ল বিন্দুর আসবার পর থেকেই সাধনের গতিবিধির মধ্যে এই পার্থক্যটুকু এসেছে। এই ভ্রান্তি থেকে জটিলতার আরম্ভ হল!

"সংক্ষেপে বলতে গেলে, সাধনের বাড়িতে আসা অল্প অল্প করে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বিন্দু বোষ্টমী হয়ে গেল ভীষণ রকম পর্দা-নশীন। শেষে এমন পর্যন্ত হ'ল যে গোকুল বাইরে গেলে বাড়ির দোরে শেকল উঠতে লাগল।....

"এক দিন গোকুলের কাজ ছিল দূরে কোথায়। যথারীতি শেকলের ওপর সেদিন একটা তালাও ঝুলিয়ে গিয়েছিল দোরে,—সন্ধ্যের সময় এসে তালা খুলতে যাবে, হঠাৎ খেজুরগাছের মাথায় একটা খসখসে আওয়াজ শুনে নীচে গিয়ে দাঁড়াল, স্পষ্ট বুঝতে পারলে ওপরে এক জন লোক; ডাকলে, 'কে?... নেমে এস।'

"সাধন আস্তে আস্তে নেমে এসে সামনে দাঁড়াল। গোকুল একটু

মাত্রও বিস্মিত হ'ল না। প্রশ্ন করলে, 'খেজুরগাছে যে, এই সন্ধ্যেয় ?'

"সাধন একটু কাঁপা গলায় বললে, 'শিউলি আজ নতুন গাছ কেটেছে—দেখছিলাম রস হ'ল কি না।'

"গোকুল বললে, 'আমি আসল কথাটা বলব ? তুমি অন্য যায়গায় রসের সন্ধান পেয়েছ। আজ সমস্ত দিন দেখা হওয়ার সুযোগ হয় নি, তাই এই সন্ধ্যেয় গাছে চড়ে....'

"সাধন ধরা পড়ে স্বীকার করে ফেললে। গোকুলের পায়ের ওপর বসে বললে, 'আমি পঙ্গু, কিন্তু একেবারে নির্গুণ নয়, গোকুল-দা ; তুমি দাও আমায় রেবতীকে, তাকে আমি সুখে রাখব।'

"গোকুল হেসে উঠল ; বললে, 'এখনও মিথ্যে বলছ রেবতীর কথা তুলে ?—আমায় বোঝাতে চাও যে তুমি রেবতীর টানেই'....সঙ্গে সঙ্গেই একটু কি ভেবে নিয়ে গলা নরম করে বললে, 'তা বেশ, খেজুরগাছের কাঁটাও যখন তোমার কাছে তুচ্ছ, তখন নিশ্চয় তুমি ভালবাস আমার মেয়েকে। চল,ভেতরে চল,বিয়ের কথা খেজুরগাছতলায় দাঁড়িয়ে হয় না।'"

অক্ষয় একটু চুপ করিয়া বাহিরের দুর্যোগটা যেন ভাল করিয়া অনুভব করিয়া লইল, তাহার পর আরও একটু গুটাইয়া বসিয়া বলিল, "ক্রমে বেড়েই চলছে দেখছি যে।"

তারাপদ প্রশ্ন করিল, "তার পর ?"

অক্ষয় বলিল, "তার পর আর কি ? বৈরিগীর বাড়িটা একটেরেয় বলে সে দিন কেউ বুঝতে পারে নি, পরদিন সকালেই টের পাওয়া গেল গোকুল বৈরিগী তিনটে খুন করে উধাও হয়েছে। অবশ্য ধরা পড়ে কিছু দিন পরেই।....সাধনের ঘাড়টা ছিল মচকান, লোকশ্রুতি যে পরের দিনই একটা দমকা হাওয়া উঠে খেজুরগাছের মাথাটা ঐরকম করে মুচড়ে দিয়ে যায়।"



তুমি অন্ত জায়গায় রসের সন্ধান পেয়েছ।

সুধেন খুব অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ যেন সংবিৎ পাইয়া প্রশ্ন করিল, "রেবতীকেও খুন করলে? সে কি করেছিল?"

অক্ষয় হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "রেবতীর জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদল বলে

তাকে খুন করাই যে বেশি অন্যায় হয়েছিল এমন তো নয়; বিন্দুরই বা দোষ কি? সাধনেরই বা কি এমন অন্যায় হয়েছিল?"

সুধেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, সে কথা বলছি না....মানে....থাক্, তোমার বৈরিগীর ভিটের পরবর্তী কি ইতিহাস যেন বলতে যাচ্ছিলে তাই বল।"

অক্ষয় বলিতে লাগিল, "বৈরিগীর ভিটেকে সেই থেকে সবাই এড়িয়ে চলে। পাড়ার জীবন্ত বাড়িগুলো থেকে দূরে, নিজের কাহিনী বুকে করে বৈরিগীর ভিটে পড়ে আছে, না ঘাঁটাও কিছু বলবে না, ঘাঁটাও, এমন কিছু একটা অভিজ্ঞতা দেবে যা সহজে ভুলে উঠতে পারবে না। নানা প্রকার দেখে ঠেকে গ্রামের লোকে ছেড়ে দিয়েছিল। এমন সময় সেবার গরমের ছুটিতে দেশে ফিরে এসে এক দল তোমাদের আধুনিক ছেলে গ্রাম থেকে অন্ধ সংস্কার দূর করবার জন্যে একেবারে অন্ধভাবে মেতে উঠল। ঠিক করলে তারা ঐ বৈরিগীর ভিটের বুকের ওপর ষ্টেজ খাটিয়ে থিয়েটার করবে।

"গ্রামের প্রাচীন অভিজ্ঞ লোকেরা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললে। বললে, 'অন্ধ সংস্কার বল বা যা-ই বল লোকে চিরকালটা যা মেনে এসেছে —ভূত, প্রেত, উপদেবতা, হাঁচি, টিক্‌টিকি, বার, ক্ষণ—সবই মানা উচিত; দু-অক্ষর ইংরেজী পড়লেই সব মিথ্যে হয়ে যায় না।'

"কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। বার-ক্ষণের কথায় ছেলেরা ঠিক করলে সামনের শনিবারটাতেই তারা প্লে-টা করবে, সেদিন অমাবস্যাও আছে; আর টিক্‌টিকি স্বাধীনচেতা জীব, তাদের উপর তো হুকুম চলবে না, তবে থিয়েটারের সীন্ তোলা, সীন্ ফেলা তারা করবে হাঁচির সাহায্যে, ঘণ্টা দিয়ে নয়; পাঁচ ছ' জন ছোকরা এই জন্যে নস্যি আর কাঠি নিয়ে তোয়ের থাকবে। এরও যথারীতি রিহার্সাল আরম্ভ হ'ল।

"উপদেষ্টারা হাল ছেড়ে দিলে।"

"শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত কিছু লোক এদের দিকেও ঝুঁকল ;—কয়েক জন পার্টের লোভে, কয়েক জন আবার আধুনিক হবার লোভে বোধ হয়। কয়েক জন আবার এই জন্তেও বোধ হয় যে ভাল রকম খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল,—শিঙাড়া, কচুরি, লুচি, সন্দেশ, আলুর দম, আর ঢালোয়া চা। একজন ময়রা ডাকিয়ে বৈরিগীর ভিটের এক পাশেই এসব তৈরী করবার ব্যবস্থা হ'ল। জন তিন চার ছেলে এই দিকটা নিয়ে রইল,—জিনিষপত্র জোগাড় করা, তদারক করা—এই সবের জন্যে।"

অশ্বিনী বলিল, "আমিও একজন ছিলাম তার মধ্যে।"

অক্ষয় বলিল, "তাই তোমার অবিশ্বাসটা আরও বেশি।"

তারাপদ বলিল, "ফাঁকা বাহাদুরিতে একটা আরাম আছে কিনা...."

অক্ষয় বলিতে লাগিল, "দল যখন পুরু হয়ে উঠল, আরও কয়েক জন এল—সাহসী বলবে লোকে এই লোভে। জানই তো—ভিড়ের মধ্যে ভয় থাকে না। ঠিক হ'ল দুটো প্লে হবে, বেশ বড় দেখে, অর্থাৎ সমস্ত রাত ধরে ভূতের ভিটেয় নৃত্য করতে হবে, ভূতেরা যেন না দুয়ো পাড়তে পারে যে প্রথম রাত্রে একটু চেহারা দেখিয়ে সব পালাল। পালা ঠিক হ'ল 'চন্দ্রগুপ্ত' আর 'পাণ্ডব-গৌরব'।

"শনিবার সন্ধ্যে থেকে জায়গাটা বেশ গম গম করে উঠল। প্রথমে ভাবা গিয়েছিল লোক হবে না, ভূতেদেরই দেখাতে হবে প্লে-টা, কিন্তু ক্রমে এক এক করে অনেক লোক জুটে গেল। হোগলা দিয়ে একটা অডিটোরিয়াম করা হয়েছিল, সেটা উপচে বাইরে পর্যন্ত লোক জমে উঠল।

"ঠিক ন'টার সময় একেবারে আট-দশটা ছেলের হাঁচির আওয়াজের

সঙ্গে সঙ্গে কনসার্ট বেজে উঠল। বাইরের কয়েক জন ভূত-বিরোধী ছোকরা দর্শক তালি দিয়ে এদের অভিনন্দিত করতে যাবে, প্রবল একটা বাধা পড়ল ;—কনসার্ট বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটা জিনিস উঠল,—কোথাও কিচ্ছু নেই, একটা উৎকট রকমের দমকা হাওয়া। ঠিক কে যেন অডিটোরিয়াম আর স্টেজের ঝুঁটি ধরে একটা কড়া ঝাঁকানি দিয়ে, বৈরিগীর ভিটের পুরনো পাহারাদার সেই কাঁধ-ভাঙা খেজুর গাছটাকে জাগিয়ে দিয়ে আকাশ বেয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। একটা রীতিমত গোলমাল হ'ল অডিটোরিয়ামে। যারা বুদ্ধিমান তারা ব্যাপার দেখে পাংলা হ'ল! কিন্তু এদের বাহাদুরি দিতে হবে—কনসার্ট একবারও থামল না....”

অশ্বিনী বলিল, “তার কারণ সেটা ছিল গ্রামোফোনের রেকর্ড।”

অক্ষয় কথাটা কানে না তুলিয়া বলিল, “কনসার্ট থামলে হাঁচির আরও একটা গুরুতর আওয়াজ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ্‌সীন উঠল। হাঁচিটা আরও গুরুতর করবার অর্থ,—ভূতেই যদি দমকা হাওয়া হয়ে দেখা দিয়ে থাকে তো যত পারে দিক, এরা পেছপা নয়।....এরা যে কাদের ঘাঁটাচ্ছে তখনও টের পায় নি। এবার আর ঝড় উঠল না, কিন্তু যা আরম্ভ হ'ল কিছু দিন এখন মনে থাকবে বাছাধনদের।... ড্রপ্‌সীন উঠল।....তারাপদ, তোমার আলমারিতে ‘চন্দ্রগুপ্ত’ আছে? দাও তাহ'লে, ব্যাপারটা যেমন হয়েছিল সঠিক বর্ণনা করতে পারব।”

তারাপদ উঠিয়া আলমারি হইতে ডি-এল্‌-রায়ের বাঁধান গ্রন্থাবলী বাহির করিয়া আনিয়া অক্ষয়ের হাতে দিল। অক্ষয় ‘চন্দ্রগুপ্ত’ পালাটা খুলিয়া বাহির করিয়া বলিতে লাগিল, “ড্রপ্‌ উঠতেই একটা নদীর দৃশ্য। সিন্ধু নদ। সূর্যাস্তের সময়। সীনে নদীর জলের কাছটায় একটু চিরে তার মধ্যে গোল লাল রঙের একটা কাগজ অর্ধেকটা সাঁদ করিয়ে দেওয়া

হয়েছে,—মানে, সূর্য অর্ধেক অস্ত গেছে, বাকি কাগজটা টেনে নিলেই সূর্য্য একেবারে ডুবে যাওয়া হবে আর কি।

"সামনেই সেকান্দার, সেলুকাস আর হেলেন; হেলেন সেলুকাসের হাত ধরে দাঁড়িয়ে। তিন জনেই সূর্যাস্ত দেখছে।

"এই সময় একটা আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল। সূর্যের দরুণ রাঙা কাগজটা যেই আস্তে আস্তে টেনে নেওয়া হ'ল, স্টেজের কড়া গ্যাস-ল্যাম্পটা কয়েক বার দপ দপ করে হঠাৎ নিবে গেল।

"তোমরা বোধ হয় বলবে ব্যাপারটা কাকতালীয়-ন্যায় গোছের একটা কো-ইন্‌সিডেন্স মাত্র, কিংবা গ্যাস-ল্যাম্পগুলোর একটা দোষই এই যে ঠিক সময় বুঝে নিবে বসে থাকে। পরে সেই নব্যদের মধ্যেও ধীরে সুস্থে সেই কথাই হয়েছিল; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে অন্ধকারের ছায়া যেন সবার মুখ কালি করে দিলে। অডিটোরিয়ামে তো একটা ভীষণ হট্টগোল উঠলই, আর এদিকে স্টেজের ওপরও সব বীরপুংগবদের একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে হ'ল। মুখ ফুটে না বললেও কারুর যেন সন্দেহ রইল না যে, প্রথমটা অর্থাৎ দমকা হাওয়াটা ছিল যেন কারুর হুমকি, তাতে ফল না হওয়ায় সে-ই আবার এই মোক্ষম ঠাট্টার অবতারণা করেছে।—বাতাসে যেন একটা হি-হি-হি করে বিদ্রূপ-হাসির চাপা ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।....বাঃ, সূর্যাস্ত হ'লে অন্ধকার হ'য়ে যাবে না? তবে আর তোমরা সীনারি দেখাচ্ছ কি?

"ড্রপসীন ফেলে আবার আলো জ্বালা হ'ল। আর যাই হোক, হাঁচিটা যে ফললই এতে আর কারুর সন্দেহ রইল না। দ্বিতীয় বারও অবশ্য হাঁচি দিয়েই ড্রপসীন উঠল, তবে জোর অনেক কমে এসেছে। ওদিকে অডিটোরিয়ামও অর্ধেকের বেশি খালি, যারা আছে তারা খুব গা ঘেঁষে ঘেঁষে ভয়ের নেশায় উৎসুক ভাবে বসে আছে।

"যাক্, প্লে আরম্ভ হ'ল। সেকান্দার বলে যাচ্ছে (অক্ষয় বইয়ের দিকে চাহিল), 'সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি।'

"এই পর্য্যন্ত বলে সেকান্দার অডিটোরিয়ামের গ্যাস-ল্যাম্পের দিকে চেয়ে, চোখ মুখে যতটা সম্ভব আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সত্যিই কিছু একটা দেখেছে। প্রথমটা সবাই ভাবলে সেকান্দার জেশ্চার-পশ্চার দেখাচ্ছে। কেষ্টা, যে সেকান্দারের পার্ট নিয়েছে, তার আবার ওদিকে একটু বাড়াবাড়ি ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল কেষ্টার হিসেবেও বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রম্প্টার তাগাদা দিতে লাগল, 'এবার বল্—'প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি....প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি'—বল্ না কেষ্ট—'প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ'—বল্....হয়েছে তো পশ্চার, মস্ত বড় পশ্চারী তুই—শিশির ভাদুড়ী!....'

"প্রম্প্টার ছাড়াও উইংসের দুই দিক থেকে ঘন ঘন তাগাদা দিতে লাগল; অডিটোরিয়ামেও তালি পড়ল; কিন্তু সেকান্দারের মাথায় যে কি 'বিস্মিত আতঙ্ক' ঢুকে গেছে, না চোখ ফেরায়, না পার্ট বলে। প্রম্প্টার শেষকালে হেরে বললে, 'সেলুকাস, তাহ'লে তুমি বল, 'সত্য সম্রাট।'....ও পশ্চার দেখাক্।'

"সেলুকাস এমন ভাবে ফ্যালফ্যালিয়ে ফিরে চাইলে যেন কথাটা বুঝতেই পারে নি, তার পর হঠাৎ সামলে নিয়ে বললে, 'সত্য সম্রাট।'

"এবার সেকান্দার বল, '....কোথাও দেখি তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে'....বল্ না কেষ্টা, কি জ্বালা!'



মাথায় যে কি একটি বিস্মিত আতঙ্ক ঢুকে গেছে···

"কেষ্টার যেন হঠাৎ খেয়াল হ'ল ; প্রম্পটারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে, 'কি বলব ?'

"অডিটোরিয়ামে আবার তালি পড়ল। 'ভূতে পেয়েছে, ড্রপ ফেলে

দাও' বলে একটা সোরগোল উঠল, এবং আরও এক দল দর্শক পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ায় অডিটোরিয়ামটা যেন খাঁ-খাঁ করতে লাগল। প্রম্প্টার ভেংচি কেটে বললে, 'কি বলব! কচি খোকা!....বল্—কোথাও দেখি তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু করে....'

"কেষ্টা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আবার প্রশ্ন করলে, 'কেন?'

"আবার একচোট হাততালি। সেই গোলমালে প্রম্প্টার প্রাণের আক্রোশ মিটিয়ে বললে, 'শখ করে থিয়েটার করতে এসেছ যে, তোমার গুষ্টির পিণ্ডি, আর কেন!'

"পাশ থেকে সেলুকাস বললে, 'বাঃ, আমরা থিয়েটার করছি যে, বৈরিগীর ভিটেয়, মনে নেই তোর?' উইংসের দুই পাশ থেকে দাবড়ি খেয়ে সে চুপ করে গেল।

"কেষ্টার এবার যেন ঘুম ভাঙল, একটু নড়েচড়ে বললে, 'ও! বুঝেছি, বল্।'

"গড়গড়িয়ে বেশ খানিকটা বলে গেল, প্রম্প্টেরও বড় একটা অপেক্ষা করলে না। শেষকালে সেলুকাসের মুখের পানে চেয়ে লেখামত প্রশ্ন করলে, 'পুরুকে বন্দী করে আনি যখন—সে কি বললে জান?'

"সেলুকাসের অল্প পার্ট, তারই মধ্যে গোলমাল করে ফেলে বললে, 'কি বললে রে?'

"তার পর দাবড়ানি খেয়ে শুধরে নিলে, 'কি সম্রাট?'

"কেষ্টা-সেকান্দার খানিকটা হাঁ করে রইল—প্রম্প্টিং যেন কানেই যাচ্ছে না। তার পর দু-বার কপালে চিন্তিত ভাবে হাত বুলিয়ে বলে উঠল, 'দাঁড়া, মনে পড়েছে—'আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর? সে নির্ভীক নিষ্কম্প স্বরে উত্তর দিলে, 'জামায়ের মতো....!,

'ড্রপ ফ্যাল, ড্রপ ফ্যাল,' বলে চারিদিক থেকে একটা রব উঠল। এবার স্টেজের মধ্যে থেকেও।

"খুব বেশি দরকারের সময় ড্রপ-সীন খুব বেশি বাগড়া দেয় এটা তোমরা সবাই জান; শূন্যে অনেক ওঠা-নামার পর শেষে পড়ল। তার পর স্টেজের ভেতরে যে নারকীয় গোলমালটা উঠল তাতে স্বয়ং ভূতেদেরও লজ্জা পাবার কথা। কেষ্টা আর গজানন, যারা আলেকজাণ্ডার আর সেলুকাসের পার্ট নিয়েছিল, তাদের তো সবাই খুন করতে বাকি রাখলে। সে বেচারীরা মুখ চুন করে এক ধারটিতে গিয়ে বসে রইল।

"কয়েকজন বয়স্থ লোকও ভেতরে ঢুকে পড়ল। বললে, 'বাপু, সাধ মিটল তো? এখন ভালয় ভালয় পাত্তাড়ি গুটিয়ে সব ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল। রাত্তিরে তাঁদের নাম করতে নেই, কিন্তু আগাগোড়া কোথা থেকে ব্যাপারটা হচ্ছে তা নিয়ে এখনও আছে সন্দেহ তোমাদের মনে? শেষকালে পুরু যে বললে, 'জামাইয়ের মত ব্যবহার চাই'—বুঝতে পারছ না, ওটা গোকুলের মেয়ে রেবতীর সম্পর্কে সাধন বৈরিগীর মনের কথা, যা নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা হ'ল এই ভিটের ওপর....তোমরা কি চাও আরও স্পস্ট করে বুঝিয়ে দেবেন তোমাদের ওঁরা? তা ভিন্ন শোনাবে কাদের তোমরা বাপু? মুখ বাড়িয়ে একবার অডিটোরিয়ামটা দেখে এস তো!'

"যজ্ঞের পাণ্ডা সতীনাথ ও আর কয়েক জন জিদ ধরে বসল তারা করবেই থিয়েটার, দু-জন আবোল-তাবোল বকেছে বলে কিছু ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে যায় না। সতীনাথ এগিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে বললে, 'আর ভূত যদি থাকেই, আর তাদের বুকের পাটা থাকে তো তারা সামনে এসে যা করবার....'

"ব্যস্, এই পর্যন্ত বলেছে এমন সময় এক ব্যাপার ঘটল যা কেউ স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারে নি। বিরূপাক্ষ চাণক্য সেজেছিল, হঠাৎ

গ্রীনরুমের দিক থেকে এসে হাজির। সে কি উগ্র মূর্তি! চাণক্যের নেড়া-মাথার ওপর টিকিটা ফেঁপে রয়েছে, গম্ভীর মুখ, রক্ত জবার মত চোখ দুটো গর্তের মধ্যে যেন জ্বলছে। সামনে দাঁড়িয়ে শিশির ভাদুড়ীর মত মাথা নেড়ে নেড়ে টিকিতে তা দিতে লাগল। ঠিক যেন কোন কিছুর ভর হয়েছে, মূর্তি, হাব-ভাব দেখে সবাই একটু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বয়স্থদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ হিসেবে এসেছিল নবীন হাজরা—ডাকসাইটে ভূতের ওঝা; চাণক্যের পানে চেয়ে কপালে হাতজোড় করে বললে, 'ঠাণ্ডা হও বৈরিগা বাবা, এরা ছেলেমানুষ, করে ফেলেছে একটা ভুল....'। সতীনাথ কি বলতে যাচ্ছিল, বিরূপ ওদের দিকে চেয়ে একেবারে চীৎকার করে উঠল, 'নীচের আজ স্পর্ধা—ব্রাহ্মণ-বৈরিগাকে দেখে একটা শুষ্ক প্রণাম করতেও হাত ওঠে না?....যাও, আমার ছায়া মাড়িও না, আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে, আমি দুর্ভিক্ষ, আমি মড়ক.... এখনও গেলে না!....কাত্যায়ন!....কাত্যায়ন! নিয়ে এস তো রামদা-টা, আমি কোপাই সবগুলোকে, আর তুমি বাকিগুলোর ঘাড় মটকাতে থাক—ঐ খেজুরগাছটার মতন করে।....কোথায় কাত্যায়ন?....আচ্ছা দা না থাকে, স্টেজ-খোঁড়া ঐ শাবলটাতেই হবে...'

"ছুটে নিতে যাবে শাবলটা সবাই তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেললে। তার মধ্যে থেকেই কী সে আফসানি। জ্বলন্ত ভাঁটার মত চোখ, পরচুলটা পিছলে গিয়ে টিকির গোছাটা মুখে এসে পড়েছে, গায়ে এসে পড়েছে এক অসুরের ক্ষমতা; ধরে কি রাখা যায়? আর মাঝে মাঝে সেই চীৎকার, 'কাত্যায়ন! কোথায় গেল কাত্যায়ন?....নিয়ে এস তো শাবলটা, আমি দেখি একবার এদের....'

"এক উৎকট কাণ্ড, এখনও মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!...."

অক্ষয় চুপ করিল। বেশ বুঝা গেল এই অস্বাভাবিক গল্প বলিতে

তাহার স্নায়ুগুলা অতিরিক্ত উত্তেজিত হইয়া গিয়াছে। বাহিরে সেই দুর্যোগ; রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও মাতিয়া উঠিয়াছে। সব মিলাইয়া বৈরিগীর ভিটার তাণ্ডব-চিত্রটা যেন সবার চোখের সামনে স্পষ্ট করিয়া দিতেছে। ভিতরে সমস্ত ঘরটা থম্‌থম্ করিতে লাগিল। দুয়ার-জানালার উপর একটা প্রচণ্ডতর আঘাত আসিয়া পড়ায় সবাই—এমন কি অশ্বিনী পর্যন্ত—চমকিয়া উঠিয়া একবার সেইদিকে চাহিল। রমেন নিতান্ত অল্প কথার লোক। এতক্ষণ বালাপোষে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুধু নাক আর মুখটুকু বাহির করিয়া শুনিতেছিল, চমকিয়া উঠায় বোধ হয় নিজের দুর্বলতাটা ঢাকিয়া লইবার জন্য ধীরে ধীরে টীকা করিল, "গঞ্জিকা!"

"গাঁজা?"—বলিয়া অক্ষয় চটিয়া উঠিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, অশ্বিনী শান্তভাবে বলিল, "তুমি চোটো না অক্ষয়, যে আসল ব্যাপারটা জানে সে কখনও 'গঞ্জিকা' বলবে না।"

অবিশ্বাসী অশ্বিনীর মুখে এ ধরণের কথা শুনিয়া সবাই বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিল আরও নূতন কিছু শুনিবার জন্য। তারাপদ প্রশ্ন করিল, "তুমি জান নাকি আসল কথাটা? অর্থাৎ ঠিক কার বা কিসের প্রভাবে...."

অশ্বিনী গম্ভীর ভাবে সিগারেট টানিতে টানিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হু। সে শুনলে...."

সকলে এক সঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "কি? কি বল তো...."

অশ্বিনী সিগারেটে একটা দীর্ঘতর টান দিয়া, ধুঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "গঞ্জিকা নয়, সিদ্ধি।"

সবাই একটু থ হইয়া গেল, সে-ভাবটা সামলাইয়া লইয়া অক্ষয় আবার উগ্রভাবে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, অশ্বিনী শান্তভাবে হাত

উঁচাইয়া তাহাকে বিরত করিয়া বলিল, "থাম না ভাই, আমি নিজের হাতে কচুরির পুরের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলাম ; ও জিনিস পেটে গেলে একবার যা ঝোঁক মাথায় ঠেলে উঠবে, তা থামায় কার সাধ্যি! না হয় একবার দেখই একদিন পরখ করে।....শুধু দুঃখু রয়ে গেল থিয়েটারটা শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল না ওরা,—চন্দ্রগুপ্ত, তার মা মুরা, ছায়া, এ্যান্টিগোনাস্—এরা সব তো বাকিই রয়ে গেল...."

১৩৪৭]

মুরারি ডাক্তারের ঠিকেদারি

[১]

শেষ পর্যন্ত মুরারি ডাক্তারকে ডাকাই স্থির হইল।

মেয়ের মনটা শুধু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল। বলিল, "ওপাড়া থেকে সাধন ডাক্তারকে ডাকলে ভাল হ'ত না তারু কাকা? অবিশ্যি মুরারি কাকা খুবই ভাল, কিন্তু আমার যেমন অদেষ্ট...."

তারিণী খুড়ো হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আর সেদো এসে তোর অদেষ্ট পালটে দেবে? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন জানিস?"

তিনি নিজেও জানেন না বলিয়া আবার হুকা টানিতে লাগিলেন।

স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিল, "তখন থেকে সাধন-ডাক্তার, সাধন-ডাক্তার যে করছে, ওকে জিগ্যেস্ করুন তো তারু কাকা, সাধন ডাক্তারের খাঁই আর হ্যাপা মেটান কি চাড্ডিখানি কথা? কলেজের পাশ-করা ডাক্তার, বোধ হয় এমন একটা ওষুধের নাম করে বসবে, রুগী ছেড়ে ছোট কলকাতা ওষুধ খুঁজতে। ও যাবে কাছা-কোঁচা এঁটে? আমার দ্বারা তো হবে না, বলে নিজের শরীর নিয়েই প্রাণান্ত। আর এই কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করা, বছরে বছরে একটি করে বেড়েই চলেছে, নিজেদের পাড়ার ডাক্তারকে আমাদের মত ছাপোষা গেরস্থর অবহেলা করা চলে? আপনিই বলুন না কাকা।"

দোরের পাশ হইতে উত্তর আসিল, "চুপ করতে বল, আর ছেলে-

গুলোর অকল্যাণ কামনা করতে হবে না।....আসুন তা হ'লে মুরারি কাকা, আমার কপালে যা আছে হবে।"

তারু খুড়ো বলিলেন, "ভালই হবে বাছা। মুরারির অনেক গুণ, রোগী হাতে তুলে দিলাম, তারপর নিশ্চিন্তি; আর ওসব পাশ-করা ডাক্তারদের কি যে বলে, ইয়েও অনেক—রোগী দেখবি, রোগী দেখ্, তা নয়, তার পেচ্ছাব যাচ করিয়ে আনাও, তার রক্ত দেখব—আর লোকটা বেজায় অর্থপিশাচও বাছা, আমার নিজের ভোগা কিনা; সে সব কথা তুলতে হ'লে...." কি ভাবিয়া আর না তুলিয়া খুড়ো আরও ঘন ঘন হুঁকা টানিতে লাগিলেন।

দোরের পাশ থেকে উহারই মধ্যে একটু উষ্মার সহিত আপত্তি হইল, "তা হ'লে উনি যেন একাই আসেন, আমি ভলন্টিয়ার-ছোঁড়াদের দরজা মাড়াতে দোব না, তা বলে দিচ্ছি....অলুক্ষুণে!„

প্রত্যেক গ্রামেই দু'একজন লোক থাকে—প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ—সমস্ত গ্রাম যাহাদের মৃত্যুর জন্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকে।—লোভের বিষয় শ্রাদ্ধের দিনটি। বসিয়া বসিয়া সবার চোখের সামনে সে টাকা করিতেছে, খরচের বেলায় কিন্তু হাতটান। যেমন প্রায়ই হইয়া থাকে এসব ক্ষেত্রে, উত্তরাধিকারীদের হাত বেশ দরাজ। এখন বিশেষ সুবিধা পাইতেছে না, কিন্তু খরচের জন্য যে তাহাদের হাত নিস্‌পিস্ করে, নানা ছুতানাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের রাসটানা হাতের প্রথম খরচ শ্রাদ্ধটা তারা ভাল করিয়া করিবে—গ্রামের সে একটা মস্ত বড় আশা ও উৎসবের দিন।

পরেশ চক্রবর্তী কতকটা এই ধরণের মানুষ। তাঁর পরমায়ু লইয়া গ্রামের চেয়ে আবার তাঁর বাড়ির মধ্যে বেশি উৎকণ্ঠা, কেন না, উত্তরাধিকারী জামাই। অপুত্রক শ্বশুরের কন্যা বিবাহ করিয়া লোকটা

খুব একটা দাঁও মারিল বলিয়া আশা করিয়াছিল; কিন্তু ঐ রকম অস্থি-চর্মসার শরীরের মধ্যে পরমায়ুর বহর দেখিয়া তাহার নিজের পরমায়ু নিত্য হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বছরকে বছর ঘুরিয়া যাইতেছে, অসুখে পড়িবার নামগন্ধ নাই! যদি বা হইল একটু কিছু, একটা দিন উপবাস দিয়া সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা। ক্রমেই যেন ধৈর্য রাখা দায় হইয়া উঠিতেছিল। মুখ ফুটিয়া তো কিছু বলা যায় না, শুধু গুমরিয়া মরা।

এইবার যেন একটু কাবু করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। জামাই চিকিৎসার পরামর্শের জন্য পাড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। আহা, শ্বশুর মানুষ, যদি পরমায়ু থাকে তো আলাদা কথা, না হইলে ভগবান্ করুন যেন অল্প ভোগের উপর দিয়াই নিষ্কৃতি পান। গুরুজন....

শুধু মেয়ের মনটি বড় ভাল। বুড়ো বাপ, চার চারটে দিন কখন তাঁহাকে কেহ বিছানায় পড়িয়া থাকিতে দেখে নাই। পরিচর্যা করিতে করিতে কেবলই বাহিরে গিয়া চোখ মুছিতেছে।

মুরারি ডাক্তার আসিলেন। বেশ গোলগাল চেহারা, মুখে প্রসন্ন হাসি। কথাবার্তা চলাফেরার মধ্যে সকলের সঙ্গে একটি নিবিড় আত্মীয়-তার ভাব মাখান এবং সেই জন্য গলার আওয়াজটা খুব মুক্ত। আর সব অবস্থাতেই এক ভাব,—নিমন্ত্রণ-বাড়িতেই হোক বা রোগীর ঘরেই হোক; রোগের প্রথম অবস্থাতেই হোক, মাঝ অবস্থাতেই হোক, শ্বাসের সময়েই হোক—গলার সেই এক রকম স্বর, সেই অকৃপণ হাস্য, সেই নির্বাধ মুখরতা....

সদানন্দ লোক, সব তাতেই পাওয়া যায়; তবে রোগের সময় লোকে একটু এড়াইয়া চলে। মুরারি ডাক্তার একবার ঢুকিলে নাকি শ্রাদ্ধের

লুচিটি পরিবেশন না করা পর্যন্ত ফেরেন না। গ্রামে 'মুরারি ডাক্তারের ঠিকে' বলিয়া একটা চলতি কথাই দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বাড়ি ঢুকিয়াই একগাল হাসিয়া বলিলেন, "এই যে বাবাজী, ভাল তো? পরেশদা কোন্ ঘরে? নিঝুম হয়ে পড়ে আছেন? তা আর এমন অন্যায় হয়েছে কি বাপু? তিন কুড়ি বয়েস হ'ল, এখন কি আর লাফালাফি করে বেড়াবেন?....দে বিন্দু, একটা আসন দে দিকিন্, এইটুকু আসতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমারও তো হ'ল—আর কি, এই আশ্বিনটা পেরুলেই পঞ্চাশ বছর।"

বিন্দুবাসিনী রকে আসনটা পাতিয়া দিয়া চোখ দুইটা মুছিয়া বলিল, "আজ চার দিন থেকে শয্যেগত, ফিরে পাব তো বাবাকে মুরারি কাকা?"—জোরে অশ্রু নামিল।

মুরারি ডাক্তার বাড়ি কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "শুনছ পাগলীর কথা?....ধর্ যদি নাই পাস। পারবি চিরকাল ধরে রাখতে? মুরারি কাকার হাতে তো পরমায়ু নেই, তবু না হয় জোড়াতাড়া দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলাম, কিন্তু ক' দিন?"

তারিণী খুড়ো প্রবেশ করিলেন।

"এই যে খুড়োও এসেছ।....বিন্দু বলে—'ফিরে পাব তো বাবাকে?' তাই বলছিলাম—বলি, মুরারি কাকা ওষুধই দেবে, পরমায়ু তো দেবে না? ওঁর যদি তলবই এসে থাকে...." হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তারিণী খুড়ো বলিলেন, "পরমায়ু স্বয়ং ভগবানই দিতে অপারগ, তা তুমি-আমি কোন ছার। সেই ভাগবতে সেইখানটাই বলেছেন না?....নে বিন্দি, একটু তামাক সেজে আন্ দিকিন।....দেখলে নাকি দাদাকে?"

"না, হচ্ছে কি না, তাড়াতাড়ি কিসের? তামাকটা আসুক, একটু

বেদম হয়ে পড়েছি। তোমার শরীরটা কেমন যাচ্ছে খুড়ো?....হ্যাঁ বাবাজী, তোমার সেই কাজটার কি হ'ল, শুনলাম একটু আশা হয়েছে...."

"আর আশা, নবীনদা রোজই তাগাদা দিচ্ছে, চল একবার সায়েবের কাছে নিয়ে যাই, নতুন সীজ্‌ন্‌টা সুরু হয়েছে; তা দেখুন না, ঠিক মোকা বুঝে শ্বশুর ঠাকুরের এই...."

"তা বটে। তা এ দিকটা চুকে গেলে, তুমি কর একবার দেখা, তোমাদের হ'লে আবার আমাদের ছেলেপুলেগুলোর একটা রাস্তা খুলবে।"

তামাক আসিল; আরও সব নানা রকম আলোচনা হইল। তারপর ধীরে সুস্থে মুরারি ডাক্তার গিয়া রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ পরেশ চক্রবর্তী ও-পাশ ফিরিয়া আচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া আছেন। মুরারি ডাক্তার মুক্তকণ্ঠে ডাক দিলেন, "দাদা!"

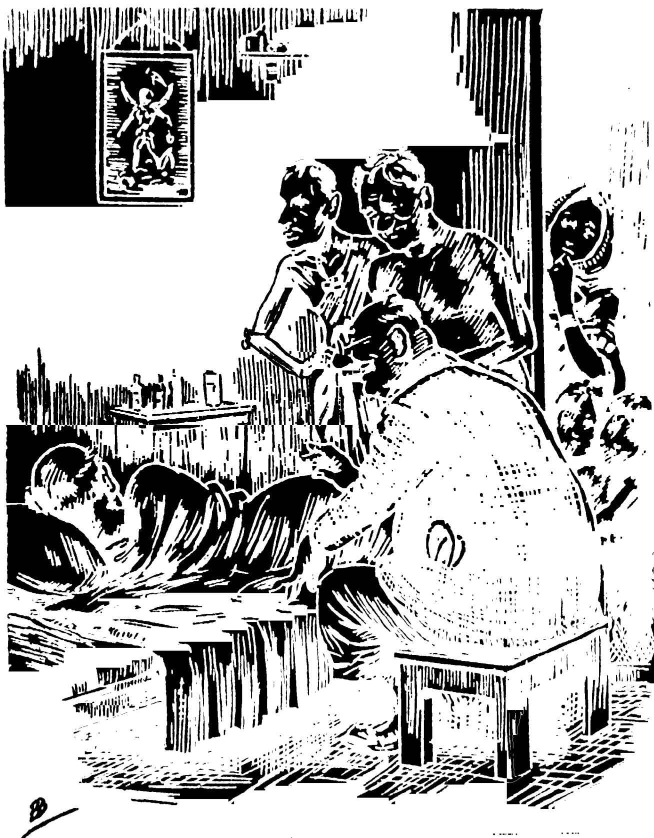
রোগী একটু চকিত হইয়া উঠিয়া পাশ ফিরিলেন এবং একটু বিহ্বল ভাবে চাহিয়া থাকিয়া বিছানার পাশে আঙুল কয়টা চাপিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "বসো।"

মুরারি ডাক্তার নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন, "বাল, মতলবখানা কি?"

বৃদ্ধ উত্তর স্বরূপ উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

"আজ্ঞে না, সিটি এখন হচ্ছে না, মেয়ে জামাই বড্ড ছেলে মানুষ।.... উনি ও দিকে টানছেন তো এদিকে মুরারি ডাক্তারও এসে ধরলে।....দাও দিকিন্ হাতটা।"

তারিণী খুড়ো আর বিন্দুর দিকে চাহিয়া নিজের রসিকতায় উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিলেন। দরজার কাছে ছেলেমেয়ে কয়টি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিছু একটা মজার কথা হইয়াছে ভাবিয়া তাহারাও পরস্পরের মুখ



"বাবা"

চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল। বিন্দু তারিণী ঘোষালের হাতটা একটু স্পর্শ করিয়া বাহিরে ডাকিয়া চাপা গলায় বলিল, "কাকা, ও-রকম করে বলছেন....রোগীর মন...."

তারিণী খুড়ো একটু হাসিয়া বলিলেন, "শোন কথা বিন্দুর! চিরটাকাল 'কাকা কাকা' বলে ঠাট্টা করে এসেছে, আজ আর বলবে না? কি রকম মিষ্টি শুনতে হ'ল বল্ দিকিন?—বুড়ো বয়সের একটা সাধ; সেদো, কি বাইরের কোন ডাক্তার এসে বলতে পারত অমন প্রাণ খুলে?....আর একটা টিকে ভেঙে দে তো কলকেটাতে।....মুরারি এসে হাত ধরেছে, নিশ্চিন্তি, আর তোকে এ দিকে দেখতে হবে না—ছেলে-মেয়েগুলোর দিকে একটু নজর কর্ এবার।"

বিন্দু টিকা আনিয়া কলিকায় ভাঙিয়া দিতে দিতে বলিল, "আশীর্বাদ কর ভালর দিকেই যেন নিশ্চিন্তি হ'তে পারি কাকা; সব কথাগুলোই কেমন যেন অমঙ্গল অমঙ্গল ঠেকছে কানে...."

মুরারি ডাক্তার হাসি মুখে বাহির হইয়া আসিলেন; বলিলেন, "কই?—ব্যাপার তো কিছুই দেখলাম না, বুকে একটু সর্দি বসেছে, তারই তাড়সে...."

বিন্দু ব্যস্ত ভাবে বলিল, "সেরে যাবেন তো কাকা?"

"সেরে যাবে না তো যাবে কোথায় বল্?—কি, হয়েছে কি খুড়োর? ভাবিস নি রে পাগলী—বুড়ো শীগ্‌গির নড়ছে না। এখন আরও দিন কতক মেয়ে-জামাইয়ের সেবা খেয়ে তবে...."

"তাই আশীর্বাদ কর কাকা"—হাসিতে মেয়ের গালে চোখের অশ্রু-বিন্দু কয়টি ঝরিয়া পড়িল। দুয়ারের কাছে জামাইয়ের মুখের দিকে কেহ লক্ষ্য করিল না; না করিয়া ভালই করিল।

চিকিৎসার মত চিকিৎসা আরম্ভ হইল। মুরারি ডাক্তারের ঐ গুণ; সাবু তোয়ের করা থেকে দাগে দাগে ঔষধ খাওয়ান পর্যন্ত সবই প্রায় নিজের হাতে। বিন্দু মৃদু আপত্তি করিল, কিন্তু সে আপত্তি টিকিল না। মুরারি ডাক্তার বলিলেন, "তুই সেদিনকার মেয়ে, হাওয়ার কাপড় পরে ঐ জামতলায় পুতুল খেলা করতিস, তুই রুগী সেবার কি বুঝবি? শেষকালে মেরে ফেল্ বুড়োকে।"

অবশ্য এ কথার পর আর কোন মেয়েই অগ্রসর হইতে পারে না। সে যোগাড়-যন্ত্র করিয়া দিয়া, রোগীর মাথায় হাত বুলাইয়া, হাত পা টিপিয়া মুমূর্ষু পিতার সেবার সাধ মিটাইতে লাগিল।

সমস্ত দিন জোর চিকিৎসার পর সন্ধ্যার সময় রোগীর পরিবর্তন দেখা দিল; অবশ্য খারাপের দিকে। একেবারে নিঝুম মারিয়া পড়িয়া না থাকিয়া রোগী মাঝে মাঝে চাড়া দিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং কথার মধ্যে একটু একটু অসংলগ্নতা আসিতে লাগিল।

বিন্দুর কান্না দেখিয়া মুরারি ডাক্তার আদরের ধমকানি দিয়া বলিলেন, "অসুখ হয়েছে, একটু আধটু বেফাঁস না বলে কি তোর বাপ এখন রুক্মিণীহরণের কথকতা করবে আশা করিস্? কচি খুকীর বাড়া হ'লি যে তুই বিন্দি..."

বাহিরে আসিয়া জামাই, তারিণী খুড়ো প্রভৃতির সামনে নিজের বুকের উপর দুইটা মুঠা রাখিয়া হাসিয়া ঈষৎ চাপা গলায় বলিলেন, "দুটো বুকই সর্দিতে ঝাঁঝরে গেছে।" সঙ্গে সঙ্গে মুঠার মধ্য হইতে দুই বুড়া আঙুলকে মুক্ত করিয়া নাড়িয়া বলিলেন, "আশা বড় একটা নেই, দেখে নিও আমার কথা।"



"আশা বড় একটা নেই, দেখে নিও আমার কথা"।

জামাই চিন্তিত ভাবে বলিল, "আজ রাত্তিরটা...."

মুরারি ডাক্তার হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও যে বিন্দু হ'লে দেখছি বাবাজী,—রাত কাটবে না কি রকম? পরেশদা'কে চেন

না—এখন ক'রাত....” আবেগের মাথায় বিন্দুর কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সচেতন হইয়া সহজ গলায় বলিলেন, কোন ভাবনা নেই, আমি ওদের সেবাসমিতির দু'জন ছেলেকে বলে এসেছি....”

বিন্দু বাপের বিছানা হইতে উঠিয়া দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, “না, আমি কখনই তাদের আসতে দেব না। ও অপয়ারা একবার ঢুকলে না নিয়ে বেরোয় না। এমনি সবাই সোনার ছেলে স্বীকার করি, কিন্তু সেবা করবার জন্যে রোগীর ঘরে ঢুকলে....”

জামাই বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, “পালা করে জাগতে হবে।”

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর হইল, “আর পালা করতে হবে না, আমি একাই জাগব। না, কখনও আমি ঢুকতে দোব না ওদের....”

মুরারি ডাক্তার বলিলেন, “ওই করে তুইও শুদ্ধু পড়্, আমি দু'টো নিয়ে নাজেহাল হই। বাপের তা হলে খুব সেবা হবে!”

বিন্দু চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে ভাঙা গলায় বলিল, “আমি কিন্তু দু'জনের বেশি আসতে দোব না।”

অবশ্য দু'জনই আসিল না। বুড়ো পরেশ চক্রবর্তীর অসুখ তায় আবার মুরারি ডাক্তার দেখিতেছে। একদিনেই নিউমোনিয়ায় দাঁড় করাইয়াছে, পাড়ায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বারোয়ারীর চণ্ডীমণ্ডপে দলাদলির নেতারা অনেক ছিলিম তামাক পোড়াইয়াছে, আজ রাত্রি হইতে পাড়ার শখের যাত্রাপার্টি কীর্তনের মহলা দিবে—শ্রাদ্ধ-বাসরের জন্য। বয়স্থারা বলিতেছে, “আহা, লোকটা ছিল ভাল গো, দোষে গুণে। মেয়ে কাজ কি রকম করে দেখা যাক্!”

ছেলেদের শখের সেবা-সমিতি। দু'জনকে বলা হইয়াছিল, ওপরপড়া হইয়া চারজন আসিল। নিজেরাই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গাই দুইয়া খানিকটা দুধ জোগাড় করিয়া রাখিল। তাহার পর সমস্ত রাত তাসে, চায়ে, হল্লায়

কাটাইয়া দিল। অবশ্য সেবা, ঔষধপত্র চালাইল বিন্দু আর মুরারি ডাক্তার মিলিয়া। বিন্দু একবার বলিলও।

মুরারি ডাক্তার একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঃ, দুধের ছেলে, ওরা আবার সেবা করবে! একটা আমোদ; আমাদের বয়সই যে এটা!"

সকালে জামাই জাগিয়া উঠিয়া দেখিতে আসিলে বলিলেন, "আমি বললাম না তোমায় কালকে? আজ সকালেই একটা টাল গেছে, অবিশ্যি বিন্দিকে বুঝতে দিই নি; কিন্তু আর বসে থাকা চলে না, হাতে যেটুকু আছে করে কর্মে দেখতে হবে তো? আমি আসছি....হ্যাঁ হ্যাঁ, চা হয়ে গেছে খাওয়া; হীরের টুকরো ছেলে সব—কোন্ ভোরে গাই দুইয়ে চা করে, খাইয়ে তবে অন্য কথা।....আমি এই এলাম বলে, ওষুধের সব বলে দিয়েছি বিন্দুকে। কিছু ভাবতে হবে না তোমায়, তুমি বরং তারু কাকার সঙ্গে পরামর্শ করে ওদিককার যোগাড়যন্ত্র কর গে।"

দুয়ারের দিকে পা বাড়াইতেই সেবা-সমিতির ছেলে চারিটি আসিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি-জাগরণের ফলে মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু রক্তাভ, মাথার চুল ফুলিয়া ফাঁপিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। একজন আগাইয়া বলিল, "আমাদের কি এখন আর কোন কাজ আছে মুরারি কাকা?"

মুরারি ডাক্তার ঘুরিয়া বলিলেন, "বিস্তর কাজ; কাজের তো এখন সবই পড়ে। তবু আবার নিজের শরীরও দেখতে হবে তো? তোরা এক কাজ কর্, দুজন থাক্, দুজন চট্ করে দুটো ডুব দিয়ে মুখে কিছু দিয়ে চলে আয়,—পালাপালি করে।"

জামাইয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কাল সমস্ত রাত ছোঁড়াগুলো একটু চোখ বোঁজে নি গা! ওদের এই সব সময়ে একটু কাছে কাছে থাকাই তো দরকার। হাসি হুল্লোড়ের মধ্যে কোথা দিয়ে রাতটা

কাটিয়ে দিলে—একবার কি বুঝতে পেরেছিলে বাড়িতে রোগী রয়েছে একটা !”

কয়েক দিন হইতে ভবিষ্যতের গোলাপী স্বপ্নের মধ্যে দিব্য নিদ্রাটি হইতেছে। জামাই বলিল, “রামঃ, আমার তো আপনাকে দেখে তখন মনে পড়ল শ্বশুরঠাকুর অসুখে পড়ে।”

ছেলে কয়টি প্রশংসায় একটু লজ্জিত হইল। একজন একটু বেশি অগ্রণী, বলিল, “না, কাজ থাকে তো সবাই থেকে যাই। নাওয়া খাওয়া—সে তো পরের কথা।”

একজন একটু রুগ্ন গোছের; একটু যেন নিরাশার সহিত বলিল, “এখনই নেয়ে নেব?—তা হ'লে আজকে আর নাওয়ার দরকার হবে না মনে করছেন না কি?”

কথাটা কেহ বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। অগ্রণী ছেলেটি বলিল, “ও বলছে—ভগবান্ না করুন—পরেশ জ্যাঠা আমাদের আজই ছেড়ে যান তো আর একবার নাইতে হবে কি না....গোবিন্দর আবার ম্যালেরিয়া দেখা দেয় কি না মাঝে মাঝে।”

মুরারি ডাক্তার উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, জামাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “একবার দূরদৃষ্টিটা দেখ! আমেরিকায় জন্মালে এ সব ছেলে প্রেসিডেণ্ট হ'ত।....আজ সে ভয় নেই, তুই নেয়ে নিগে যা।....দেখেছ, কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। আমি চলি। ঠিক, আসল কথায় ভুলে যাচ্ছিলাম—আগে তোদের একজন সঙ্গে আয় দিকিনি আমার, একলা সামলাতে পারব না।....হ্যাঁ, আর এক কথা,—বাবাজী, তুমি আর বিন্দি নেয়ে-টেয়ে তোয়ের হয়ে থেক।”

ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরিলেন; সেবা-সমিতির ছেলেটির হাতে মালসায়,

কলসীতে পূজার নানা রকম সরঞ্জাম। নিজের গায়ে একটা নামাবলী একটা সাজিতে কিছু ফুল। সঙ্গে পুরোহিত অভয় ভট্টাচার্য।



আমেরিকায় জন্মালে এসব ছেলে প্রেসিডেন্ট হ'ত

তারু খুড়ো আসিয়াছিলেন—পাড়ার আরও দু'একজন বৃদ্ধ, বর্ষীয়ান ব্যক্তি। মুরারি ডাক্তার বাড়িতে ঢুকিয়াই হাসিয়া বলিলেন, "এই যে তারুদা এসেছ। অভয়পদকে ডেকে নিয়ে এলাম। স্বস্ত্যেনটা করিয়ে

দিই। শেষকালে বুড়ো বলবে—মুরারিকে ডাকা হ'ল অথচ স্বস্ত্যেনটা করিয়ে দিলে না; বুড়ো বয়সে শুধু কতকগুলো অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়ে দিলে।....কৈ গো বিন্দু....”

নটবর ঘোষাল বলিল, “কি রকম বুঝছ তা' হ'লে ?”

বিন্দু দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার অলক্ষিতে মুরারি ডাক্তার নটবরের দিকে চাহিয়া একবার বুড়া আঙুলটা নাড়িলেন; তাহার পর বিন্দুকে শুনাইয়া একটু গলা চড়াইয়া বলিলেন, “বুঝছি তো ভালই। ওষুধ চলুক না। তবে কি জান ?—বলে, 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্'—ওষুধেই যদি সব করত রে দাদা, তবে আর কুইন্ ভিক্টোরিআ মরে যেত না।....নে বিন্দু, দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না মা, তাড়াতাড়ি জোগাড় করে দে দিকিন একটু, তুমিও লেগে যাও অভয়পদ—তোমার তো আবার মেল ডে আজ; আটটা বত্রিশের গাড়িটা ধরতে হবে।”

অভয়পদ ডেলি-প্যাসেঞ্জার-পুরোহিত, কলিকাতায় মার্চেণ্ট আফিসে কাজ করে। সকাল থেকে সব কাজের মধ্যেই তাহার স্টেশনে গাড়ি আসিয়া পড়িবার চিত্রটি মনে সুস্পষ্ট থাকে বলিয়া, সর্বদাই খুব ত্রস্ত। বিন্দু ঠাঁই করিয়া দিলে সাধাহাতে চটপট পূজার সরঞ্জাম সব দোকান-সাজান করিয়া সাজাইয়া লইয়া আচমন করিয়া বসিয়া গেল।

পরেশ চক্রবর্তী নিঝুম হইয়া পড়িয়া ছিলেন, মুরারি ডাক্তার গিয়া হাতটা তুলিয়া ধরিয়া একবার নাড়িটা পরীক্ষা করিল, বুকটা দেখিল, তাহার পর ঔষধের শিশি তুলিয়া ধরিয়া একবার দাগ দেখিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। জামাই, তারু খুড়ো, আরও দু'একজন অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, “কি রকম হে ?”

বিন্দু পূজার কাছে বসিয়াছিল, প্রশ্নে সেও মুরারি ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিল। ডাক্তার বোধ হয় রসিকতা করিতে যাইতেছিল,

সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আবার রকম কি? অভয়পদর হাতে গিয়েছে আর ভাবনার কি আছে? আমি এতটা সামলে নিয়ে এলাম আর ও, কি যে বলে....একটু হাত চালিয়ে নাঁও হে অভয়। দাদার মাথায় ফুলটা ছুঁইয়ে দাও...."

বিন্দু ব্যাকুলভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "মুরারি কাকা?"

"এই দেখ্ বিন্দি, তুই ছেলেমানুষ হ'লি যে! পূজোর দিকে মন দে দিকিন্। বলে—শান্তি স্বস্ত্যেন হ'ল আত্মার জন্যে আর তুই কি না....। আগে ফলটা দেখ্। দৈব বিশ্বাস করিস্, না, করিস্ না? অভয়পদর শেষ হোক্, দেখবি খুড়ো সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। এ আমাদের প্রত্যক্ষ করা, একা তোর বাবারই তো স্বস্ত্যেন করালুম না, সেই পাশ করেছি অবধি যারই নাড়ি ধরেছি....

বোধ হয় হুঁস হইল; থামিয়া গিয়া তারু খুড়োর হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া দুটো টান দিয়া বলিলেন, "তোমার সেই সনাতন রক্ষিতের কথাটা মনে আছে তো খুড়ো?—সব ঠিকঠাক, নিয়ে যাবে গঙ্গার তীরে, বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে; তারেশ পুরুত স্বস্ত্যেন করে উঠল। 'যাক, অন্তত দেহটাও তো শুদ্ধ হবে'—ব'লে কপালে ফুলটা ছুঁইয়ে বললে, 'তোল, তা' হলে'—সব এসে ধরাধরি করতেই রুগী একেবারে মারমুখো হয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল,—'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমায় সব, পাঠশালার ছেলের মত চ্যাংদোলা করে, শুনি!' মহা রাগী লোক, ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত! তিন দিন পড়ে ছিল; ভিড় করে পাড়ার লোক তামাসা দেখতে এসে জুটেছিল—যে যেখানে পারলে সট্‌কান দিলে। জয়হরি পায়ের দিকে ধরেছিল, লাফ দিয়ে পালাবে—দরজায় মাথা কেটে এক হুলুস্থূল কাণ্ড....বলে, স্বস্ত্যেনের গুণ নেই!...."

ঘরের মধ্যে দুই তিন জন বর্ষীয়সী আর সেবা-সমিতির ছেলে দুইটি

বসিয়া ছিল। হঠাৎ একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "মুরারি কাকা, শাগ্‌গির আসুন একবার।"

"অভয়, তুমি উঠ না যেন, বিন্দুও বোস, ও কিছু নয়, আমরা দেখছি।"

সকলে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল, বিন্দুও একটু দোমনা থাকিয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলিয়া ঘরের মাঝে গিয়া উপস্থিত হইল।

রোগী উঠিয়া বসিয়াছে। বিকারের ঘোরে চক্ষু রক্তবর্ণ, সেবা-সমিতির ছেলে দুইটির দিকে ঠায় চাহিয়া আছে। একটু পরে বার কতক কি বিড়বিড় করিয়া প্রশ্ন করিল, "কি চায় ওরা? কাকে চায়?"

ছেলে দুইটি ঘর থেকে সনাতন রক্ষিতের গল্প শুনিয়া ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিল। একজন বলিল, "আজ্ঞে, আমরা কিছু চাই না তো; শুধু প্রাণপণে, না খেয়ে-দেয়ে, রাত জেগে সেবা করতে ..."

"আমি যাব না, যাব না, আমি; যাও তোমরা, তোমাদের হাতে কি ও?"

ছেলে দুইটি ভয়ে মুরারি ডাক্তারের দিকে হাত একটু বাড়াইয়া বলিল, "কিছু তো নেই আমাদের হাতে।" একজন ব্যাকুল ভাবে বলিল, "ওঁর হাতের কাছ থেকে সাবুর জামবাটিটা সরিয়ে নিন্ না...."

মুরারি ডাক্তার বলিলেন, "তোরা একটু বাইরে চলে যা দিকিন।... ঘোর এসেছে দাদার একটু....আর যত বলি তোরা বাবরি চুলগুলো ছেঁটে ফেল্...."

রোগীর ঘোর কিন্তু কাটিল না। সে ক্রমে সব মাথাতেই বাবরি এবং সব হাতেই কি একটা দেখিতে লাগিল। প্রায় মিনিট পনের প্রলাপ বকিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। মুরারি ডাক্তার মাথা নাড়িয়া

তারু খুড়োর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এর পরের টালটা আর সামলাতে পারবে না, এই বলে দিলাম তোমায় খুড়ো, দেখে নিও....জামাই কোথায় গেল? এস হে ফর্দ টা একবার করে নাও দিকিন, আর জয়নালকে বল, বাঁশটাশ কেটে নিয়ে আসুক...."

দাহকার্য সমাধা করিতে ভোর হইয়া গেল। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুরারি ডাক্তার বলিলেন, "এদের সব সঙ্গে করে নিয়ে যাও জামাই—নিম, লোহা আমি সব জোগাড় করে রেখে এসেছিলাম, সুদাম ময়রাকেও বলে দিয়েছি—মিষ্টি পৌঁছে দিয়েছে নিশ্চয়। আমি একটু বাগ্দীপাড়াটা ঘুরে আসি...."

জামাই বলিল, "কোন কেস্ টেস্ আছে না কি? তা একটু জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসবেন—সমস্ত রাত জাগা, মেহনৎ...."

"এই দেখ, বুদ্ধি দেখ ব্যাটার আমার! বলে 'কেস্'! আমার কি আর এ-ক'টা দিন 'কেস্' দেখবার ফুরসুৎ আছে, না জল খাওয়া নিয়ে থাকলেই চলবে? কুল্যে এই কটা দিন হাতে। পরাণে বাগ্দীর ষাঁড়টা সম্বন্ধে পাকা করে আসি একেবারে, অবশ্য কথা হয়েই রয়েছে। যেদিন দাদাকে দেখতে যাই, সেই দিনই পরাণে বাড়ি বয়ে এসেছিল কি না; বলে—দাদাঠাকুর, শুনলাম আপনি গোঁসাইপাড়ার পরেশ ঠাকুরকে হাতে করে নিয়েছেন, আমার ষাঁড়টারও গতি করে দিতে হবে এই মোহাড়ায়; জামাইঠাকুর বের্ষোৎসর্গ না করে তো থাকতে পারবেন না।.... সস্তায় ছাড়বে, তবুও একবার পাকা করে আসি। বাগ্দীর মন তো।"

মুরারি ডাক্তার যখন পরেশ চক্রবর্তীর বাড়ি ফিরিলেন, তখন প্রায় নয়টা হইয়া গিয়াছে। বিধিমত তেতো মিষ্টি খাইয়া ঘট ঘট করিয়া

খানিকটা জল পান করিয়া বলিলেন, "পরাণের কাণ্ডটা দেখলে তারু খুড়ো! সেদিন ওপর-পড়া হয়ে বলতে এল তো? আর আজ স্বচ্ছন্দে বললে কি না, দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবলাম বুঝি পরেশ ঠাকুর এ যাত্রা টি঳কে গেলেন। তাই ও-পাড়ার জনার্দন ঠাকুরের জন্যে কথা দিয়ে ফেলেছি!....পণ্ডিত পাড়ার জনার্দন হালদার গো। সেদো ডাক্তার দেখছে....ওরা বোধ হয় হাতে দু-একটাকা বায়না গুঁজে দিয়েছে, জেতে বাগ্‌দী তো—কথা উল্টে দিলে। তা, আমিও বলে এলাম, কথা দিয়ে কথা রাখলি না পরাণে, দেখিস্ জনার্দন খুড়ো ডেংডেঙিয়ে সেরে উঠে তোকে কলা দেখাবে, এই প্রাতর্বাক্যে, শাপ দিয়ে গেলাম...."

তারু খুড়ো বলিলেন, "ঘোর কলি হয়ে দাঁড়াল। চার পো। তাইতো ভাবছি—পরেশ দাদা দিব্যি গেল—পুণ্যিবান্ লোক...."

মুরারি ডাক্তার মুখ বাঁকাইয়া কুলকুল করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "আর দেরির কথা যে বললি—দেরিটা হয়েছে কোথায় শুনি? পরশু সকালে দাদাকে হাতে নিয়েছি, আজ সকালে...."

হঠাৎ চৈতন্য হওয়ায় থামিয়া গিয়া ক্রুদ্ধভাবে মুখটা গোঁজ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

তারু খুড়ো বলিলেন, "তা হলে উপায়?"

"উপায় মজাদীঘির হাট, চার কোশ পথ হেঁটে যেতে হবে এই বুধবার, উপায় তো নেই; পরেশদা ভাববে মুরারির হাতে গেলাম, বৃষোৎসর্গটাও একটু চেষ্টাচরিত্তির করে করিয়ে দিতে পারলে না। কিন্তু সময় কৈ? আমি তো সেই কথাই ভাবছি—সময় কৈ। মাঝখানে আবার একটা চতুর্থীর হাঙ্গামা আছে।....কৈ গো বিন্দু!....এই দেখ্, তুই কাঁদতে বসলি। সামনে দু-দুটো কাজ, আর এইটে তোর কাঁদবার সময় হ'ল?.... তারু খুড়ো!"

তারু খুড়ো একটু প্রশ্রয়ের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সময় তো নয়; কিন্তু শোক, সে তো আর সময় অসময় মানবে না....স্বয়ং ভগবান্ অর্জুনকে কি বলেছেন?...."

তামাক টানিতে লাগিলেন।

বিকাল বেলা মুরারি ডাক্তার, সুদাম ময়রা, গণেশ মুদী, অভয় ভট্‌চাজ প্রভৃতি কয়েক জনকে লইয়া প্রবেশ করিলেন, উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "কৈ, জামাই কোথায় গেলে? গিন্নীকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি একটু কুমোরপাড়ায় চলে গিয়েছিলাম—জলটল একটু মুখে দিলে বিন্দু? ....দুটো বাতাসা খেয়ে একটু জল খেয়েছে?....আর ওর বেশি কি পারে বাবাজী? মেয়ের প্রাণ তো? তুমি খানিকটা কাগজ আর কালিকলম নিয়ে এস তো, ফর্দগুলো সেরে ফেলা যাক।"

ক্রমে ক্রমে তারু খুড়ো, নবীন ঘটক, ঘোষাল মশাই, হারু পণ্ডিত প্রভৃতি পাড়ার মাতব্বরেরা আসিয়া জুটিল। নানারকম মতামত, তর্ক কেচ্ছাকাহিনীর মধ্য দিয়া অশেষ রকম আকার পরিবর্তন করিতে করিতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চতুর্থী আর শ্রাদ্ধের তালিকা দুইটা প্রস্তুত হইল। মুরারি ডাক্তার কাগজ-কলম ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "নাও, বাবাজী এইবার একটু তামাকের জোগাড় কর দিকিন। একটা যেন বোঝা নেমে গেল।"

একটু খোসগল্প চলিল—পরেশ চক্রবর্তীর জীবন লইয়া খানিকটা আলোচনা—জামাইয়ের শ্বশুরের প্রতি অচলা ভক্তি (যা কখনই ছিল না), জনার্দন যদি মরে সে যেন পরেশ চক্রবর্তীর ওপর না টেক্কা দেয়, শত্রুপক্ষ যেন না বলিতে পারে—জামাইতে ছেলেতে ঢের তফাৎ—না, সে কেহই হইতে দিবে না,—গ্রামের বদনাম তো!

পিছনে যে যাহা বলুক, মুরারি ডাক্তারেরও প্রশংসার বন্যা ছুটিল,

"কে করে আজকালকার দিনে শুনি? নিজের ভিজিট পকেটস্থ করেই নিশ্চিন্ত...."

মুরারি ডাক্তার বলিল, "সমাজ আমার,—স্বস্ত্যেন, শ্রাদ্ধ-শান্তি এ সব করবে কি সিভিল সার্জ্জেন—জেলা থেকে এসে?"

হারাণ পণ্ডিত লোকটা একটু কটুভাষী, তবে মিষ্ট করিয়া বলে, হাসিয়া বলিল, "বাঁচালে তো আর শ্রাদ্ধ করতে হয় না ভায়া...."

দলের সমস্ত প্রশংসার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন হাসি ছিলই, সুযোগ পাইয়া সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তারু খুড়া সামলাইয়া লইবার জন্ত বলিলেন, "বাঃ, বলবে না? সুবাদে মুরারি ওর নাতি হয়, ঠাট্টা করবে না?"

কিন্তু সামলাইবার কোন প্রয়োজোনই ছিল না ওসব কথা মুরারি ডাক্তারের এক কান দিয়া ঢোকে অপর কান দিয়া বাহির হইয়া যায়। তা ভিন্ন ওসব কথা ভাবিবার সময়ই বা কোথায়?

চতুর্থীটা বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হইল। সবাই বাহবা দিল মুরারি ডাক্তারের। জামাই কৃতজ্ঞতার সহিত হাত জোড় করিয়া বলিল, "কাকা, আপনি না থাকলে, কি যে হ'ত! আমার তো এই অবস্থা!"

মুরারি ডাক্তার বলিলেন, "দাদার কাজ দাদা নিজে করে নিচ্ছেন, আমার কি আর এদিকে মন আছে বাবাজী? বৃষটা না এনে ফেলতে পারলে....বেটা বাগ্‌দীর পো কি ভীষণ ফেরে ফেললে যে। হঁ্যা বাবাজী, আমি সব জন মজুর বলে দিয়ে এসেছি—কাল সকালেই এসে পড়বে, দাঁড়িয়ে চারি দিকে পরিষ্কার-টরিষ্কার করিয়ে নেবে, আমিও এসে পৌঁছুব; তবে আমার আবার একবার ন'গাঁয়ে চৌধুরীদের বাড়ি যেতে হবে—শামিয়ানা একটা চাই তো, বৃষোৎসর্গ ব্যাপার, খেলা নয় তো, সময় বুঝে রোদ্দুরের তেজটা দেখছ তো। হঁ্যা....রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ চারটি দিন

বাকি—বুধবার দিন মজাদীঘির হাট—চারটি কোশ পথ....বলছিলাম তুমি যদি ও ব্যাপারটা সেরে নিতে...."

জামাই মিনতির স্বরে বলিল, "আজ্ঞে আমার অবস্থা তো দেখছেনই—শেষে...."

"তা তো বুঝছি। যাব, আর করা যায় কি।....আজ আবার পেনো কুমোর এসেছিল, তার মাগটা পড়ে কি না। বললাম, 'তুই কি ঠাট্টা করছিস্ পেনো? খুব ফুরসুৎ দেখ্‌ছিস আমার।'....যাব, আর ষাঁড় কেনা তোমার কর্ম্মও নয় বাবাজী...."

ষাঁড়েরও খুব তারিফ হইল। মুরারি ডাক্তারের পছন্দ; কিছু নয় তো নিজের হাতেই দশ বার'টা ষাঁড় কিনিয়াছে। কিন্তু ষাঁড়ের প্রশংসা শুনিবার ফুরসুৎই বা কোথায় মুরারি ডাক্তারের? একটা দিন ছিল না, সব ওলট-পালট। সে-সব সামলাইতেই একটা দিন গেল। শামিয়ানা আসে নাই, আবার যাইতে হইবে দেড় ক্রোশ পথ।

বলিলেন, "তা হ'লে তুমি নেমন্তন্নটা সেরে নাও জামাই বাবাজী, তুটো দিন লাগবে।"

জামাই বলিল, "আমার অবস্থা তো দেখছেনই কাকা, তার ওপর এই নিদারুণ শোকটা যাচ্ছে....তুটো পা হাঁটতে গেলে ভির্মি লাগবার মত হচ্ছে।"

"থাক্ তবে, একটা কাটিয়ে উঠতে উঠতে আর একটা না শুরু হয়। কোন রকমে সেরে নিতেই হবে....দেখ কাণ্ড, কেত্তনের কথাটা ভুলেই গেছলাম। সিদু ঢপওয়ালীকেই কাল দিই বায়না পাঠিয়ে, হুগলীতে গিয়ে বাছাই করে আনবার তো আর সময় নেই। তবু আসরটা একেবারে খালি যাবে না...."

মহাসমারোহে শ্রাদ্ধকার্য চলিয়াছে। এদিকে বৃষোৎসর্গ—ওদিকে

কীর্তন—সভায় পণ্ডিতদের অনুস্বার বিসর্গের টংকার—বাড়ির উঠানে চাঁদোয়া খাটান হইয়াছে—তাহার একপ্রান্তে ভিয়েনের আয়োজন।



সমুদ্র পেরিয়ে এসে গোষ্পদে না ডুবতে হয়

গ্রামের মাতব্বরেরা সেইখানে জটলা করিতেছে। চারিদিক তদারক করিয়া মুরারি ডাক্তার উপস্থিত হইলেন। কাঁদে ফেলা গামছাটার কোণ দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সন্দেশের পাকটার দিকে

নজর রেখে যেও সুদাম। দেখো যেন সমুদ্র পেরিয়ে এসে গোষ্পদে না ডুবতে হয়....”

সুদাম বাঁ হাতে হুঁকা টানিতে টানিতে ডান হাতে তাড়্ ধরিয়া ছানা মাড়িতেছিল, বলিল, “সুদাম ময়রা কি মরে গেছে বাবাঠাকুর?.... হ্যাঁ, এ যা বলেছেন একটা কথার মত কথা, সমুদ্র পেরোনই বটে। আমি সেই কথায় তো তারু ঠাকুরকে বলছিলাম, বলি, হাতযশ বলি তো একে, যে দিকটা দেখ যেন গমগম করছে, আর এই বাড়িই তো আগেও ছিল....”

মুরারি ডাক্তার পাশ থেকে একটা কড়িবাঁধা হুঁকা তুলিয়া লইয়া ক্ষেত্র ঘোষের হুঁকা হইতে কলিকাটা বসাইয়া দিলেন। তার পর তারু খুড়োর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আত্মপ্রশংসার মত শোনায় তাই বলি নি, তবে সুদাম নেহাৎ না কি কথাটা তুললে....দক্ষিণপাড়ার নিবারণ গো—মামা মারা যাওয়া অবধি সম্পত্তিটির লোভে আজ বোধ হয় ছ'-সাত বছর ধরে তিথির কাকের মত এসে বসে আছে....বলে, ‘মুরারি মামা, আজ মাসখানেক ধরে রাঙা মামী পড়ে, না এদিক না ওদিক, আর তো কষ্ট চোখে দেখতে পারি না। একটি বার দয়া করে চলুন’....ঝুলো-ঝুলি.... বললাম, ‘দাঁড়াও বাপু, একটি যা হাতে নিয়েছি সেইটিই সামলে নিতে দাও আগে....’ এই যে বাবাজী, পরিবেশনের লোকের অভাব হচ্ছে? চল, চল, আসল কাজটা তো হ'ল পরিবেশন....বলে মধুরেণ....”

দেওয়ালের আড়ালে গিয়া পড়ায় আর বাকিটা শোনা গেল না।

রায়ট্

একটা রায়ট্ হইয়া গেল।

'রায়ট্' কথাটাই ব্যবহার করিলাম। 'দাঙ্গা'-য় জিনিষটার বিষাক্ততা, জিনিষটার ক্রূরতা ঠিক প্রকাশ পায় না। 'মারামারি' কথাটা তো একেবারেই অচল। 'রায়টে'র সামনে 'মারামারি' নিছক বাবুয়ানি—একটা বিলাসিতা।

'রায়ট্' কথাটায় হিন্দু-মুসলমানের যৌথজীবনের চরম দুঃখের ইতিহাসটি গাঁথা আছে। একদিন—যে শুভদিনে ভ্রাতৃ-আহবের শ্রান্তির পর দুইটা জাত শান্তি খুঁজিবে সেই দিন এই রক্তে-লেখা কথাটার প্রয়োজন হইবে। সেদিন ভারতবাসী—তখন বোধ হয় হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়—অতীতের কবর থেকে সেই ক্ষুদ্র, নীচ স্বার্থকে টানিয়া বাহির করিবে, দুইটি ভাইয়ের রক্ত-মসী দিয়া যে আজ কথাটা লিখিয়া রাখিল।....বিচার করিবে।

কেন হইল রায়ট্ সে প্রশ্নের প্রয়োজন নাই ; সে প্রশ্ন অযথা, কোনও রায়টের সম্বন্ধেই ও-প্রশ্নটার সঠিক উত্তর এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অবশ্য উত্তর খোঁজায় একটু ভুল বরাবরই হয়। দুর্গাগড় কিংবা ইসলামপুরে রায়ট্ হইলে দুর্গাগড় এবং ইসলামপুরেই তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে যায় লোকে। মূল যে সাগর পারের কোথাও, কিংবা খুব নিকটে হইলেও বোম্বাই, কলিকাতা বা দিল্লীর কোন বিলাসকক্ষে—এই কথাটা থাকে অজ্ঞাত।

কিন্তু সে-কথা থাক আপাতত।

এই চারদিন আগে পর্যন্ত বেশ ছিল। কর্মে কোলাহলে, জীবনের

শতধারার কলস্বনে জায়গাটা ছিল মুখর। তাহার পর হঠাৎ আকাশে-বাতাসে একটা কুটিল সন্দিগ্ধতা ছাইয়া গেল। একটা রব উঠিল—ধর্ম আর থাকিবে না। যাহারা শত শত বৎসর ধরিয়া বুক দিয়া পরস্পরের ধর্মকে আগুলাইয়া আসিয়াছে—মুসলমান দিয়াছে দুর্গাপূজার জোগান, হিন্দু দিয়াছে মহরমের তাজিয়ায় কাঁধ পাতিয়া—তাহারা এক মুহূর্তেই আশ্চর্য হইয়া উঠিল, এমন প্রচ্ছন্ন শত্রু পাশে—ধর্ম তাহার টেঁকিল কি করিয়া! এ বিষ-বায়ুর বিশিষ্টতাই এই—ধর্ম যে টেঁকিয়া আছে এ-সত্যে সান্ত্বনা দেয় না, টেঁকিল যে কি করিয়া এই পরম বিস্ময়েই ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে।

যেমন হিন্দুর ধর্ম আছে, যেমন মুসলমানের ধর্ম আছে, রায়টেরও সেই রকম একটা ধর্ম আছে—তার মূল তত্ত্ব এই বিভ্রম। সংসারে উত্থান-পতন তো সব জিনিষেরই আছে? এখন চলিতেছে রায়টের বৃহস্পতির দশা—দলে দলে লোক তাহার ধর্ম অবলম্বন করিতেছে।....লং লিভ রেভলিউশান—বিপ্লবঃ সহস্রং জীবতু!—যে বিপ্লব ছোটে মরণ-ঢেউয়ের শীর্ষে পা ফেলিয়া—যে বিপ্লবের প্রথম সন্তান রায়ট্।

হাওয়া বিষাক্ত, ছোট্ কথা বড় হইয়া উঠিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে বড় করিবার লোক জুটিতেছে অদ্ভুত ভাবে। অনেক ক্ষেত্রে তিল আপনি-আপনিই তাল হইয়া উঠিতেছে।

সহরের শেখপুরা পল্লীতে কয়েকজন মুসলমান সান্ধ্য নামাজ পড়িয়া বাহির হইতেছিল, ফটকের কাছে দীর্ঘ আলখাল্লা এবং লুঙ্গীপরা একজন মাঝবয়সী লোক খুব নম্রভাবে অভিবাদন করিল, "সেলাম ওয়ালেকুম।" সকলে প্রত্যভিবাদন করিল এবং চিনিবার চেষ্টা করিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি ন্যস্ত করিল।

লোকটা মুসলমানী কেতায় আর একবার সেলাম করিয়া বলিল,

"আমি বিদেশী, নামাজের সময় হয়ে এল দেখে মস্‌জিদে ঢুকছিলাম হঠাৎ একটা বাধা পেয়ে আর প্রবেশ করা হ'ল না।"

সকলে প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "কি বাধা আপনার!···বলুন।"

লোকটা একটু মৌন রহিল—কথাটা বলা ঠিক হইবে কি না চিন্তা করিল যেন—তাহার পর দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "না, তেমন কিছু নয়—এই হঠাৎ কয়েক জায়গায় শাঁখ বেজে উঠল কি না····ঠিক এই সময়টিতে ওদের শাঁখ না বাজালেও চলে না····"

কয়েকজন যুবক একেবারে উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সত্যি?—শাঁখ বেজেছিল না কি?····

একজন শুভ্রকেশশ্মশ্রু বৃদ্ধ ছিল। কথাবার্তার গতিটা তাহার তেমন ভাল লাগিল না, বলিল, "ও আর কি করা যাবে? ওদেরও সাঁঝের পুজো—আর খোদার ওপর সমস্ত মনটা দিতে পারলে শোনাও যায় না ও সব শব্দ।"

যুবক কয়টি আরও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, "শোনা যায় না কি বললেন আপনি! কান ঝালাপালা হ'তে থাকলে আল্লার ওপর মন বসান যায়? আপনাদেরই আস্কারায় অবস্থাটা হয়ে পড়েছে এত সংগীন।" আরও অনেকে সমর্থন করিল। বৃদ্ধ ভাললোকগোছের, যুবকদের প্রশ্ন হইতেই যে টের পাওয়া গেছে কানে ঝালাপালা লাগে নাই, আর তার কারণ এই যে নামাজটা বেশ নিবিড় মনোনিবেশের সঙ্গেই সম্পন্ন হইয়াছে, এটা সে আর বলিতে পারিল না।

আগন্তুক শান্ত করিবার জন্য বলিল, "থাক, এর জন্যে আর রক্ত গরম করে কাজ নেই····জবানীর তাজা খুন—বিশেষ করে ধর্মের কথা, এখুনি বোধ হয় সব জান্ কবুল করে বসবে—থাক্, এসব কথার আর চর্চা করে কাজ নেই। আচ্ছা, তাহ'লে আসি, সেলাম ওয়ালেকুম।"

সহরের অন্য এক প্রান্তে প্রায় এই রকম সময়েই আর একটা ঘটনা ঘটিল। এদিকটা হিন্দুপ্রধান, একজন মুসলমান একটা বলদ হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছিল। রাস্তার ধারে একটি টিউবওয়েলের নিকট জলের জন্য দাঁড়াইল। একটি মাড়োয়ারীর দোকানে একজন প্রৌঢ় হিন্দু কাপড় কিনিতেছিল। রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইতে হঠাৎ নজর পড়ায় প্রশ্ন করিল, "কত দিয়ে হ'ল খাঁ সাহেব?"

যাহাকে প্রশ্ন করিল তাহার মধ্যে খাঁ সাহেবের কিছুই ছিল না— খালি গা, খালি পা, পরিধানে একটা সস্তা লুঙ্গি, কাঁধে গামছার মত একটা মুসলমানী রুমাল। লোকটা উত্তর করিল, "সতের টাকায় হ'ল, সাহেব। প্রশ্নকর্তা ঘুরিয়া বসিল, বলিল, "আমি আঠারটা টাকা দিচ্ছি দিয়ে দাও।"

দোকানের আরও দু'-একজন ঘুরিয়া বসিল, দোকানী একটা থান মাপিতেছিল, গজহাতে রাস্তায় লোকটার পানে চাহিয়া রহিল। লোকটা বলিল, "আজ্ঞে না, আমার গাড়ির জন্যে কেনা বলদ, জোড়া মিলিয়ে কেনা; বেচব না।"

প্রশ্নকর্তা বলিল, "না দাও, সে আলাদা কথা; কিন্তু তোমার যে ব্যবসা কি এবং কি উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছ বেচারি বলদকে, সে সম্বন্ধে আর ঠকাবার চেষ্টা করতে হবে না আমাদের।"—বলিয়া সবার দিকে, বিশেষ করিয়া মাড়োয়ারী দোকানীর দিকে, ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। দোকানী বলিল, "আচ্ছা, উনিশ টাকা আমি দিচ্ছি।"

"আজ্ঞে না, মাপ করবেন।"

"কুড়ি টাকা?"

"মাফ করবেন।"

"বাইশ টাকা?....পঁচিশ টাকা?....তিরিশ?...."

দোকানের সবাই উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছে, রাস্তায়ও লোক জড় হইয়াছে। গরম গরম অভিমত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।—সতের টাকার বলদ তিরিশ টাকায় দিতে চায় না—এ-জিদের মানে কি?

মেলার মধ্য হইতে একটি লোক আসিয়া বলদের দড়ি ধরিয়া বলিল, "এ বলদ এখান থেকে নড়বে না; টাকা নাও ভালই; না হয় অমনি ছেড়ে যাও।"

একজন পুলিশ আসিয়া পড়ায় লোকটা অব্যাহতি পাইল তাড়াতাড়ি বলদ হাঁকাইয়া সরিয়া পড়িল।

পরদিন সকালের প্রথম খবর—শেখপুরার কতকগুলি লোক একজন মুসলমানের বলদ ছিনাইয়া তাহাকে উত্তম মধ্যম কয়েক ঘা দিয়াছে।

সমস্ত দিন সহরের আকাশটা থমথমে হইয়া রহিল সন্ধ্যার ছায়া নামিতেই রায়ট্ সহরের রাস্তায় পা বাড়াইল। অন্ধকারকে আগে করিয়া —প্রথমে সংকীর্ণ গলিতে, তারপর অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত গলিতে, তাহার পর, অন্ধকার ঘন হইলে একেবারে সদর রাস্তায়।

রায়ট্ নিশাচর, অন্ধকারে তাহার গতির আরম্ভ, তাহার পর যখন খুব রক্তপুষ্ট হয় তখন নিজেই অন্ধকারের সৃষ্টি করে,—দিবাকেও করিয়া তোলে নিশীথ রজনী—স্তব্ধ, ভীত, ক্বচিৎ বিকটধ্বনিতে উচ্চকিত। আক্রোশের প্রথম চোট-টা অবশ্য গিয়া পড়িল ধর্মের উপর। মন্দির—মসজিদ কলুষিত হইল। মানুষের পূর্বে হিন্দু মুসলমান স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রথমে দ্বিখণ্ডিত করিল—বিভক্ত করিল। তাহার পর তাঁহার খণ্ডিত শরীরকে লাঞ্ছিত করিল। ভগবানেরও পাপপুণ্য আছে এবং তজ্জনিত 'অদৃষ্ট' আছে; মানুষ সৃষ্টি করিবার পাপের জন্য তাঁহাকে সাজা লইতে হয়—আর অদৃষ্টের এমন পরিহাস, সাজা লইতে হয় সেই মানুষেরই

হাতে। খুব উঁচু থেকে—একেবারে দেবতার স্থান থেকে তাঁর সৃষ্টির দিকে নামে বলিয়া রায়টের গতি হয় দুর্বার, প্রমত্ত। তিন দিন মনুষ্যমেধ যজ্ঞ চলিল, সমানে;—না, সমানে নয়—বেগ প্রতিদিনই উন্মত্ততর হইতে লাগিল, মানুষের মনের মুখ্য অনুভূতি হইয়া উঠিল ঘৃণা—সে আহার ভুলিল, বিশ্রাম ভুলিল, সারাজীবনের অভ্যাসগত দৈনন্দিন কাজ ভুলিল—খুনের নেশায় মাতিল—তাহার শ্রেষ্ঠ, তাহার একমাত্র বিলাস হইল গুপ্ত ছোরা।....জীয়ন্ত তাজা মানুষ অতর্কিত আঘাতে মুহূর্তেই ধরাশায়ী হইয়া সৃষ্টি হইতে বিদায় লইল—যে সৃষ্টিকে এত ভালবাসিয়াছিল তাহাকে শেষ দান দিয়া গেল তার বিদ্বেষ-বিষাক্ত শেষ নিঃশ্বাস। যাহারা সদ্য মরিল না তাহারা হাসপাতালে গিয়া ভিড় করিয়া উঠিল। হাসপাতাল মরণযাত্রীর পান্থশালা—পথ চলিতে চলিতে যেন একটু দম লইয়া লওয়া।

তিন দিন গেল। প্রথমে প্রধানত যুবকরাই নামিল, তাহার পর প্রৌঢ়েরা, তাহার পর দু'একজন বৃদ্ধকেও দেখা গেল; বোধ হয় এরা সব হারাইয়া বয়সের জ্ঞানও হারাইয়াছে। অথবা নিছক খুনের আনন্দ।.... বার্ধক্যে মানুষ দেবতার পানে এগোয়, এরা রক্ত-পঙ্কিল পথে পিছলাইয়া কি রকম পিছাইয়া গিয়াছে।

নীচের দিকে বিদ্বেষ প্রায় শিশু পর্যন্ত নামিয়াছে। শিশুরা খেলাঘরে মন্দির গড়িতেছে, মসজিদ গড়িতেছে, মা কালীর নাম লইয়া অথবা আল্লাকে সাক্ষী রাখিয়া—আবার মাটিতে মিলাইয়া দিতেছে!

জীবনে যে পাঠ পড়িতে হইবে তাহার জন্য হাতে খড়ি!

হিন্দুপল্লীর শেষের দিকে একটি মসজিদ; আজ তিন দিন তাহাতে আজানের পবিত্র রব ওঠে নাই, নামাজের মন্ত্র উচ্চারিত হয় নাই। শুনা যাইতেছে কাল এই মহাযজ্ঞের পূর্ণ আহুতি, জোগাড়-যন্ত্র চলিতেছে, এই

মসজিদটি ধূলিসাৎ হইবে কয়েকটা মন্দির সম্বন্ধেও এইরকম গুজব উঠিয়াছে। সমারোহ পড়িয়া গেছে।

মসজিদটি খুব কারুকার্যময়। এর ইমাম একটু সৌখীন লোক! মসজিদের ভিতরে বেষ্টনী-প্রাচীরের পাশে পাশে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া কয়েকরকম পাতা-বাহার আর ফুলের গাছ মিলাইয়া একটা বাগান গোছের করিয়াছে। দেওয়াল আর মসজিদ-গৃহ যেখানটা মিলিয়াছে সেখানটা একটা মার্শেলনীল গোলাপের লতা। তাহার গোটাকতক ডাল দেওয়াল বাহিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের প্রান্তে থোকা থোকা একরাশ ফুল।....দেবগৃহ হইতে উছলিয়া দেবতার আশীর্বাদ বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে।

জায়গাটা নির্জন। একটি ছেলে পাশের একটি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সেইখানে দাঁড়াইল। প্রায় সবই হিন্দু এদিকটা, মুসলমান যে কয় ঘর ছিল, চলিয়া গিয়াছে। ছেলেটি হিন্দু।

বয়স আট নয় বৎসর হইবে। সহরে যে সংহার কাণ্ড চলিয়াছে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বুঝিলেও এইটুকু বুঝিয়াছে যে সমস্ত মুসলমান রাতারাতি শত্রু হইয়া গিয়াছে,—এবং যদিও খুব সংগোপনে মা কালীর নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছে—তাহার খেলার সাথী আবদুলের যেন কোন বিপদ না হয়, তবুও আবদুলেতর আর সব মুসলমানের ক্ষতির জন্য তাহার কিশোর ধমনীতেও নেশার আমেজ ধরিয়াছে। কিছু একটা ক্ষতি, যা হয় কিছু একটা।....

দূরে একটা উৎকট রব উঠিল। হিন্দু কি মুসলমানের বোঝা গেল না গা'টা একটু ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। যেদিক হইতে শব্দটা আসিল সেদিকটা ঘুরিতেই নজর পড়িল গোলাপ গাছের উপর।

বালক স্থিরদৃষ্টিতে পুষ্পস্তবকের দিকে চাহিয়া রহিল—অনেকক্ষণ।

প্রথমে একটা উল্লাস—সুন্দরকে একসঙ্গে, এত বেশি করিয়া পাওয়ার একটা অহেতুক আনন্দ—কিছুক্ষণ গেল একটা নিবিড় আত্মবিস্মৃতির মধ্যে।....তাহার পর লোভ—তাহার পর ধীরে ধীরে অস্তরবির রাগরঞ্জিত, স্বর্গের পারিজাতের মত সেই পুষ্পস্তবক বালকের মনে কুটিল হিংসার আগুন ধরাইল।....সৌন্দর্য আগুন ধরায় না?—ধরায় বৈকি,—এই তো ধর্মই আজ বুকে বুকে প্রদাহ জ্বালিয়াছে,—ধর্মের চেয়ে আর সুন্দর কি?—মসজিদের গায়ে লতাইয়া-পড়া গাছ থেকে ঐ পুষ্পরাশি তুলিতে হইবে। এর তুল্য আর ক্ষতি হইতে পারে না, কেননা বালকের চক্ষে পুষ্পই শ্রেষ্ঠ সম্পদ।....বালক থাকে স্বর্গের কাছাকাছি—তাহার মনে স্বর্গের পারিজাতের স্মৃতি বোধ হয় তখনও সজাগ থাকে কতকটা।

গা ছম্ছম্ করে, তবুও একটা অবোধ নেশা।....ওদিকে সহর থেকে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ ধ্বনি উঠিয়া সান্ধ্য আকাশ মথিত করিয়া তুলিতেছে।

বালক চোরের মত অগ্রসর হইল।

ফুলগুলা তাহার হাতের একটু উপরে। নিকট হইতে খানকতক ইঁট উপরে উপরে সাজাইয়া—তাহার উপর দাঁড়াইল। তাহার পর তাড়াতাড়ি যতগুলি পারিল ফুল তুলিয়া নামিয়া পড়িল।....নেশা কাটিল কতকটা।

নেশা কাটিলে ভয় হয়। বালক কোঁচড়ে ফুল ভরিয়া একরকম দৌড়াইয়াই নিজের বাড়ির দরজায় ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

ভয়টা কতকটা কাটিতে আবার নেশা।—আরও কিছু ক্ষতি করা যায় না? ওদের ভগবানের আরও কিছু অপকার? এ-প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং ভগবানই।—বালকের দৃষ্টি হঠাৎ অদূরে শিবালয়ের চূড়ায় গিয়া নিবদ্ধ হইল। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিতে ঝলমল করিতেছে।

বালক স্থির করিল—ওরা আমাদের যে-ভগবানকে লাঞ্ছনা করিতেছে

তাঁহারই মাথায় ওদের ভগবানের সৃষ্ট পুষ্প উৎসর্গ করিয়া দিতে হইবে। এই উপযুক্ত প্রতিহিংসা, এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কল্পনায় আসে না।

বালক মন্দিরের পানে চলিল, কোঁচড়ে ফুল। বেশি দূরত্ব নয়, ওদিকটা হিন্দুর ছেলের বিপদও নাই। রাস্তায় অনেক সঙ্গীও জুটিল, মন্দিরে পূজার একটু ধুম পড়িয়াছে।

মন্দিরে প্রবেশ করিল। দু'একজন জিজ্ঞাসা করিতে বলিল, মা পূজার জন্য ফুল পাঠাইয়া দিয়াছেন। দেবতার পূজার সমারোহ আজ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া গেছে,—কেহ বড় একটা আশ্চর্য হইল না। সে তাহার পর অগ্রসর হইয়া শিবমূর্তির উপর কোঁচড়ের সমস্ত ফুল উজাড় করিয়া দিল।

বালক সব সম্প্রদায়ের উপরে, ওর মনের যেটাকে কালিমা ভাবি সেটা আসলে ওর কলুষিত পারিপার্শ্বিকের ছায়া মাত্র। বালক নিঃসম্প্রদায়, তাই কি ওর হাত দিয়া ভগবান নিজের অখণ্ড রূপের পূজা লইলেন?—পুষ্পরূপ পাষাণরূপ এক হইল?

* * *

যাহাই হোক, মরণযজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়িল না। কেহ বলিল সেইরাত্রি থেকে আরম্ভ করিয়া তিন দিন ব্যাপী যে তুমুল বৃষ্টিধারা নামিল তাহাই আসল কারণ; অমন বৃষ্টি বহুদিন যাবৎ কেহ দেখে নাই। কেহ বলিল স্থানীয় লীডারদের চেষ্টা, কেহ বলিল গভর্ণমেণ্টের সুবন্দোবস্ত। ফলকথা, রায়ট্ শান্ত হইল।

মতিস্থির হইলে সকলে দুইটি লোককে খুঁজিল—মসজিদ দ্বারের সেই মুসলমানকে এবং মাড়োয়ারীর দোকানের সেই হিন্দুকে। কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না তাহাদের। তাহারা কোথাকার?—কলিকাতার—বোম্বাইয়ের—না দিল্লীর?

একেবারে গোড়ার এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

গোলাপী রেশম

তারাপদ বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "তোমার হয়েছে কি শৈলেন? একটা মনি-অর্ডার নিতে যে হিমসিম খেয়ে গেলে! দুবার দুজায়গা ভুল করে কোন রকমে দস্তখৎটা তো সারলে, এখন আবার তারিখ নিয়ে ও কি কাণ্ড করছ?"

শৈলেন নিতান্ত অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি কলমটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "ও, হ্যাঁ, তাইতো! উনিশ শ' ছত্রিশ লিখছি কি বলে!...."

তাহার পর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "কত সাল যাচ্ছে বল তো এটা!"

পিওন বলিল, "আটত্রিশ পড়েছে বাবু।"

"ঠিক তো। দেখ, মনেই ছিল না।" আরও বেশি রকম অপ্রতিভ হইয়া ব্যস্তভাবে তারিখটা শুধরাইয়া টাকা কয়টা না গুণিয়াই পকেটে ফেলিয়া পিওনকে সে বিদায় করিল।

তারাপদ ভ্রূ তুলিয়া গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, "এত অন্যমনস্ক, ব্যাপার কি বন্ধু?"

"কৈ, অন্যমনস্ক হই নি তো!"

"হয়ে-যে-ছিলে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই, অধিকন্তু এখনও রয়েছ। আর গোপনের বৃথা চেষ্টা না করে কারণটা বলে ফেল দিকিন। কবি মানুষ, নতুন বসন্ত পড়েছে, আমি তেমন ভাল বুঝছি না।"

শৈলেন একটু লজ্জিতভাবে হাসিল, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর আর একবার তাগাদা খাইয়া বলিল, "নিতান্তই ছাড়বে না তা হ'লে?"

তাহার পর জানালার বাহিরে খানিকটা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "সাল ভুল করার জন্যে আমায় দোষ দিও না, আমি ১৯৩৮ সালে ছিলাম না খানিকক্ষণ, বোধ হয় এখনও ঠিকমত নেই।"

তারাপদ একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া ছিল, শুইয়া পড়িয়া বলিল, "এইচ্-জি-ওয়েল্স্-কল্পিত 'টাইম-মেশিনে' তুমি যে কোন দূর-ভবিষ্যতে কিংবা দূর-অতীতে পাড়ি মেরেছ তা বুঝতে পেরেছি। একটু পরিচয় দাও তোমার প্রবাস-যাত্রার, শোনা যাক।"

শৈলেন বলিল, "ভবিষ্যৎ তো মরুভূমি, সে দিকে গিয়ে কি করব? গিয়েছিলাম অতীতে, আজ থেকে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান। সেখানে, কোন একটি শান্ত পল্লীগ্রামে রাধারমণের মন্দিরের পাশে উঁচু রকের ছায়ায় একটি ছোট মেয়ে খেলা করছে, তার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম।"

তারাপদ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তার পাশটিতে একটি ছোট ছেলেও আছে।"

শৈলেন চোখ না ফিরাইয়াই বলিল, "আছে; তার নাম রাখা যাক্ শ....."

তারাপদ বলিল, "শ-য়ের আড়ালে 'শৈলেন' তেমন ঢাকা পড়ছে না, তুমি স্পষ্টাস্পষ্টি আত্ম-প্রকাশই কর। আর পবিত্র মন্দিরের পাশে একটি বলিকার সঙ্গে খেলা করছ বলে এই ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান থেকে কানমলা দেবে এমন লম্বা হাত কারুর নেই।"

শৈলেন দৃষ্টি ফিরাইয়া হাসিল। একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "তোমায় পূর্বে কখন বলেছি—ছেলে বেলায় আমার অভিভাবকেরা আমার পড়াশুনার সুবিধে হবে বলে তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে বাংলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—কেন না তাঁরা থাকতেন দূর পশ্চিমাঞ্চলে। আমিও এই সুবিধে পেয়ে পাঠশালা আর গুরুমশাইকে আমার নিজের

কাছ থেকে খুব দূরে দূরে রাখতাম। বিদেশে পুত্রবিরহকাতর বাপ-মা যখন ভাবতেন, আমি গুরুমশাইয়ের উদ্যত ছড়ির নীচে বিদ্যাকর্ষণ করে যাচ্ছি, সে সময়টা আসলে আমি রাধারমণের মন্দিরের পাশে বেশ মাঝারি গোছের একটি দল জুটিয়ে অভিরুচিমত নানা রকম খেলায় মশগুল। দলের মধ্যে ছেলে-মেয়ে উভয়েই ছিল। তার মধ্যে একটি ছেলের পরিচয় দেওয়া আপাতত দরকার। ছেলেটার নাম ছিল....”

তারাপদ টুকিল, “লেডিজ্ ফার্স্ট!”

শৈলেন হাসিয়া বলিল, “আমারও ইচ্ছে ছিল, শুধু তুমি কি মনে করবে সেই ভয়েই আগে ছেলের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলাম।....যাক্; মেয়েটির নাম ছিল চারু, আমরা চারী বলে ডাকতাম। যখনকার কথা বলছি তখন তার বয়েস হবে—এই বছর আষ্টেক। চওড়া চওড়া গড়ন, ঘোরাল মুখ, মাথায় বেড়া বেণী; একটা তিন-পেড়ে কাপড় খাট করে পরা, আঁচলটা কোমরে মোটা করে জড়ান। পায়ে এক জোড়া হাঙর-মুখো মল ছিল, সে যুগে প্রায় সব মেয়ের পায়েই ওটা থাকতো।

“এর ওপর চারীর ছিল টক্‌টকে রং, যা বাংলার পল্লীগ্রামে দুর্লভ বলে টপ করে একটা বিশিষ্টতা এনে দেয়।

“চারীর বাড়িতে শুধু ছিলেন তার বাপ আর ঠাকুরমা। মেয়েদের পক্ষে শুধু বাপ আর ঠাকুরমা থাকা মানে ষোল আনা আদর। চারুর মা ছিলেন না, অর্থাৎ এই আদরের মধ্যে কোথাও শাসনের বালাই ছিল না,। এর ফলে চারুর ছিল পূর্ণ-স্বরাজ এবং সেই জন্যে সে আমার সমস্ত প্ল্যানগুলি পরিপক্ক করে তুলতে আর সবার চেয়ে সময় দিতে পারত। আমি ভুল বলছি, বরং অধিকাংশ প্ল্যান তারই মাথায় জন্ম নিত এবং তারই দক্ষতায় দানা বেঁধে উঠত। সময়ের অভাব না থাকায় আমি

তার হুকুম তামিল করে মতলবগুলি কাজে রূপান্তরিত করতে অন্য ছেলের চেয়ে বেশি সাহায্য করতাম মাত্র।

"আমরা যেখানটায় খেলা করতাম, সে জায়গাটা ছিল বেশ নিরিবিলি। তার একদিকে রাধারমণের মন্দির আর দু'দিকে দেয়াল। সামনেটা খোলা ছিল বটে কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা মাঠ, আর মাঠের শেষে আগাছার জঙ্গল। বাড়ি-ঘর নেই। ঘর-বাড়ি যা কিছু তা মন্দিরের পেছনে কিংবা দেয়াল দু'টোর আড়ালে। অর্থাৎ, জায়গাটা গ্রামের শেষ প্রান্তে আর কি।

"খেলার রকমারি ছিল, বুঝতেই পার। কখন পাঠশালা-পাঠশালা খেলা হ'ত। আমি ছিলাম পাঠশালার কায়েমী পলাতক; সুযোগ-সুবিধে পেয়ে রোজ গড়পড়তা আরও চার-পাঁচটি করে ফেরার জুটত—স্কুল-পাঠশালামিলিয়ে। বেতটা বাদ দিয়ে আর সব বিষয়েই জিনিসটি স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করা হ'ত। এমন কি অনিচ্ছুককে চ্যাং-দোলা করে টাঙিয়ে নিয়ে আসাও বাদ যেত না, আর যাকে টাঙিয়ে আনা যেত, সেও হাত-পা ছোঁড়া এবং অশ্রাব্য গালাগালি প্রয়োগে নকলটিকে সাধ্যমত আসল জিনিসে দাঁড় করাবার চেষ্টা করত। কখন কখন এমন হত যে, ব্যাপারটা অভিনয়ের কোটা থেকে সত্যই বাস্তবে এসে দাঁড়াত। হঠাৎ কোথা থেকে স্কুল বা পাঠশালের সত্যিকার পোড়োরা এসে পড়ত এবং যাকে শখের চ্যাং-দোলা করে আনা হচ্ছে, আর যারা আনছে তাদের সবাইকে আসল চ্যাং-দোলা করে লটকে নিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে যেত। আমি গুরুমশাই হয়ে পাঠশালাতে থাকতাম বলে, কিংবা চারু গুরুমশাই হলে, শিরপোড়ো হয়ে তার তামাক সাজতাম বলে, পালে বাঘ পড়লেই দূর থেকে গা ঢাকা দিতে পারতাম। চ্যাং-দোলা হই নি কখন।

"মাঝে মাঝে এই রকম আকস্মিক রসভঙ্গের জন্যে এ-খেলাটার প্রতি

আন্তরিক টান থাকলেও, বড় বেশি সাহস করা যেত না। এ-ভিন্ন কাণামাছি ছিল, কুমীর-কুমীর ছিল, পাড়ার নিত্য দলাদলির নকল ছিল। কিন্তু সবচেয়ে যা বেশি হত তা অভিনয়ের অভিনয়, অর্থাৎ যাত্রার অনুকরণ।

"সে-সময় আমাদের গ্রামে ও-জিনিসটার খুব চল। নিম্ন শ্রেণীদের দু'টো যাত্রার দল ছিল, ভদ্রলোকদের একটা অপেরা পার্টি। গ্রামের কয়েকটা ছেলে কলকাতায় পড়ত, তারা সহরের আনকোরা আধুনিকতা আমদানি করে একটা থিয়েটার-ক্লাব পর্যন্ত দাঁড় করিয়েছিল। চারটি দলে যা করত, আমরা দুপুরে, মন্দিরের পাশটিতে তার পুনরভিনয় করতাম। যাত্রাটাই আমাদের বেশি এ্যাপীল্ করত; তবে থিয়েটারের সীনের দিকে একটা ঝোঁক ছিল, সেইজন্যে প্রায়ই থিয়েটারের স্টেজে যাত্রার পালা ঢেলে অভিনয় করতাম। কেউ আনত গায়ের র্যাপার, কেউ মায়ের কস্তাপেড়ে শাড়ি, কেউ দিদিমার নামাবলী। নামাবলীটা হ'ত অরণ্যের সীন্, নামের জঙ্গলকে আমরা গাছের জঙ্গল করে নিয়েছিলাম আর কি। পুকুর দেখাতে হলে নামাবলীর মাঝখানটায় ছিঁড়ে দেওয়া হত। ধ্রুবের মা সুরুচি অরণ্যে ঘুরে ঘুরে তৃষ্ণার্ত হয়ে জল খাচ্ছেন দেখাতে হ'লে সুরুচি হাতদুটো অঞ্জলিবদ্ধ করে নামাবলীর ছেঁড়া দিয়ে ভেতর দিকে গলিয়ে দিত এবং ওদিক থেকে ঘটি করে একজন জল ঢেলে দিত,—বাস্তবিকতার নেশায় কখন কখন পানাশুদ্ধ। পুকুরে জলখাবার এমন কৌশল পাড়ার আর কোন পার্টিই দেখাতে পারত না বলে এই সীন্‌টি আমাদের সকলের বড় প্রিয় ছিল। ফলে, নামাবলী পাওয়া গেলেই ধ্রুবের পালা অনিবার্য ছিল, আর ধ্রুবের পালার ফাঁড়া কাটিয়ে কোন নামাবলীকেই কখন অক্ষত শরীরে ফিরে যেতে হয় নি।

"এই সব অভিনয়ে মেন-পার্ট থাকত চারুর। সে মল দুগাছা হাঁটুর

কাছে তুলে, বেটাছেলের মত কাপড় পড়ে, 'দ্রৌপদীর স্বয়ংবর'-এ অর্জুন হয়ে লক্ষ্য বিঁধ্‌ত, 'পাণ্ডবের অজ্ঞত-বাস'-এ ভীম হয়ে কীচক বধ করত, শ্রীকৃষ্ণ হয়ে কংস ধ্বংস করত। মেয়ের পার্ট বড় একটা নিত না; শুধু 'সুভদ্রা হরণ'-এ গোবরার মুখে লাগাম কশে অর্জুনের রথ হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার লোভে সে সুভদ্রা সাজত।

"এই পালাটির জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম। কেন, সে কথা বলবার আগে গোবরার পরিচয়টা দেওয়া দরকার।

"পরিচয়টি আগেই পেতে, কিন্তু তুমি নিজেই বাধা দিয়েছিলে, মনে থাকতে পারে।

"গোবরা আমাদেরই পাঠশালার ছেলে, আমার পরে ভর্তি হয়। দুবেলা এক কোঁচড় করে মুড়ি এনে পাঠশালায় বসে বসে খেত, আর মুড়ি বিলি ক'রে দল পাকাত। এ দিকে মাথা খেলত মন্দ নয়, তবে পড়াশুনোর দিকে বড় একটা ঘেঁসত না। তার সঙ্গে আমার এই দ্বিতীয় বিষয়ে মিল ছিল এবং এরই বলে তাকে ক্রমে পাঠশালা ছাড়িয়ে আমাদের দলে ভেড়ালাম। ভুল হয়ে গিয়েছিল; যাকে বলে খাল কেটে কুমীর ঢোকান, তাই করেছিলাম আর কি। গল্পটা শেষ পর্যন্ত শুনলেই বুঝতে পারবে।....

"আচ্ছা, একটা কথা বিশ্বাস করতে পারবে?"

তারাপদ বলিল, "কি?"

"এই যে, আমি চারুকে ভালবাসতাম।"

তারাপদ সবিস্ময়ে বলিল, "ভালবাসতে? তখন যে তোমরা দুগ্ধ-পোষ্য!"

শৈলেন অবিচলিতভাবে বলিল, "ভালই যদি না বাসতাম তো সর্ব্বদা ওর কাছে কাছে থাকতাম কেন? আর কেনই বা হাজার কাছে

থেকেও মনে হ'ত যথেষ্ট কাছে নেই ? এরই বা কারণ কি যে, ক্রমাগতই ইচ্ছে হ'ত চারু একটা কিছু বিপদে পড়ুক, খুব মারাত্মক রকম বিপদে, যেমন ভূতে তাড়া করা, কিংবা হাতীতে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরা, কিংবা মাঝ গঙ্গায় নৌকো থেকে পড়ে যাওয়া—আর আমি তাকে উদ্ধার করি। ভালবাসার লক্ষণ নয় ? তা ভিন্ন পাঠশালা থেকেও যে কায়েমী ভাবে অনুপস্থিত থাকতাম, তারও মূলে ছিল চারুর প্রতি অনুরাগ, শুধুই গুরুমশাইয়ের প্রতি বিরাগ নয়।

"একদিন দুপুরে 'সুভদ্রা-হরণ' হবে ঠিক হয়েছে। আমার মনটা খুব হৃষ্ট, কেননা এই পালায় আমি সাজতাম অর্জ্জুন। সকালে পাঠশালায় গেলাম—রথের ঘোড়াকে খবর দেবার জন্যে। তখন ঘোড়া সাজত নিবারণ। খবর পেলাম, সে চার পাঁচ দিন আসে নি। গোবরা ওদের পাড়ার ছেলে ; জিগ্যেস করতে বললে, 'তার ক'দিন থেকে অসুখ।' দুশ্চিন্তায় পড়া গেল।

"একটু পরে গোবরা প্রশ্ন করলে, 'কেন রে নিবারণকে ?'

"ছেলেটা নালিশ করতে এক নম্বর। এর কাছে সব কথা হুট্‌ করে বলা নয় ; বললাম, 'না, এমনি।'

"কিন্তু ঘোড়ার ভাবনায় মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে রইল। একটু পরে একটা টোপ ফেলে দেখলাম ; বললাম, 'আজ আমাদের ওখানে যাত্রা হবে কি না....'

"গোবরা স্লেটে একটা বর্তুলাকার মুখ এঁকে তাতে দাঁত বসাচ্ছিল। মুখ না তুলেই জিগ্যেস করলে, 'কার দল রে ? মথুর সা'র ? তার দল হ'লে একবার দেখতাম।'

"আমি উত্তর করলাম, 'কেন, মথুর সা'র চেয়ে ভাল দল আর হ'তে নেই ?'

"একটু উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করলে, "কি পালা রে?'

"বললাম, 'সুভদ্রা-হরণ।'

"গোবরা আমার মুখের দিকে চাইলে। তারপর আবার নির্লিপ্ত ভাবে দাঁত আঁকতে লাগল। আমি জিগ্যেস করলাম, 'যাবি না কি?'

"গোবরা একটু নিরাশভাবে বললে, 'না ভাই, পাঠশালা রয়েছে যে।'

"আমি বললাম, 'ঠাকুর-দেবতার পালা দেখলে আবার নাকি দোষ হয়?'

"পাশের অনাথকে সাক্ষী মানলাম। সে কম কথায় সারে, বললে, 'দোষ হলে আর পাঠশালায় বসে পেল্লাদ কেষ্ট নাম করত না।'

"আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'তুই যাবি না কি তা হ'লে?'

"অনাথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নাক সিঁটকে বললে, 'ধ্যাৎ!'

"গোবরা সে দিন ধরা দিলে না। কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা গেল নিজেই নিবারণের সঙ্গে হাজির হয়েছে। সে দিন আমাদের 'রিজিয়া।' দুদিন আগে কলেজের ছেলেরা প্লে করেছিল। নিবারণের পার্ট ছিল না। সে আর গোবরা অডিয়েন্স হয়ে স্টেজের বাইরে দুখানা চেয়ার নিয়ে বসল। ঘাবড়ো না, 'চেয়ার' মানে অবশ্য থান ইঁট।

"নতুন দর্শক পেয়ে খুব চুটিয়ে প্লে করা গেল। ওঠবার সময় গোবরা বললে, 'তোরা করিস্? তবে যে বললি, মথুর সা'র চেয়েও ভাল দল?'

"আমি মনে মনে চটলাম। বললাম, 'মথুর সা'রা পেশাদার....'

"তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল; বিজয়গর্বের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, 'মথুর সা'র দলে সত্যিকার মেয়ে আছে?'

"গোবরা ঠোঁট উল্‌টে বললে, 'আহা, সত্যিকার মেয়ে হ'লেই যেন হ'ল। তোদের রিজিয়া না হয় মেয়েই, কিন্তু অন্তার দাদার কাছে দাঁড়াতে পারে?'



ঠাকুর দেবতার পালা দেখলে আবার না কি দোষ হয় ?

"আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম, বললাম, 'খুব বুঝেছিস তো ! রিজিয়া মেয়ে ছিল না কি ? ওতো পেনোর ভাই, ওর মাথায় তো ওটা বাবরি চুল।'

"তারকেশ্বরের মানত চুল নিয়ে পেনোর ভাই হারাধন খুব ঠকিয়েছে দেখে আমি আর হাসি সামলাতে পারছিলাম না। এমন সময় অন্য সবার সঙ্গে চারু এসে সামনে দাঁড়াল। ঝুঁকে, পায়ের মল নামাতে নামাতে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে, 'কিরে শৈল, হাসছিস্ কেন অত?'

"সে সেজেছিল বক্তিয়ার, তিনপেড়ে শাড়ির মালকোঁচামারা বক্তিয়ার! বললাম, 'এ তোকে ভেবেছে বেটাছেলে আর হারাধনকে ভেবেছে মেয়ে মানুষ!

"সকলে আবার হেসে উঠলাম।

"চারু একটু গম্ভীর হয়ে, একটু হেসে, চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, 'এবার থেকে তোরা আমায় চারু-দা বলে ডাকবি, খবরদার।'—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা আলগা করে হো-হো করে হেসে উঠল।

"গোবরার অবস্থাটা যা হল তা আর বর্ণনা করে কাজ নেই, শুধু কাঁদতে বাকি রৈল বেচারির। মুখ রাঙা করে বললে, 'রোসো, তোমাদের সবার ভিরকুটি ভাঙ্ছি গুরু মশাইকে বলে—মেয়েদের সঙ্গে মিশে এই সব খেলা হয় বাবুদের! নিবারণ, তোমারও এই বিদ্যে! বেশ…'

"নিবারণ বললে, 'দিস্ বলে; ভারি ভয়, ওঃ!'

"চারু একটু এগিয়ে এল, গলা বাড়িয়ে বললে, 'তুই মেয়ে মানুষ দেখলি কোথায় রে এর মধ্যে? আমি তো চারু চন্দোর ভট্টাচার্য। বলে সোজা হয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল। আর একটা হাসির রোল উঠল।

"তার পর দিন বিকেলে পাঠশালার ফেরত গোবরা আবার এসে হাজির। বললে, 'চল সব, গুরু মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।'

"বিকেলে তখন অনেক ছেলে জুটেছে, তুমুল বেগে কি একটা হুটোপাটি খেলা হচ্ছে; কেউ ওর কথায় বড় একটা কান দিলে না। শুধু



আমি তো চারু চন্দোর ভট্টাচার্য

পাচী বলে একটা মেয়ে খেলার মাঝেই শরীরটা অষ্টাবক্র করে হাতের আঙুলগুলো ছেতরে গোবরার কথাগুলোই বিকৃত করে ভেংচে উঠল। তারপর আর কেউ ওর কথা ভাবলেও না এবং অনেকক্ষণ পরে খেলার

মাঠে একটা ছেলের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে পড়ে গিয়ে যখন ঝেড়ে ঝুড়ে উঠলাম—দেখি ছেলেটা আর কেউ নয়—আমাদের গোবরা।

"সেই থেকে গোবরা ভিড়ে গেল আমাদের দলে। অবশ্য রোজ আসত না, তবে খুব বেশি দেরিও করত না, আর যতদিন যেতে লাগল ততই তার হাজির ঘন ঘন হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে আমাদের থিয়েটারের অডিয়েন্স হওয়া থেকে একদিন স্টেজের উপর তার প্রোমোশন হ'ল।

"সেদিন আমাদের 'রাধারমণ থিয়েটার পার্টি'র—আজকালকার ভাষায় বলতে গেলে—শ্রেষ্ঠ অবদান....'সুভদ্রা-হরণ'। অশ্বিনীকুমার নিবারণ অনুপস্থিত—ঘোষালদের কাচ-বাঁধান দেয়াল টপকে বেল পাড়তে গিয়ে তার খুরে কাচ বিঁধে গেছে।

"গোবরা ছিল, তাকে বললাম, তুই ঘোড়া হ গোবরা, হবি?'

"গোবরা বললে, 'যাঃ, ঘোড়ার পার্ট আবার মানুষে করে!'

"একটু থেমে বললে, 'যদি করি তো ও-রকম পেছনে ঝাঁটা বেঁধে ন্যাজ করতে পারব না।'

"অগত্যা লাঙ্গুলহীন ঘোড়াই নামান হ'ল সেদিন। স্টেজে নেমে কিন্তু চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দ করে, ঠোঁট্ কাঁপিয়ে, লাগামে ঝাঁকানি দিয়ে এবং পেছনের নারকেল-ডেঁপোরের রথে অর্জুন আর সুভদ্রাকে দু' একটা লাথি ঝেড়ে ঘোড়া সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিলে! এক মুহূর্তেই প্লে'টার চেহারা বদলে গেল। খুশিতে, বিস্ময়ে চারু তো স্টেজের মর্যাদা ভুলে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়েই উঠল।

"তখুনি সীন নামিয়ে দেওয়া হ'ল। একটু পরে যখন আবার সীন্ উঠল বিস্মিত অডিয়েন্স দেখলে ঘোড়ার পেছনে অস্তাদের লক্ষ্মীনারায়ণের

রূপোর চামর বাঁধা, আর সুভদ্রা আর তারকেশ্বরের চুলওয়ালা নকল-মেয়ে হারাধন নয়, স্বয়ং চারু।

"এই দারুণ সীনটির লোভে চারু কায়েমী ভাবে সুভদ্রার পার্ট নিলে, একাদিক্রমে চার দিন এই খেলাই চলল। সে যুগে এটা রেকর্ড।

"চারু গোবরার এত ভক্ত হয়ে পড়ল যে, কোথা থেকে খুঁজেপেতে একটা সম্বন্ধও বের করে ফেললে—গোবরা তার ভাই হয়।—অর্থাৎ এত বড় একটা স্টার-অ্যাক্‌টারের সঙ্গে আত্মীয়তা না বের করে সে সন্তুষ্ট হ'তে পারল না।

"আমার কিন্তু মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বুঝতে পারলাম আমার ভালবাসার ক্ষেত্র আর মসৃণ নয়—গোবরা হতভাগাও মজেছে, সেও...."

তারাপদ, "থামো!" বলিয়া, হাতটা বারণের ভঙ্গিতে উঁচু করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, বলিল, "নিঃসাড়ে, নির্বিবাদে শুনে যাচ্ছি বলে তুমি যে দস্তুরমত রোমান্স ফেঁদে ব'সলে দেখছি হে! একটি মেয়ে, দুটি ছেলে—that damned eternal triangle again!" (সেই শাশ্বতী ত্রয়ী) "মতলবখানা কি বল দিকিন?"

শৈলেন বলিল, "হিংসে আছে, দ্বেষ আছে, চক্রান্ত অভিসন্ধি, এমন কি হত্যা পর্যন্ত....রোমান্স বলতে আপত্তি থাকে, ব'ল না।....

"নানাভাবে লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে লাগল। প্রথম প্রথম গোবরা আমাদের বেশ একটু চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। খেলার মধ্যে আমরা দুজনে, অর্থাৎ আমি আর চারু একটু কাছে কাছে থাকতাম, কেন না আর সবার তুলনায় আমাদের দুজনের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতাই ছিল। প্রায় দেখতাম, আমরা খুব ঘেঁসাঘেঁসি হ'তেই গোবরার বক্রদৃষ্টি আমাদের ওপর এসে পড়েছে। চারু কিছু বুঝত না, কেন না তার মনটা ছিল নি-দাগ, আমি কিন্তু একটু থতমত খেয়ে

যেতাম, কেন না আমি চারুর সান্নিধ্যটা বেশ একটু সূক্ষ্মভাবে উপভোগ করতাম।

"এমনও হয়েছে—দুপুরবেলা, রোদ ঝাঁঝাঁ করছে, আমার মত নিতান্ত এলে-দেওয়া ছেলে এবং চারুর মত নেহাৎ আদরে-গলা মেয়ে ভিন্ন কেউ বাড়ির বার হতে পারে না। আমরা দুটিতে মন্দিরের রকের কোণে বেলগাছের ছায়ায় পাশাপাশি বসে গল্প করছি, হঠাৎ গোবরা নিতান্ত একটা অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুল। আমাদেরই আশ্চর্য হবার কথা, সে কিন্তু আগে ভাগেই কপালে চোখ তুলে প্রশ্ন করলে, 'তুই এখানে, শৈলেন? আর আমি চারিদিক্ খুঁজে হয়রান হচ্ছি?'

"চারু হয়তো প্রশ্ন করলে, 'কেন রে গোবরা?'

" 'ওকে গুরুমশাই ডেকেছেন।'

" 'কেন?'

" 'কেন তা ও-ই জানে আর গুরুমশাই জানে। আর ডাকবে না? রোজ রোজ পাঠশালা কামাই করে এখানে এসে একলা বসে থাকা....'

"চারু বললে, 'একলা কেন? এই তো আমি রয়েছি।'

"এর উত্তর গোবরা দিলে না। আমিও চুপ করে রইলাম। একটু পরে গোবরা বললে, 'চল্ শৈলেন, বসে রইলি যে?'

"আমি রেগে-মেগে বললাম, 'যাঃ, যাব না।'

"গোবরা বললে, 'তা হ'লে যাই আমি, বলে দি'গে যে....'

"আমি তাই চাই—বেশ জমাট গল্প চলছিল, আপদ বিদেয় হ'লেই বাঁচি, বললাম, 'যা, এক্ষুণি যা,....যাচ্ছিস না যে?'

"গোবরা বললে, 'তোর হুকুম?'

"চারু বললে, 'তার চেয়ে তুইও আয় না গোবরা, একটু পরেই তো নন্তী, ফেলা, এরা সবাই আসবে।'

"গোবরা অবশ্য আসতেই চায়, কিন্তু আসে না। বলে, 'হ্যাঁ, শৈলর সঙ্গে আমায় কেউ দেখে ফেলুক!'

"ছবিটি আমার যেন চোখের সামনে ভাসছে। চারু আঁচলটা দাঁতে কামড়ে, রকের নীচে পা নামিয়ে গোড়ালি ঠুকে ঠুকে মল বাজাচ্ছে, সমস্ত শরীরটাও দুলছে, আমার পা দোলান বন্ধ হয়ে গেছে—খানিকটা দূরে সিঁড়ির ও-দিকটায় গোবরা দাঁড়িয়ে। গোবরার শেষের কথাটায় কি ছিল, চারু একেবারে 'হো হো' করে হেসে উঠল। বললে, 'তা হ'লে শৈল না থাকলে আসবি তো? তুই যা তো শৈল।'

"সঙ্গে সঙ্গে গলাটা বাড়িয়ে নিয়ে এসে আমার কানে কানে বললে, 'তুই অম্‌নি ঘুরে পাঠশালা থেকে সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়, উল্টে ওকেই চ্যাং-দোলা করে নিয়ে যাক....'

"তারপর কি যে হ'ল মনে পড়ছে না; ছেলেবেলার অনেক ছবিই তো খানিকটা খানিকটা ঝাপসা হ'য়ে যায়?—তবে গোবরাঘটিত আর এক দিনের কথা সমস্তটাই স্পষ্ট মনে আছে। চারুকে মন্দিরে না পেয়ে তার বাড়িতে গেলাম। দেখি, ঘরে বারান্দায় বাঘবন্দীর ছক্ কেটে চারু আর গোবরা একাগ্রচিত্তে খেলায় মগ্ন। গোবরার পাশে পাঠশালার বই-শ্লেট রাখা। চারু একবার চোখ তুলে আমার দিকে চাইলে, কিন্তু বোধ হয় খুব অন্যমনস্ক ছিল বলে কিছু বললে না। গোবরা আমার দিকে পেছন ফিরে ছিল।

"আমার গায়ে যেন আগুন ছড়িয়ে দিলে। ছেলেবেলার কণ্ঠে যতটা কটুতা ভরা যায়, আর নেহাৎ কমও যায় না—ততটা ভরে বললাম, 'হ্যাঁ রে গোবরা, আর নিজের বেলায় বুঝি পাঠশালা কামাই হয় না?'

"গোবরা চমকে ফিরে দেখে যেন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল।

" 'বাঃ আমি তো যাচ্ছিলাম পাঠশালা, আমার তেষ্টা পেয়েছিল তাই....'

" 'আহা পাঠশালায় তো জল পাওয়া যায় না !....'

"চারু আধশোওয়া হয়ে খেলছিল, যেন ফণা ধরে উঠে বসল, হঠাৎ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেল, 'ও খাবে না পাঠশালার জল, তোর কি রে? আ-মর! বাড়ি বয়ে কোঁদল করতে এল দেখ না! যা বেরো, ও যখন তোর বাড়িতে যাবে বলিস'খন। আ-গেল যা! নিজে সারাদিন টো-টো করে বেড়াচ্ছে, তাতে কিছু নয়, আর ও বেচারি....তুই উঠিস নি তো গোবরা, ও কি করে আমি দেখব....'

"আমি হন্ হন্ করে বেরিয়ে এলাম; রাগ ছিল, অভিমান ছিল, আর কি ছিল ঠিক মনে পড়ে না, তবে খানিকটা গিয়ে প্রায় যখন মন্দিরের কাছাকাছি হয়েছি, হঠাৎ আমার গলা বন্ধ হয়ে এল, চোখে কি যেন ঠেলে উঠতে লাগল এবং বাপ-মা প্রভৃতিকে অনেক দিন দেখি নি বলে আমি কাপড়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

"হতাশ প্রেমের অশ্রু এই রকম একটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা অবলম্বন ক'রে উপছে ওঠে কি না, তোমরাই বলতে পার।

"তিন দিন যাই নি। চতুর্থ দিন চারু নিজে এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল। রাস্তায় একবার আমার কাঁধে হাত দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'তোকে কথাগুলো বলে এত কষ্ট হয়েছিল, শৈল, মাইরি বলছি।'

ছেলেবেলার ভাঙ্গন দু'কথাতেই জোড়ে, গেলও জুড়ে; তবে—গোবরা-ঘটিত ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে লাগল। গোবরা সেদিন খুব আস্কারা পেয়েছিল। তারপরেও যে তিনদিন যাই নি, সে তিনদিনও নিশ্চয়ই তার একাধিপত্য গেছে। সে যে ক্রমে ক্রমে আমায় পরাস্ত ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র থেকে সরাচ্ছে, তাতে আর তার সন্দেহ ছিল না। এর পরেও দু'একটা ব্যাপার ঘটল, যাতে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা

পরিপুষ্ট হবার বেশ অবসর পেলে। তারপর একদিন সে মনের কথাটা স্পষ্টই বলে ফেললে।

"সেদিন আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ অবদান 'সুভদ্রা-হরণ'। প্রথামাফিক আমি সাজব অর্জুন, চারু সাজবে সুভদ্রা, গোবরা সাজবে ঘোড়া। ল্যাজের জন্য পেছনে চামর বাঁধবার সময় কিন্তু হঠাৎ সে বেঁকে বসল, বললে, 'না, আমি ও সাজব না।'

"প্রথমে সকলে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করলাম, গ্রামের যাত্রা-থিয়েটারে এইরকম প্রায় হয় বলে আমাদের যাত্রারও যেন কদর বেড়ে গেল। 'ঘোড়া বেঁকে বসেছে' বলে বেশ একটা আমোদ-মিশ্রিত রব উঠল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঘোড়ার জিদে সব পণ্ড হয় দেখে সবাই চটে উঠল। কে একজন জিগ্যেস করলে, 'তবে, তুই কিসের পার্ট নিবি শুনি?'

"গোবরা খানিকটা গোঁজ হয়ে রইল, তারপর আরও সবার পীড়া-পীড়ির পর ঘাড়টা বেঁকিয়ে বললে, 'আমি অর্জুনের পার্ট নেব।'

"সকলে এত বিস্মিত হয়ে উঠল, যেন সত্যিই একটা ঘোড়া অর্জুনে রূপান্তরিত হ'তে চাচ্ছে; কয়েকজন একসঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'অর্জুনের!'

"গোবরা বললে, 'বাঃ, কেন হব না? দুবার ঘোড়া সেজেছি বলে আমি যেন মানুষ নই! আমি শৈলর চেয়ে ঢের বড়, ওর চেয়ে ঢের সুন্দর। আর ও আসুক দিকিন আমার সঙ্গে কুস্তিতে।'

"চারু একেবারে কপালে চোখ তুলে বলে উঠল, 'সে কিরে! তুই আমার সম্পর্কে দাদা হ'স না? বলতে তোর আটকাল না জিভে? তুই অর্জুন সাজলে আমার সুভদ্রা সাজা চলে? তুই যে অবাক্ করলি রে।'

"নন্তী গালে তর্জনী ঠেকিয়ে বললে, 'পাঠশালে পড়ে তোর'এই বিদ্যে হচ্ছে গোবরা!"

"মাসখানেক থেকে পাঠশালে যে তার কোন বিদ্যেই অর্জন হচ্ছে না সে কথাটা অবশ্য কেউ তুললে না।

"নিবারণ বললে, 'আর তুই কুস্তিতে যদি শৈলকে হারাতে পারিস, তা হলে তো তুই ওর দাদা ভীম হলি, চারী তা হলে তোর ভাদ্দর-বৌ হ'ল না?'

"সে দিনে আর প্লে হ'ল না। ভালই হ'ল, কেন না গোবরা আমার দিকে এমন ভাবে চাইলে, যাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, সে ঘোড়া সাজলে একটি খুর যা ঝাড়ত, তাতে বীর অর্জুনকে আর এ জন্মে গাণ্ডীব তুলতে হ'ত না।

"এর ফল এই হল যে আমার আর চারুর সম্বন্ধটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থাৎ, চারু সুভদ্রা হলে আমার অর্জুন হ'তে কোন দোষ নেই। বরং সব দিক দিয়ে আমিই যোগ্য।....তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, তারাপদ, এর পরে আমাদের দুজনের মনে মনে যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল। করছ না বিশ্বাস?"

তারাপদ বলিল, "বিশ্বাস করি আর নাই করি, ওর কাব্যটুকু উপভোগ করতে বাধা হচ্ছে না। কৈশোরের প্রেম বড় মধুর; আমাদের ধর্ম তাই একে দেব-মুখী করে শাশ্বত করে রেখেছে। সত্যিই নিজের শুদ্ধতার জোরে এ-প্রেম প্রেমাস্পদকে দেবতার সঙ্গে একাসনে....।"

শৈলেন তারাপদর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে হাসিতে লাগিল; বলিল, "ঠিক বলেছ, দেবতার সঙ্গে একাসনই বটে। সেই কথা বলব বলেই আজ এত কথার অবতারণা।

"সে দিন কি একটা অজ্ঞাত কারণে সকাল থেকেই ভাল ছেলে

হবার ঝোঁক চেপেছিল। খুব ভোরে উঠলাম। বইয়ের ছেঁড়া পাতাগুলি জেয়ল আঠা দিয়ে জুড়ে বইগুলোতে মলাট দিলাম, তারপর খাবার-টাবার খেয়ে বই-শ্লেট নিয়ে পাঠশালায় বেরুলাম।

"রেল পেরিয়ে চারুর সঙ্গে দেখা; জিগ্যেস করলে, 'কোথায় চলেছিস রে শৈল? পাঠশালায়?'

"মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম।

"জিগ্যেস করলে, 'আজ আসবি না—?'

"বললাম, 'না। বাঃ, পাঠশালায় যেতে হবে না? শুধু তোদের সঙ্গে খেলা করলে চলবে আমার?'

"চারু শুধু ঠোঁটটা একটু উল্টে চলে গেল। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে জিগ্যেস করলাম, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?'

"বললে, 'সজনে ফুল কুড়ুতে ঘোষেদের পুকুরপাড়ে।'

"আমি আবার পাঠশালা পানে ঘুরলাম বটে, কিন্তু দু'পা এগুতে পাঠশালা আর সজনে ফুল, অর্থাৎ গুরুমশাই আর চারুর দোটানায় পড়ে গতিটা শ্লথ হয়ে উঠল এবং হঠাৎ যখন মনে হ'ল, সজনে ফুল কুড়িয়ে বাড়িতে তরকারির সাহায্য করাও ভাল ছেলের একটা লক্ষণ, তখন বেশ একটা তৃপ্তি পেলাম।

"সেদিন সকাল বেলাটায় কিছু একটা ছিল। যেমন নিজেকেও খুব ভাল লাগছিল, ঘোষেদের পুকুর-পাড়ে চারুকেও তেমনি যেন বেশি করে মিষ্টি বোধ হচ্ছিল। তাকে ঝরে-পড়া ফুল কুড়ুতে দিলাম না, আমি থাকতে সে বাসি ফুল কুড়ুবে? গাছে উঠে ডাল ভেঙে ভেঙে টাটকা ফুলে তার কোঁচড় ভর্তি করলাম। কিছু আমও চুরি করে দিলাম। তারপর বাস্তবক্ষেত্রে আর তার কোন উপকার করবার উপায় না দেখে বললাম, 'আজ রিজিয়ার থিয়েটার করবি চারী?'

"মানে, তা হলে বক্তিয়ার সেজে বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে হত্যা করা যায়। বইয়ে যাই থাক না কেন। চারুর জন্যে একটা প্রকাণ্ড কিছু না করতে পারা পর্যন্ত যেন স্থির হ'তে পারছিলাম না। যদি পারি তো বীরেন্দ্রের পার্টটা গোবরাকেই দোব।

"চারু একটা টোকো আম দাঁত দিয়ে কুরে কুরে খাচ্ছিল। চোখমুখ কুঁচকে বললে, 'না।'

"জিগ্যেস করলাম ; 'কেন রে?'

"চারু বিরক্তভাবে বললে, 'সাজ নেই, কিছু নেই, আমি অমন নামাবলী গায়ে দিয়ে রিজিয়া সাজতে পারব না, যাঃ।'

"একটু আশ্চর্য হলাম, কেন না চারুর কোন কালে পোষাকের ফ্যাসাদ ছিল না। কথাবার্তায় রহস্যটা বোঝা গেল। আগের দিন শীতলাতলায় কলকাতার গণেশ পরামাণিকের দল গেয়ে গেছে। তারা আনকোরা-নতুন সাজে একবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে রুক্মিণী—সে আবার ঢুকল, ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের মত একটা প্রকাণ্ড গোলাপী রেশমী শাড়ি পেছনে টানতে টানতে। ও-জিনিসটা তখন সদ্য কলকাতায় যাত্রা থিয়েটারে ঢুকেছে, আর নির্বিচারে চলেছে, এখনকার স্টেজে গ্রীক্-প্যাটার্ণের অভিবাদনের মত,—সেলুকাসের সেনাও ওই করছে, আবার শ্রীকৃষ্ণের দ্বাররক্ষীও ওই করছে ; সেদিন এক জায়গায় দেখলাম বৈকুণ্ঠে দেবর্ষি নারদও মাথায় বীণা তুলে ঐ ইউনানী অভিবাদন করলে।....তুমি হাসছ যে,—অমরলোকে না হয় সেখানকার বাসিন্দাদেরই মৃত্যু নেই, তা বলে পুরনো স্টাইল মরে নতুন স্টাইলও ঢুকবে না, এমন কোন সর্ত আছে না কি?

"আমি একটু ব্যাকুল হয়ে উঠলাম ; চারুর ভাল পোষাক পরবার সাধ হয়েছে, এই সময় যদি কিছু করা যেত! বিশেষ করে চারুর

মনোরঞ্জনের জন্যে আমার আর গোবরার মধ্যে যে রকম রেষারেষি চলছে।

"গল্প করতে করতে আমরা ঘাটে শানের বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। আমি বললাম, 'বৌদির ট্রাংকে একটা শান্তিপুরে ডুরে শাড়ি আছে, যদি বলিস তো দুপুর বেলায় যখন ঘুমুবে....'

"চারু ঠোঁট দুটো কুঁচকে বললে, 'মিছে বকিসনে শৈল, ডুরে শাড়ির না কি আবার উড়ুনি হয়, তাও আবার শান্তিপুরে! অরুচি।"

"বৌদির পরই জেঠাইমা আর ঠাকুরমা—থান আর নামাবলী। আমি অসহায়ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম।

"একটু পরে মল-শুদ্ধ্ পা শানে ঠুকতে ঠুকতে চারু বললে, 'এক জায়গায় পাওয়া যায়।'

"আমি ব্যগ্রভাবে বললাম, 'কোথায় বল্ তো?'

চারু উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে চেয়ে গা দোলাতে লাগল। আমি আবার প্রশ্ন করতে বললে, 'সে তোর দ্বারা হবে না।'

"বললাম, 'বলই না।'

"বললে, 'রাধারমণের মন্দিরে।'

"আমার সমস্ত অন্তরাত্মা মন্দির ওলট-পালট করে এল। নিষ্ফল হয়ে আবার জিগ্যেস করলাম, মন্দিরে কোথায় রে?—সেখানে তো দোলনা, ঠাকুরের শোবার খাট, নৈবিদ্যির থালা....'

"চারু আচলটা দাঁতে চেপে পালিশ করতে করতে বললে, 'রাধার গায়ে।'

"বলে, ফল কি হল দেখবার জন্যে একবার আড়চোখে আমার দিকে চাইলে। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'রাধার উড়ুনি তুই গায়ে দিবি!'

"চারু বোধ হয় ভয় পেয়ে গেল, তাড়াতাড়ি বললে, 'বাঃ, তাই বললাম না কি?'

"তারপরে গম্ভীরভাবে উঠে পড়ে বলল, 'বাড়ি যাই, তুই পাঠশালে যাবি নি? খালি মেয়েদের সঙ্গে খেলা!'

"চারু রেগেছে। এক সঙ্গে আসতে আসতে খানিক পরে আমি বললাম, 'আর যদি কেউ টের পায়? তা ছাড়া পাপও তো বটে?'

"চারু কোঁচড় থেকে এক মুঠো সজনে ফুল বের করে শুঁকতে শুঁকতে বললে, কে তোকে বলেছে?—তার চেয়ে গোবরাকে বললে বরং....'

"চারু ঈর্ষার শক্তির কথা জেনেই কি ওকথা বলেছিল? মেয়েমানুষ,—ওদের মনের বৃত্তি কখন থেকে অংকুরিত হ'তে থাকে কে জানে? কিন্তু ঐতেই—ঐ গোবরার নাম এনে ফেলতেই—ফল হ'ল।

"তারপর দিন দুপুরের পূজো করতে ঢুকে পুরুতঠাকুর দেখলেন রাধার গা খালি। একটুখানির মধ্যেই গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল।....সিগারেটের টিনটা নড়িয়ে দাও দিকিন, দেশলাইটাও,—থ্যাংক্‌স্‌'।

"কখন চুরি গেল, কে করলে, কেমন করে—সে সব কথা থাক্‌। আজ একটু আগে বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম—না? আসল কথা হচ্ছে—রাস্তা দিয়ে একটা লোক খানিকটা জরি-বসান গোলাপী রেশম নিয়ে যাচ্ছিল, দুপুরের রোদে ঝলমল করছে। আলোয় ঝলমল গোলাপী রঙ এখনও আমায় চঞ্চল করে তোলে। আমি আর বর্তমানে থাকি না। কালের পর্দা হালকা রেশমের মতই ফরফরিয়ে উড়তে থাকে—দেখি তার ওপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে দুটি কিশোর-কিশোরী, স্থান—একটি পোড়োবাড়ির একটি নিভৃত প্রান্ত।

"মেয়েটির গা একটি জরির পাড় দেওয়া গোলাপী রেশমে জড়ান। তার ভাজে ভাঁজে ওপর থেকে এসে পড়েছে দুপুরের সূর্যের চোখ-



দাঁড়িয়ে আছে দুটি কিশোর-কিশোরী

ঝলসান আলো ; তাতে ভেতরের গায়ের রং আর বেড়াবেণীর ঝিক্‌মিকি যেন হয়ে উঠেছে রূপকথার মায়া। ছেলেটি বিজয়গর্বে দাঁড়িয়ে আছে ; রাজকুমারীকে সোনার গাছের হীরের ফল এনে দিয়ে অরূপকুমার নিশ্চয় একদিন এই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।"

তারাপদ একটু অপেক্ষা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "তারপর ?"

শৈলেন বলিল, "হ্যাঁ একটা 'তারপর' আছে বৈকি ;—তারপর সেই দৃশ্যমঞ্চে পুরোহিত প্রমুখ গ্রামের একপাল লোকের প্রবেশ—দুপুরের চেয়েও উগ্রমূর্তি সবার ; পথনির্দেশক গোবরা। ....হ্যাঁ, বলেছিলাম, এ রোম্যান্সে হত্যা পর্যন্ত আছে, সেটা আর কিছু নয়, তোমার গার্ভিস-লিকো-পড়া মনে ঔৎসুক্যটা জাগিয়ে রাখবার জন্যে ; ক্ষমা কর।....ও কি !—তোমায় হঠাৎ অমন উদাস দেখচ্ছে কেন ? রেশমী উড়নীর মায়ার ছোঁয়াচ, না, গোবরার হাতে হত্যা হলাম না বলে নিরাশা ?—তার হাতে যতটুকু ছিল তা তো সে করেই ছিল।"

মদনগোপালের বিরহ

[১]

সৌভাগ্য দেখা দিল ব্যঙ্গের আকারে। একেই বলে কপাল।

এতদিন অত চেষ্টা করিয়াও চাকরির দেখা সাক্ষাৎ নাই, যেই এদিকে শ্বশুরের সঙ্গে কাকার মনকষাকষিটা মিটিল, দিব্যি ডাগোর ডোগোরটি হইয়া রাজু ঘরে আসিয়া উঠিল, ওদিক হইতে দাদার চিঠি আসিল—"বাবুকে বলে কয়ে মদনার একটা কাজের যোগাড় করেছি, শীগ্‌গির তাকে পাঠিয়ে দেবে।"

তিনটি দিনও হয় নাই রাজুর আসার। কাকা রাম পণ্ডিতের নিকট গিয়াছিল, কালই যাওয়া স্থির হইয়াছে। মদনের মনটা বড় খারাপ হইয়া আছে সমস্ত দিন। সন্ধ্যার সময় হালের বলদ জোড়া কোন রকমে ঠেলিয়া ঠুলিয়া আনিয়া গোয়ালে তুলিল। এর পরে অন্য দিন একটু বেশ করিয়া তামাক খাইয়া ধামি করিয়া মুড়ি, চিঁড়া যা হয় একটা কিছু লইয়া বসে; ডবকা ছেলে, খাওয়ার দিকে একটু ঝোঁক বেশি। আজ কিন্তু সে সব কিছু করিল না; ভাজের সন্ধানে ঘরগুলোতে একবার করিয়া উঁকি মারিল, দেখিতে না পাইয়া দোলনায় কোলের ভাইপোটিকে ঘাঁটিয়া ঘুঁটিয়া কাঁদাইয়া দিল, এবং তাহাতেও ভাজ উপস্থিত না হওয়ায় খিড়কির আম বাগান দিয়া পুকুরের দিকে অগ্রসর হইল।

বেশি দূর যাইতে হইল না। দুই জায়ে পুকুরে গা ধুইয়া খোকার গলার আওয়াজে একটু ত্রস্ত পদেই চলিয়া আসিতেছিল। মাঝ পথে দেখা হইল। মদন একটু গরম হইয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় থাক, বড় বউ? সেই থেকে তোমায় খুঁজে নাজেহাল হচ্ছি!...."



নাজেহাল হচ্ছ।

দুই দিককার আগাছার মধ্যে, একজনের যোগ্য এক ফালি রাস্তা; দুই জনেই দাঁড়াইয়া পড়িল। দুই জনেরই ভিজা কাপড়, বড় বৌয়ের কাঁকালে একটা পিতলের ঘড়া। বড় বৌয়ের আড়ালে থাকিলেও রাজু

স্বামীকে দেখিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় ভিজা কাপড়ের ঘোমটা তুলিয়া দিল।

বড় বৌ হাসিয়া বলিল, "নাজেহাল হচ্ছ!—বলি আমায় খুঁজে খুঁজে, না, আর এক জনাকে গো কর্ত্তা?"

পিছনের মূর্তিটি একটু দুলিয়া আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। মদন গম্ভীর হইয়া বলিল, "তামাসা রাখ, সব সময় তামাসা ভাল লাগে না। তোমাদের ফূর্তি, এদিকে আমার যে সমস্ত দিন কেমনভাবে কাটছে...."

ভাজ মুখটা দুলাইয়া ভ্রূ দুইটা উঁচু করিয়া বলিল, "ও মা, তাই নাকি! তা দুটি বোনে একত্তর হয়েছি, হবে নি একটু ফূর্তি গা?....নাও, এখন পথ ছাড় দিকিন্ মদনমোহন ঠাকুর, রাই বেচারি যে...."

মদন সেইরূপ স্বরেই বলিল, "ও যাক্ না, ওকে কে আটকাচ্ছে? তোমার সঙ্গে দরকার, আর এই জায়গাই ভাল, একটা সলা পরামর্শের কথা আছে।....নাও, ওকে যেতে বল"—বলিয়া বন ঘেঁসিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

রাজু কিন্তু নড়িল না। আরও একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া গুটি সুটি মারিয়া সেই খানেই স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। বড় বৌ একবার ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার অবস্থাটা দেখিয়া লইল, তাহার পর আবার দেবরের পানে চাহিয়া বলিল, "তাই কি পারে গা—বরের ঘাড়ের ওপর দিয়ে একা চলে চলে যেতে?....কি সলা-পরামর্শ? বাড়ি গিয়ে হয় না?"

"বলছিলাম—কলকাতায় আমি যেতে লারব।"

ভাজ বিস্মিতভাবে ক্ষণমাত্র মুখের দিকে একবার চাহিল, তাহার পর খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; পিছনের মানুষটির অবস্থা বর্ণানাতীত। মদন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তাহার পর রাগিয়া উঠিয়া বলিল,

"হাসি!—জান না তো, কলকাতা কেমনধারা জায়গা—লোকের স্বভাব চরিত্তির ঠিক রাখা কত শক্ত!"

বড় বৌ চিবুকের একপাশে তর্জনী স্পর্শ করিয়া চক্ষু পাকাইয়া চিন্তিতভাবে বলিল, "ওমা, সত্যিই তো! এতগুলিন লোক বাড়িতে, এ কথা কি কেউ ভেবে দেখেছে একবারটি? ভাগ্যিস্ ঠাকুরপো কইলে! আর দাদারই বা কি আক্কেল—নিজে গেছেন গোল্লার দোরে, এখন ছোট ভাইটিকে দ—লে...."

আর গাম্ভীর্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল, কথাটা সম্পূর্ণ করাও। বড়বৌ উচ্চ হাস্যে যেন ভাঙিয়া পড়িল একেবারে; রাজুও আরও কুঁকড়াইয়া গেল, কিন্তু তাহারই মধ্যে চাপা হাসিতে ব্রীড়ানত শরীরটাকে যেন ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল।

তবুও মেয়েছেলের মন তো? তায় সম্বন্ধে ভাজ, তার উপর রাজু কিছু না বলিলেও, তাহার মুখের দিকেও চাহিতে হয় একটু; বড়বৌ কথাটা পাড়িল খুড়শাশুড়ীর কাছে। অবশ্য কলিকাতার বদনাম দিয়া নয়, অন্যভাবে।

খুড়শাশুড়ীর মনটাও খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল,—তবে নাকি নেহাৎ রোজগারের কথা—এত দিনে, ঠাকুর দেবতার ধর্ণা দিয়া জুটিয়াছে একটা কাজ, তাই দোমনা হইয়াছিল। মানুষটি এ-সব বিষয়ে একটু কড়াও, কিন্তু তবুও মেয়েছেলেই তো? বড়বৌ কথাটা অন্যভাবে পাড়িলেও তাহার আড়ালে ছেলের মনের সন্ধান পাইতে তাহার দেরি হইল না, এদিকে তাহাদের কথাবার্তার সময় বারান্দায়, দুয়ারের আড়ালেও যে একটি মানুষ উৎকর্ণ হইয়া আছে সে আভাসও পাওয়া গেল। বুড়ী কথাটা পাড়িল কর্তার কাছে। অবশ্য বড়বৌয়ের যুক্তি অবলম্বন করিয়া নয়। বলিল, "কুটুমের সাথে বিবাদটা মিটল, এতদিনে বউ পাঠালে, সঙ্গে সঙ্গে

ছেলেকে সরিয়ে দিলে কিন্তু কথাটা অন্যভাবে দাঁড়াবে নি ?—একে তো ঐ মানুষ্ সব—ছল ধরবার জন্যে ওং পেতেই রয়েছে অষ্টপ্রহর ।”



“কুটুমের ভাবনা,—না ?—হু”

বুড়া ঝানু, এই সব মেয়েছেলে লইয়াই তো তাহাকে ঘর করিতে

হইয়াছে? হুঁকার টানের সঙ্গে সঙ্গে চোখ পিট্ পিট্ করিয়া প্রশ্ন করিল, "কুটুমের ভাবনা,—না?....হুঁ....বলি মদনা বেঁকে বসেছে কি না বল দিকিন? আর তো নড়তে চাইবে নি সে। আর এ্যাদ্দিন যে তার টিকি দেখা যেত না বাড়িতে, তার কি? তাকে বলে দিও কিন্তু আর আবদার চলবে নি। বড় রস হয়েছে, না?....কোথায় গেল সে ছোঁড়া?"

মদনা ঢেঁকশালের অন্ধকারে হুঁকা হাতে, তামাক টানা বন্ধ করিয়া কথাগুলা শুনিতেছিল; "বেয়াক্কেলে বুড়ো—বাহাত্তুরে" বলিতে বলিতে পা টিপিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

[২]

সব ক'টাই সমান। বড়বৌয়ের সব কথায় ঠাট্টা, সময় নাই অসময় নাই ঠাট্টা করিয়া বসিলেই হইল। কলিকাতা যে বদ জায়গা—একি নূতন কথা? গোড়ায় গোড়ায় দাদার কথা মনে নাই? আজ না হয় দাদা সাধু হইয়াছে—মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছে, কিন্তু আগেকার সে সব দিনের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছে সবাই?... করুক ঠাট্টা,—একবার গা-জুরি করিয়া পাঠাক সবাই মদনকে কলিকাতায়—ভাল করিয়া সবাইকে বুঝাইয়া দিবে কলিকাতায় স্বভাবচরিত্র বজায় রাখা দুষ্কর কিনা,—সেও দাদার ভাই!

আর তুই বুড়ী,—জানিস্ বুড়ার মেজাজ, শ্বশুরবাড়ির কথা তুলিয়া ওর চোখে ধুলো দিতে চাস্? তার মানে আর কিছু নয়—এদিকে লোক দেখানি বলাকে বলাও হইল, অথচ দিব্যি যাওয়াটাও বজায় রহিল। উপরে উপরেই মায়া,—পেটের মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ।

সবচেয়ে রাগ হইল খুড়ার উপর—মদনা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—পাঠাক্ কলিকাতায় তাহাকে, ইহার পর একবারটি মাত্র সে বাড়ি আসিবে, —শুদ্ধ একবারটি,—বুড়ার শ্রাদ্ধের সময়। আর কলিকাতায় গিয়া কালীঘাটে শুধু এই মানতই করিবে যেন সে দিনটা শীঘ্র শীঘ্র আসে। এই সব ছ্যাবলা, ষড়যন্ত্রী আর একগুঁয়েদের মধ্যে শুধু একটি মানুষের মত মানুষ পাওয়া গেল।—ছোট বৌ রাজু। কী বুদ্ধি! কথার কী বাঁধুনি! সলা পরামর্শ করিতে হয় তো ঐ রকম মানুষের সঙ্গে, একটা যে কথা বলিবে তা বেশ ওজন করিয়া—লাখটাকা দাম সে কথার। একবারও কি মনে হয় যে একটা চৌদ্দ-পনের বছরের ছোট মেয়ের মুখের কথা?—

রাত্রে রাজু বলিল, "বাপের রাগ করবার কথা যে বললেন খুড়ীমা, এতে তানাদের রাগ করবার কি আছে? নিজেদের বৌ নিয়ে এসেছেন, তাকে ভাল রাখুন মন্দ রাখুন, আর বাপ মায়ের কি? তারা তো এনাদের হাতে সঁপে দিয়ে খালাস—এখন এনারা রাজরাণী সোয়ামী-সোহাগী করে রাখুন ভাল, বনবাসে দিন, সেও ভাল।....বনবাস বইকি—তুমিই যদি বাইরে রইলে তো বাড়ি কি আমার বনবাস হ'ল নি? আমিই না হয় চাষাভূষোর মেয়ে, কিন্তু মা জানকী কেন রাজপাট ছেড়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে গেছলেন? সোয়ামী বিহনে অযোধ্যাই তাঁর বনবাস হবে বলে তো? তুমিই যদি কলকাতায় রইলে তো সোনার-গাঁ কি আমার বনবাস হ'ল নি! কও কি না?"

বৌয়ের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া মদনের তাক লাগিয়া গেল। ঐটুকু মেয়ে তাহার বিবেচনা দেখ, শাস্ত্রের জ্ঞান দেখ! যা বলিল তাহার এক বর্ণও কাটুক দেখি কেহ! মদনের মুখে কথা সরিতেছিল না, তবুও সাধ্যমত বুঝাইল; বলিল, "কি করবে বল রাজু, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। কিছুদিন বুক বেঁধে থাক তুমি। আমি এমন মতলব

ঠাউরেছি যে চোদ্দ বছর দূরে থাক্, চোদ্দ দিনও যাবে নি,—ফিরে এসব।"

রাজু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতে বলিল, "সে এখন বলব নি, দেখতেই পাবে ; এই রকম করে তোমার কাছছাড়া করা বেইরে যাবে বুড়োর।

রাজু অভিমান ভরে বলিল, "চোদ্দ দিন!—আমি ততদিন বেঁচে থাকব কিনা....ওনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।"

মদন বেচারী ভয় পাইল, এবং মনের কথাটা গোপন করিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, "বিষ খাবে নাকি !"

রাজু বলিল, বিষ খেতে হবে কেন ?—আর পাবই বা কোথায় ?—কে আমার এমন বন্ধু আছে যে দয়া করে এনে দেবে ?—আমি বল্‌ছিমু—যে যাকে ভালবাসে তাকে না দেখতে পেলে একদিনও বাঁচতে পারে কখনও ? তুমি বাস না আমায় ভাল তাই চোদ্দ দিন কেন গোটা চোদ্দ বছরও দিব্যি হেঁসেখেলে বেঁচে থাকতে পার, তার ওপর কলকাতায় আবার কত মনের মানুষ পাবে'খনি....তবুও শ্বশুর ঠাকুর বলবেন...."

হঠাৎ একটু চুপ করিয়া গেল, একটু ভাবিল, তাহার পর কতকটা আক্রোশের স্বরে বলিল, "আচ্ছা, শ্বশুর ঠাকুরের কি ও-কথাটা বলা ঠিক হ'ল ?"

মদন প্রশ্ন করিল, "কোন্ কথা ?"

রাজু মদনের মুখ থেকে দৃষ্টিটা সরাইয়া লইল, বলিল, "এই শুনি এত গন্যিমান্যি লোক,—গাঁয়ের মোড়ল, ভাইপোকে কি বলা ঠিক হল যে 'রস হয়েছে' ?"

মদন অভিমত দিল, "ভীমরতি হয়েছে, আর বেশিদিন নয়।"

রাজু চকিতে একবার স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "কে জানে বাপু, আমাদের বাপ খুড়োর মুখে সাজ্জন্মে

ওরকম কথা বেরুত নি। গুরুজন, নিন্দে করতে পারি না, কিন্তু কথাটা ইতরের মত হয়েছে—হেলো চাষীর মুখেই মানায়। কথাটা খাঁটি বলছি, অবশ্য গুরুজন বলেই কোন অসম্মানের কথা মুখে আনতে পারি নি—মাথায় থাকুন তিনি....”—বলিয়া গুরুভক্তিতে মাথায় যুক্তকর ঠেকাইল।

মদনও অনুরূপ ভক্তির সহিত কাকার আন্তশ্রাদ্ধ করিয়া মনটা হালকা করিল তাহার পর সমস্ত রাত জাগিয়া দুইজনেই পরামর্শ হইল—আপাতত যাওয়াটা স্থগিত করা যায় কি করিয়া। কালকের ফাঁড়াটা তো কাটান যাক্, তাহার পর আবার দিন দেখা, আবার তোড়জোড় করা। রাজু বলিল, “ত্যাতদিন চাকরির ফাঁড়াটাও কেটে যেতে পারে। চাকরি, না আমার পাপ সতীন যুটেছে।....দুটো পেট তো ?—চলে যাবে এক রকম করে !”

রাজুই সলা দিল, “অসুখের ভান করে পড়ে থেক। অন্য অসুখ নয়—পেটে ফিক্ ব্যথা। শ্বশুর তো শ্বশুর, বদ্যিরও বাবার সাধ্যি নেই ধরে।....দেখেছ মরণ !—পোড়া মুখে সোয়ামীর অসুখের নাম করলুম !”—বলিয়া ডান হাতে দুইটা আঙুল ঠোঁটে ঠেকাইয়া তিনবার কপাল স্পর্শ করিল।

“কিন্তু খাওয়া বন্ধ হবে না তাতে ?”

সে মুস্কিলের আসানও রাজুরই করতলগত; বলিল, “সে ব্যবস্থা আমার হাতে; তোমার খাওয়া না হ’লে, আমিই কি খেতে পারি ?—বুদ্ধিসুদ্ধি তোমাদের সবারই একটু কম বাপু—দু একজনের যা-ও বা একটু আছে, শুধু ফিচ্‌লেমি।”

এমন লাগসই পরামর্শটাও কিন্তু বুড়ার কাছে টিঁকিল না। সে বধূবর্ণিত ইতর হেলো চাষীর ভাষায় বরং আরও একটু শান চড়াইয়া বলিল, “ফিক্ ব্যথা না ওর গুষ্টির মাথা,—ও যৈবনের রস—ঢের

দেখলাম....রোজগার না থাকলে রস কটা দিন টেঁকবে জিগোও দিকিন ওকে। ওকে যেতে হবে, ওসব আবদার খাটবে নিক।”

যাহোক মেয়েদের কান্নাকাটিতে সে দিনটা স্থগিত হইল যাওয়াটা। ওরা দুজনে ভাবিল শুভ দিনের ফাঁড়াটা কাটিল, একটু নিশ্চিন্ত হইয়া এবার একটা পাকা রকম মতলব খাড়া করিবে।

ঘাঘী বুড়া কিন্তু কখন রাম পণ্ডিতের নিকট গিয়া পরের দিন রাত তিনটের সময় এক মাহেন্দ্রক্ষণের সন্ধান লইয়া আসিল। রাম পণ্ডিত বলিয়া দিয়াছে মদনাকে রাত তেপহরে উঠাইয়া গোয়াল ঘরে যাত্রা করাইয়া রাখিতে হইবে; আর বাড়ি না ঢুকিয়া সেখান হইতেই পরে রওনা হইবে। ভগবতীর ঘর, আর কোন দোষের ভয় থাকিবে না।

এতর পরেও যদি রসের কিছু অবশিষ্ট থাকা সম্ভব ছিল তো সেটুকু গোয়াল ঘরের মশার পেটে দিয়া মদনা তৃতীয় দিন সকালে আহারাদি করিয়া খুড়োর সঙ্গে কলিকাতা রওনা হইল।

[৩]

কলিকাতায় আসিয়া শুনিল, যে-কাজটা পাইবার আশা ছিল দেরি হইয়া যাওয়ায় সেটা বিলি হইয়া গেছে। মদনার দাদা রতন স্ট্র্যাণ্ড-রোডের জেটিতে পিয়নের কাজ করে, গম্ভীরভাবে বলিল, “একি তোমার সোনার-গাঁ কাকা? এ কলকাতার জেটি, বিলেতের, এ্যামেরিকার জাহাজ যাতায়াত করছে এখান থেকে, একটা ঘণ্টার এদিকে ওদিকে সব ওলট পালট হয়ে যায়—তোমরা দু’-দুটো দিনের বিলম্ব করে দিলে—আর কি কাজ পড়ে থাকে?”

কাকা একবার মদনার দিকে চাহিল। প্রাণ খুলিয়া রসাধিক্যের

কথাটা একবার সোনার-গাঁর ভাষায় সালংকারে বলিবার জন্য জিভটা সড়সড় করিতেছিল, কিন্তু রতনের ভাষায় কলিকাতার মার্জিত রুচির আঁচ পাইয়া নিরাশ হইয়া থামিয়া গেল।

গোয়ালের যাত্রা যে মাঠে মারা গিয়াছে ইহাতে মদনা মনে মনে খুশি হইল।

বাবু আবার একটা আশা দিয়া রাখিয়াছেন; ঠিক হইল মদনা থাকিয়া যাইবে। বুড়া পরের দিন চলিয়া গেল।

পুল পার হইয়া শালকিয়ার একটি বস্তিতে রতনের বাসা। মাটি দিয়া লেপা ছেঁচাবেড়ার পাশাপাশি দুইটি ছোট কুটুরি; মাথায় টিনের ছাদ। হাত চারেকের একটি উঠান, তার অপর দিকে একটি ছোট রান্না ঘর। উঠানের একদিকে সাহেব বাড়ি থেকে চারা আনিয়া রতন একটি সূর্যমুখীর গাছ করিয়াছে,—ছোট মুখে ফাঁদাল নথের মত তাতে একটা প্রকাণ্ড বেমানান ফুল ফুটিয়া আছে।

সকাল বেলাটা একরকম কাটিয়া যায়। দুই ভাইয়ে মিলিয়া বাজার করিয়া আনে, কুটনা কুটিয়া বাটনা বাটিয়া, পাথুরে কয়লার উনান জ্বালিয়া খানিকটা গোছ এবং বেশিভাগ অগোছের মধ্যে রান্নাটা সারিয়া লয়; কোথা দিয়া যে সময়টা বহিয়া যায় টেরই পাওয়া যায় না। রতন স্নানাহার সারিয়া ঠিক সাড়ে নয়টার সময় উর্দির বোতাম আঁটিতে আঁটিতে বাহির হইয়া যায়।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটাতে রাজু আসিয়া উপস্থিত হয়,—মদনার মনের খিড়কি দিয়া।

রাজু অমনি আসে না, সোনার-গাঁকে সঙ্গে করিয়া আনে। কি করিয়া যে কি হয়, টিনের খেলনার মত এই ছোট্ট ছটাকখানেকের বাড়ির মধ্যে আসিয়া জোটে সোনার-গাঁয়ের পুরু মাটির দেয়ালের চারখানা ঘর,

—রাজুর ঘোমটার মত নীচু গোল পাতার ছাউনি তাহাতে; গোয়াল, ঢেঁকশাল, আমবাগানের ঘন ছাওয়ার নীচে আগাছার জঙ্গল—তাহার মধ্য দিয়া খিড়কির পুকুরের সরু রাস্তা....বড় বৌ আর রাজু দাঁড়াইয়া আছে—বড় বৌয়ের কাঁখে পিতলের কলস, হাসিমাখা চটুল ঠোঁটের উপর দিয়া নথের সোনার তারটা বাঁকিয়া গিয়াছে, সোনায় আর হাসিতে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে মুখটা, তাহার পিছনে পিছন ফিরিয়া ভিজা খয়ের রঙের ডুরে পরিয়া রাজু।....পাশেই ঘোষেদের বাড়ি যাইবে মদন। ঘরের পিছনে, করমচা ঝোপের আড়ালে রাজু আর ঘোষেদের মেয়ে বাতাসী; রাজু পলাইবে, বাতাসী আঁচল চাপিয়া আটকাইয়া ধরিল,—ডাকিল, "মদনদা!"....রাত্রে রাজু অভিমান করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে—কিসের অভিমান এত? মদনা আন্দাজ করিতে করিতে হয়রাণ হইয়া উঠিতেছে—পাঁয়জোর চাই? বাপের বাড়ির জন্য মন কেমন করিতেছে?—খুড়ী আজ সকালে সেই যে কড়া কথা বলিয়াছিল? মদন তো সে জন্য খুড়ীর সঙ্গে বেশ একচোট বচসা করিল সন্ধ্যার সময় মাঠ থেকে আসিয়া; অবশ্য অন্য ছুতা করিয়া করিল বচসাটা, কিন্তু রাজু কি বুঝিতে পারে নাই?....রাজুর চাপা স্বরে হঠাৎ খিল খিল করিয়া হাসি,—অভিমান নয়, দুষ্টামি।....আসিবার দিন কাকাতে মদনাতে বাড়ির হাতা ছাড়াইয়া কইপুকুরের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে—একবার ঘুরিয়া দেখিল খুড়ী আর বড় বৌ তখনও সদরে দাঁড়াইয়া,—কেমন করিয়া যেন দৃষ্টিটা ঘরের জানালায় গিয়া পড়িল, রাজু কোমরের উপর থেকে সমস্ত শরীরটা জানালার গরাদে চাপিয়া রহিয়াছে, মুখে আঁচল চাপিয়া কাঁদিতেছে রাজু ....সব ব্যাপারটাই হয় এই টিনের বাড়ির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে—মাঝে মাঝে শুধু সূর্যমুখী ফুলটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া ও-গুলা মিটাইয়া দেয়....

একদিন রতন চিঠি ডেলিভারি করিতে বাহির হইয়া গোটা তিনেকের সময় একবার বাড়িতে আসিয়া দেখিল মদনা শানের উপর উবুড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া আছে। রান্নাঘরের দুয়ার খোলা, বেড়ালে ভাত, ডাল, তরকারি, মাছের কাঁটা ঘরময় ছড়াইয়া একশা করিয়া রাখিয়াছে।.... মদনার কি কোন অসুখ-বিসুখ হইল নাকি?....দারুণ উদ্বেগে ছোট ভাইকে তাড়াতাড়ি তুলিতে যাইবে, হঠাৎ চোখে পড়িল মদনার ঠিক বুকের নীচে শাদাপনা কি একটা ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে। আঙুল দিয়া খানিকটা টানিয়াই "শ্রীবিষ্টু!" বলিয়া তাড়াতাড়ি হাতটা সরাইয়া লইয়া উঠিয়া একটু গঙ্গার জল মাথায় ছিটাইল। জিনিসটা ভ্রাতৃবধূর হাতের রূপার চুড়ি।

রতন সমস্ত দিনটা গুম হইয়া রহিল!

পরের দিন রান্না হইয়া গেলে রতন বলিল, "তুইও নেয়ে দু'টি খেয়ে নে মদনা, আমার সঙ্গে আফিস চল্‌—কতকটা অন্যমনস্কও থাকবি, কখন কখন আমার সঙ্গে গেলি,—জায়গা টায়গাগুলো দেখা শুনো হয়ে থাকবে....আর এলি এতদিন, কলকাতা সহরটাও দেখ একটু, অত মন মরা হয়ে কদ্দিন কাটাবি? বড় বৌ, খুড়ীমা আর সবাই কি চিরদিন তোর কাছে কাছে থাকবে?"

কলিকাতা সহরটা, নামিয়া অবধিই মদনার পছন্দ হয় নাই। এ যেন ধারণার অতীত এক ব্যাপার, জানা অজানা কিছুর সঙ্গেই মেলে না—কোন দিক দিয়াই কূল কিনারা পাওয়া যায় না। এমন কি সমস্ত রাস্তা রাগে অভিমানে যে অত করিয়া সংকল্প করিতে করিতে আসিল যে আর কিছু না পারুক অন্তত স্বভাব-চরিত্র হারাইয়াও সবার উপর আক্রোশ মিটাইবে, এ জনারণ্যে তাহারও কোন সুযোগ দেখিতে পাইতেছে না।

তবুও দাদার কথামত স্নানাহার সারিয়া বাহির হইল।

কয়টা দিন গেল। মদন দাদার সঙ্গে প্রত্যহই বাহির হয়। দাদা যতক্ষণ ভিতরে কাজ করিতে থাকে, মদন বাহিরে আসিয়া রেলিঙের ধারে সিঁড়ির একপাশটিতে বসিয়া স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর দিয়া কলিকাতার যে বিচিত্র ধারাটা বহিতে থাকে তাহার পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। এ প্রবাহের গায়েও এক এক বার সোনার-গাঁ ভাসিয়া ওঠে, রাজুতে রাজুতে ভরা সোনার-গাঁ—চোখে জল ভরিয়া ওঠে; কিন্তু এত চপলস্রোতে টেঁকে না ছবিটা বেশিক্ষণ।

রতন যখন জরুরী কাজে কিংবা অধিক দূরত্বের জন্য ট্রামে কিংবা বাসে করিয়া বাহির হয়, মদনকে লইয়া যাইতে পারে না, নচেৎ সঙ্গে লয়। ক্রমে ক্রমে পরিচয় হইতে লাগিল কলিকাতার সঙ্গে—রাজুর মতই কলিকাতা ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন খুলিতেছে—সৌন্দর্যের আবরণ অপসারিত করিতেছে—

—মন্দ নয়....হ্যাঁ—কলিকাতাও যে ভাল এ চিন্তার সঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—রাজু বলিয়াছিল—কলিকাতা তাহার সতীন।....যা অপছন্দ, যার উপর রাগ সে-সবকেই সতীন বলিয়া বসা রাজুর একটা রোগ। চাকরি সতীন, কলিকাতা সতীন, মদনার কাছে একটু আদর পায় তাই বলদ জোড়াও সতীন, একদিন কাকার উপর রাগিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল, "বুড়ো যেন আমার সতীন!"

অবশ্য তখনই জিভ কাটিয়া, মাথায় যুক্তকর ঠেকাইয়া গুরুজনকে সম্বন্ধবিরুদ্ধ কথা বলার দোষটা খণ্ডাইয়া লইয়াছিল।

ক্রমে এমন হইতে লাগিল যে রতন কাজে লাগিয়া থাকিলে কিংবা কার্যসম্পর্কে দূরে চলিয়া গেলে মদন একা একাই বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। অনির্দিষ্টভাবে এ রাস্তা সে রাস্তা, গঙ্গার ধার ইডেন গার্ডেন, কোন দিন বা চৌরঙ্গীর খানিকটা বা এদিকে ডালহৌসি স্কোয়ার বা

আরও খানিকটা আগাইয়া যায়। রাজুর সতীনের সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়,—সতীনের সঙ্গে সঙ্গে মনটা ক্রমাগত আরও বেশি করিয়াই যেন রাজুর জন্য লালায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। হইতে পারে ট্রাম, বাস, পার্ক, ভিড়, চিনাবাদাম, সরবৎ সব একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে, কিংবা হইতে পারে সময়ের দিক দিয়া ব্যবধানটা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে টান পড়িতেছে বেশি,—মোট কথা দিন দিনই রাজুকে না দেখিতে পাওয়াটা যেন অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল মদনার কাছে। ভিতর থেকে এমন একটা মূক, ব্যাকুল ক্ষুধা জাগিয়া উঠিতে লাগিল যাহাকে শুধু কল্পনার প্রবঞ্চনা দিয়া আর ঠেকান যায় না। এই চক্ষু দিয়া দেখা যায় এই হাত দিয়া স্পর্শ করা যায় এমন স্পষ্ট, সন্দেহ-লেশহীন রাজুর জন্য মনটা যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল।

একবার মনে করিল বাড়ি পলাইবে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিল তাহাতে তিনটি বড় বড় অন্তরায় আছে। প্রথমত পয়সার অভাব। আনা সাতেক পয়সা তাহার কাছে আছে, তাহাতে কোড়নও হইবে না।

দ্বিতীয়ত, পৌঁছিলেও কাকার প্রহারের ভয় আছে। রাজু আসিয়া অবধি কাকা অনেকটা সংযত বটে, তবু অমন রগচটা লোককে একেবারে অতটা চটাইতে সাহস হয় না। তৃতীয় অন্তরায়টা আরও গুরুতর।—মদনা অসিবার সময় রাজুকে স্তোক দিয়া আসিয়াছে যে প্রথম চাকরি করিয়া সে তাহার জন্য গহনা লইয়া আসিবে রাজুর কাছ থেকে খিল দেওয়া চারগাছা রূপার চুড়ি আনিয়াছে দুইটা মাথার কাঁটা আনিয়াছে, রূপার কণ্ঠী আনিয়াছে, হাল ফ্যাশান মতো সব সোনার পাতে মুড়িয়া লইয়া যাইবে। এমন কি, শুধু মদনার ফরমাসে রাত্রে যে কেমিকেল সোনার

নথটা পরিত রাজু—ছেলেপিলে হইলে যেটা প্রকাশ্যে পরিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সেটি পর্যন্ত লইয়া আসিয়াছে,—বামনদের বউ বলিয়াছে, কলিকাতায় মোটা করিয়া সোনার জল দেয়, যাইবার সময় মদনা ঠিক করিয়া লইয়া যাইবে। এ-সব না ব্যবস্থা করিয়া কি ভাবে যায় সে?

এই পাঁচরকম চিন্তায়,—আকাঙ্ক্ষার পাশে পাশে নানারকম প্রতি-বন্ধকে মনটা বড় অস্থির হইয়া আছে, কিছু ভাল লাগিতেছে না।

[৪]

সেদিন দাদার সঙ্গে আফিসে গিয়া মদনা খানিকটা উস্‌খুস্ করিয়া কাটাইল, তাহার পর রতনকে কিছু না বলিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। বিশেষ কোন গন্তব্য স্থির নাই। রাজু আর তাহার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহার মধ্যে দাদার খুব বেশি রকম হাত; বাড়ি যাইতে না পারুক, কিন্তু এতে যে দাদাকে বেশ খানিকটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতে হইবে এর মধ্যে প্রতিশোধের খানিকটা আস্বাদ পাইল মদনা। শুধু ঐটুকুই নয়,—এর পর যখন অনুতপ্ত হইয়া দাদা, কাকা বাড়ি যাইবার জন্য জেদাজেদি করিবে, খুড়ীমা, বড় বৌ কান্নাকাটি জুড়িয়া দিবে, সে কলিকাতা ছাড়িয়া এক পাও নড়িবে না।....ওরা সব মদনকে ভাবে কি?

কথাগুলা যতই বিনাইয়া-বিনাইয়া ভাবিতে লাগিল, মনের কোন্ এক জায়গায় রাজুর মুখখানা ততই যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

এ-গলি সে-গলি, এ-রাস্তা সে-রাস্তা, এ-পার্ক সে-পার্ক করিয়া সারা দিনমান কোথায় কোথায় যে ঘুরিল শেষ পর্যন্ত কোন হিসাবই রহিল না।

ক্লান্তি অপনোদনের জন্য পানে-সরবতে গোটা ন'য়েক পয়সা খরচ হইয়া গেল। বিকালের দিকে আসিয়া মদনা গোলদীঘিতে পৌঁছিল।

এখানে আসিয়া মদনার একটা জিনিষ চোখে পড়িল যাহাতে কলিকাতার একঘেয়েমিটা অনেক দিন পরে কাটিল খানিকটা—পার্কের লোহার বেড়ার গায়ে গায়ে একধার থেকে অন্যধার পর্যন্ত রাশীকৃত ছবি টাঙান, বিচিত্র রঙের জলুসে সমস্ত জায়গাটা যেন আলো করিয়া আছে। কিছু ঠাকুরদেবতার ছবি আছে কিন্তু অধিকাংশই নানা বেশে, নানা ভঙ্গিতে, নানারকম মেয়ের ছবি; দু'একটা চেনাও, দাদার সঙ্গে একদিন বায়স্কোপে গিয়া দেখিয়াছিল যেন।

ছবিগুলা রাজুর কথা মনে করাইয়া দিতে লাগিল, কি রাজুর কথা ভুলাইয়া দিতেই লাগিল বলিতে পারা যায় না, তবে মদনা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খুব গভীর তৃপ্তির সহিত ছবিগুলা দেখিয়া যাইতে লাগিল এবং অবশেষে একটা ছবির সামনে আসিয়া হঠাৎ বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল।

ছবিটা অন্যান্য ছবিগুলার চেয়ে ঢের বড়, শুধু একটি মেয়েই আছে; পুকুর, গাছপালা কি টেবিল-চেয়ারে জায়গা ভরিয়া দেয় নাই। মেয়েটি ভিজা কাপড়-পরা, কাঁধে একটা গামছা ফেলিয়া ঈষৎ নতমুখে দাঁড়াইয়া আছে। ব্যাপারটা এমন কিছুই মারাত্মক নয়, তবে কথা হইতেছে মুখে, গড়নে মেয়েটার রাজুর সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে। সেদিন খিড়কির পুকুরের রাস্তায় রাজু ফিরিয়া না দাঁড়াইয়া যদি সোজাসুজিই দাঁড়াইত তো কতকটা ঠিক এই রকম দেখিতে হইত নিশ্চয়।....মদনা অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিল। একবার সামনে খানিকটা আগাইয়া গেল, আবার সরিয়া আসিল, দাঁতে বুড়া আঙুলের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে

একটু পায়চারি করিল, তাহার পর উৎসুক কণ্ঠার সহিত আসিয়া ছবির বিক্রেতাকে প্রশ্ন করিল, "কততে হবে এটা ?"

"ছ' আনা।"

মদন পকেট দুইটা হাতে উজাড় করিয়া পয়সা-আনি যা ছিল সব বাহির করিল, গুণিয়া নিরাশভাবে দোকানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তিনটে পয়সা কমছে যে—?"

"আচ্ছা, হবে, দে"—বলিয়া দোকানী পয়সাটা লইয়া—ছবিটা গুটাইয়া হাতে দিয়া দিল। ক্রেতার বেশভূষার সঙ্গে তাহার শখের অমিলটা লক্ষ্য করিয়া একবার আড়চোখে চাহিয়াও লইল।

তাহার পরদিন মদনা আর দাদার সঙ্গে আফিসে বাহির হইল না, একটা ছুতা করিয়া বাড়িতে থাকিয়া গেল।

কয়েকদিন হইতে ভাইয়ের আচরণ যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে। —আজ বাড়ি থাকিয়া যাইবার জন্য ছুতাটাও যে করিল সেটা তেমন সন্তোষজনক নয়। কি মতলব আঁটিতেছে মদনা ?—পলাইবে না তো ? কিংবা অন্য আরও কিছু মতলব নাই তো ভিতরে ভিতরে····আচ্ছা মুস্কিল ! —সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ হয়, খুলিয়া কিছু বলাও যায় না, কিন্তু বিবাহ কি কেহ করে না ?—এক মদনাই করিয়াছে ?····দারুণ দুশ্চিন্তায় রতনের মনটা অস্থির হইয়া রহিল। কোন মতেই মনটাকে বাড়ি থেকে সরাইতে পারিতেছে না—এ মানুষের অদৃষ্টে শেষ পর্য্যন্ত কি লেখা আছে ?····যাহার জন্য এত, তাহাকে একদিন উপার্জন করিয়া খাওয়াইতে হইবে তো ? অত করিয়া রোজ বুঝাইতেছে ; ছোট ভাইকে আর এ-সম্বন্ধে কত স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারে লোকে ?

প্রায় দুইটার সময় চিঠি বিলি করিতে বাহির হইয়া রতন বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। দুয়ারটা খোলাই ছিল, কতকটা ভয়ে, কতকটা

কৌতূহলে বাড়িতে প্রবেশ করিল। তাহার পর ব্যাপার দেখিয়া তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন লোপ পাইল একেবারে!—উঠানের দিকে পিছন ফিরিয়া কাৎ হইয়া শুইয়া মদন দেয়ালে টাঙান একটা ছবির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে! রতন দেয়ালের আড়াল হইয়া বিস্মিত কৌতুহলে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল।—

ছবিটার কাগজ ফুড়িয়া হাতে চারগাছা রূপার চুড়ি পরান, চুলে দুইটা কাঁটা, গলায় একটি রূপার কণ্ঠী, নাকে একটি প্রকাণ্ড নথ। এদিকে মদনার নিজের বাঁ হাতে সূর্যমুখী ফুলের পাপড়ী দিয়া গাঁথা একছড়া মালা। ছবিটা মন্দ নয়, কিন্তু তিন চারগুণ বড় ফাঁদের গয়নাতে গয়নাতে যেন বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। কার গয়না এসব? কী-ই বা এত দেখিতেছে মদনা? ছোঁড়ার কি চরিত্র বিগড়াইল দুইদিন কলিকাতায় আসিয়াই,—না বৌকে দেখিতে না পাইয়া মাথাই একেবারে বিগড়াইয়া গেল?

রতন তেমনি পা টিপিয়া টিপিয়া ফিরিয়া গেল। তাহার পর রাস্তা হইতে একবার সাড়া দিল, "মদনা আছিস তো ভেতরে?"

সালংকারা চিত্রটিকে সামলাইয়া লইবার মত একটু সময় দিয়া প্রবেশ করিল, বলিল, "আবার কোণ নিয়ে পড়ে থাকতে লেগেছিস তো? কাকা, বড়বৌ এদের জন্যে যদি মনটা এতই খারাপ হয়ে থাকে তো, না হয় ঘুরে আয় বাপু তুই একবার। বড়বৌও লিখেছে, বড্ড করে....যাঃ, চিঠিটা এলাম আবার আফিসে ভুলে—তা'হলে কালই যাবি?

মদনা একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মনের আবেগটা সাধ্যমত চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া বলিল, "একবার গেলে হ'ত দাদা; মানে, আর কিছু না—কাল রেতে কাকার স্বপ্ন দেখে মনটা এত্তো খারাপ হয়ে



কী-ই বা এত দেখিতেছে মদনা ?

আছে যে....চাকরির জোগাড় হলেই কিন্তু তুমি সঙ্গে সঙ্গে খবর দিও.... কাকার দিন দেখানর বাইয়ে এবারেও না হাতছাড়া হয়ে যায় ; চাকরি তো আর গাছে ফলচে না যে...."

দাদা একটা শ্লেষ এবং দুঃখের হাসিকে অতি কষ্টে নিরোধ করিল। মনে মনে বলিল, "আর চাকরি, যে-চাকরির পাল্লায় এখন...."

—সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ কথাটা আর শেষ করিল না।